بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لربنا العظيم والصلاة على رسولنا الكريم

পীরে কামেল শাইখুল হাদীস
আল্লামা মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.-এর
হৃদয়ছোঁয়া ইসলাহী বয়ান-সংকলন

দীনি মাওয়ায়েজ

সংকলক
মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাযুল হাদীস ওয়াত তাফসীর
জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

প্রকাশনায়
মজ্‌লিসে হেদায়াতুল ইসলাম বাংলাদেশ
(আত্মশুদ্ধি, দ্বীনি দাওয়াত ও সেবামূলক মজলিস)
সদর দপ্তর : ফুলছোঁয়া মাদরাসা, বাকিলা, চাঁদপুর। মোবাইল : ০১৮১৮৮৪৮২২৮
কার্যকরী সদর দপ্তর : আরসিম গেইট, ঢাকা-২০১৪। মোবাইল : ০১৮১৮৮১৮৮২৬

পরিবেশনায়
নিবরাস লাইব্রেরী
দেওভোগ মাদরাসা মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯১১-৮২৫৩১৬

প্রথম প্রকাশ
রমযান-১৪৩৭ হি., জুন-২০১৬ ঈ.
প্রকাশক
মজলিসে হেদায়াতুল ইসলাম
স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ
বশির মিসবাহ
সালসাবীল, নয়াপল্টন, ঢাকা
কম্পোজ
ওমর ফারুক
আল মারজান কম্পিউটার
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ
০১৯১১-৮২ ৫৩ ১৬

দাম
তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়
নিবরাস লাইব্রেরী

প্রাপ্তিস্থান
ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা
দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
ফুলছোঁয়া মাদরাসা, বাকিলা, চাঁদপুর
নিবরাস লাইব্রেরী, দেওভোগ মাদরাসা, নাঃগঞ্জ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

পীরে কামেল শাইখুল হাদীস
আল্লামা মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.-এর
অভিমত ও দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اٰله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلي يوم الدين أما بعد–

দীনি মাওয়ায়েজ দ্বারা আল্লাহ তাআলা মৃত কলবকে জীবিত করে থাকেন আর দুর্বল কলবকে সবল করে থাকেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাওয়ায়েজ শুনলে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা হত– যারাফাত বিহাল উয়ূন ওয়া ওয়াজিলাত বিহাল কুলূব। আল্লাহু আকবার! ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকেও সেখান থেকে কিছু দান করুন!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর ওয়ারিসগণ (উলামায়ে হক্কানী রব্বানী) স্বীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকায় যুগে যুগে হেদায়াতের তালেবগণ নিজেদের পিপাসা কিছুটা হলেও মিটাতে পারেন। আর এ পিপাসা দুনিয়াতে পরিপূর্ণভাবে শেষ হবার নয়; বরং যারা এ ময়দানে অগ্রগামী তাদের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। সাধে কি কবি গেয়েছেন–

مریضِ عشق پر رحمت خدا کی * مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

আলেমে দীন হিসেবে যাঁদেরকে ভালোবাসতে হয় তাঁদের মধ্যে আমার প্রিয় মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী অন্যতম। তাসনীফ ও তাদরীসের অনেক ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে তিনি অধমের নিসবতে অনেকগুলো বয়ান 'দীনি মাওয়ায়েজ' নামে সংকলন করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে 'দীনি মাওয়ায়েজ'কে নির্ভরযোগ্য করে হেদায়াত পিপাসুদের সামনে পেশ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন।

'দীনি মাওয়ায়েজ' যেহেতু অধমের নিসবতে সংকলিত তাই তাতে ভুল থাকাই স্বাভাবিক। দীনের ধারক ও বাহক উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে অধমকে অবগত করানোর আবেদন রইল।

দাওয়াতী কাফেলা মজলিসে হেদায়াতুল ইসলাম 'দীনি মাওয়ায়েজ' প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ব্যয়বহুল কাজটি আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ এর সংকলক, প্রকাশক, পাঠক, প্রচারক তথা সংশ্লিষ্ট সকলকে ইসলাহ ও উভয় জাহানে ফালাহ নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন ॥

মোহতাজে দোয়া

তারিখ : ১৪ শাবান, ১৪৩৭ হি. মুহাম্মদ আবূ সাঈদ

পীরে কামেল শাইখুল হাদীস
আল্লামা মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.-এর
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফুলছোঁয়া। চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানাধীন বাকিলা বাজারের অদূরে অবস্থিত একটি রত্নগর্ভা গ্রাম। কোনো কালে এখানে ফুটবে একটি সুবাসিত ফুল এবং সে ফুলের খুশবুতে মাতোয়ারা হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসবে অসংখ্য মৌমাছি– –হয়ত এমনটি ভেবেই কেউ গ্রামটির নাম দিয়েছিল 'ফুলছোঁয়া'। সত্যি, আল্লাহ তা'আলা সেই নিভৃত পল্লীতে ফুটিয়েছেন একটি হৃদয়কাড়া সুবাসভরা ফুল। যার পবিত্র 'ছোঁয়া' গ্রহণ করতে ছুটে আসছে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলার ফুলপ্রেমীরা। প্রতি বছরই যেন ফুলটি বড় হচ্ছে আর বিমুগ্ধ দর্শনার্থী ও ছোঁয়াপ্রার্থীদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি কোনো গাছের ফুল নয়; বরং এ হল ঐশী সুষমায় উদ্ভাসিত, সুন্নতে নববীর পবিত্র সুরভি নিয়ে প্রস্ফুটিত আলোকিত আত্মার অধিকারী ফুলের মতো একটি সুরভিত মানুষ। সে প্রিয় মানুষটি হলেন রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ইলমী মারকায ফরিদাবাদ মাদরাসার দীর্ঘ দিনের নন্দিত মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী পীরে কামেল শাইখুল হাদীস আল্লামা আবু সাঈদ দামাত বরাকাতুহুম।

১৯৬২ ঈসায়ী সালের ১৮ রমযান বুধবার সুবহে সাদেকের সময় ফুলছোঁয়ার সম্ভ্রান্ত মুসলিম দীনদার পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মৌলভী জনাব আবদুল লতীফ, পিতামহের নাম জনাব জমীরুদ্দীন মোল্লা, প্রপিতামহের নাম জনাব হানীফ মোল্লা ইবনে ফানা মিঞা। তাঁর পিতা মৌলভী জনাব আবদুল লতীফ সাহেব স্থানীয় স্কুল ও মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। খুবই দীনদার ও অন্তরালোকসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাই তো উজানীর কারী ইবরাহীম সাহেব রহ. তাকে নিজের নাতনির জামাতা হিসেবে চয়ন করেছেন। এ হিসেবে মুফতী আবু সাঈদ সাহেব বংশগতভাবেই পীর আউলিয়ার বংশধর। ধমনীতে তাঁর বরেণ্য পীর মাশায়েখের শোণিতধারা প্রবহমান। কারী ইবরাহীম সাহেব রহ.-এর তৃতীয় সাহেবজাদা কারী শামসুল হক সাহেব রহ. তাঁর শ্রদ্ধেয় নানা। কারী ইবরাহীম সাহেব রহ. তাঁর এগার ছেলের মধ্যে একমাত্র শামসুল হক সাহেবকেই খেলাফত দিয়ে যান। হযরত

মাওলানা মোবারক করীম সাহেব (রহ.) এক দিকে তাঁর আপন মামা অপর দিকে শ্রদ্ধেয় শ্বশুর।

গ্রামের সাবাহী মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর মুফতী সাহেব চলে যান নানার স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যবাহী উজানী মাদারাসায়। সেখানে শুরু থেকে কাফিয়া জামাত পর্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন। তারপর রাজধানীর সর্ববৃহৎ দীনি ইদারা ফরিদাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে শরহে জামী জামাত থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৪০৪-০৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৪-৮৫ ঈ. ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে পুনরায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন এবং মুফতী হাবীবুর রহমান খায়রাবাদী সাহেবের কাছে ইফতার তামরীন করেন। দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ৫০০ নম্বরের পরীক্ষায় তিনি মোট ৪৮৫ নম্বর পান। উল্লেখ্য, দারুল উলূমে প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। সে হিসেবে প্রতি কিতাবে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল নিম্নরূপ–

কিতাব	পূর্ণমান	প্রাপ্ত নম্বর		কিতাব	পূর্ণমান	প্রাপ্ত নম্বর
বুখারী	৫০	৫০		ইবনে মাজাহ	৫০	৪৮
তিরমিযী	৫০	৫০		তাহাভী	৫০	৪৮
মুসলিম	৫০	৪৯		শামায়েল	৫০	৫০
আবু দাউদ	৫০	৪৬		মুয়াত্তা মালেক	৫০	৪৯
নাসাঈ	৫০	৪৯		মুয়াত্তা মুহাম্মাদ	৫০	৪৬

বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ উভয় কিতাব দারুল উলূম দেওবন্দের নন্দিত মুহাদ্দিস মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা.-এর কাছে পড়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন। শাইখুল হাদীস মাওলানা নাসির খান সাহেব অসুস্থ থাকায় সে বছর বুখারী শরীফের দরস হযরত পালনপুরীকেই দিতে হয়েছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ থাকাবস্থায়ই ফরিদাবাদ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। প্রথম বছর থেকেই ইফতা বিভাগের প্রধান মুফতীর পদ অলংকৃত করেন। নিরন্তর অধ্যাবসায় ও গভীর নিমগ্নতার সাথে ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবাদি অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে এ বিষয়ে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং ফাতাওয়া ও মাসাইলের জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আবির্ভূত হন।

তিনি দেশী-বিদেশী অসংখ্য বুযুর্গ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের পুণ্যময় সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ্ আশরাফ আলী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা ভারতের জালালাবাদ মাদরাসার শায়েখ মাওলানা মসিহুল্লাহ খান রহ., শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া রহ.-

এর বিশিষ্ট খলীফা সাহারানপুর মাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা ইউনুস সাহেব ও চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ, রূহানী জগতের প্রাণপুরুষ আল্লামা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) প্রমুখ মাশায়েখে এজামের দীর্ঘ সুহবত ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে নিজের অন্তরাত্মাকে কলুষমুক্ত ও আলোকিত করেন। কাঙ্ক্ষিত পথ অতিক্রম করে আল্লামা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর কাছ থেকে ইজাযত ও খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে ইলম ও আধ্যাত্মিকতার সুসমন্বিত এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে মুফতী সাহেবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দীনের অনেক কাজ নিবেন, তাই তিনি মুফতী সাহেবকে নিজ এলাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রিয় শায়খের নির্দেশ পেয়ে মুফতী সাহেব তাঁর পিতার দেয়া ত্রিশ শতাংশ জায়গায় ২০ শাওয়াল ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৫ সনের ২২ মার্চ বুধবার একটি কওমী মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। উজানীর পীর হযরত মাওলানা মুবারক করীম সাহেব (রহ.) ও ফরিদাবাদ মাদরাসার সাবেক শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হাফীয (রহ.)সহ দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে এজামের বরকতময় হাতে এক অনাড়ম্বর রূহানী পরিবেশে খালেছ তাকওয়া ও ইখলাসের ওপর স্থাপিত হয় মাদরাসার ভিত্তি। ইখলাসের সে ঝলক এখন সবার চোখেই ধরা পড়ছে। মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে মাদরাসাটি দেশের প্রথম সারির দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় উন্নীত হয়েছে। অবকাঠামোগতভাবেও আশাতীত উন্নতি সাধন করেছে। ৩০ শতাংশের জায়গাটি বিস্তৃত হয়ে ৩০০ শতকে পৌঁছেছে। বর্তমানে আরও বিস্তৃত হচ্ছে এবং হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ! প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণ নাম জামিয়া কুরআনিয়া ইমদাদুল উলূম ফুলছোঁয়া।

প্রতি বছর মাদরাসার বিস্তৃত ময়দানে হযরত মুফতী সাহেবের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিন ব্যাপী ইসলাহী মাহফিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইশকে ইলাহীর সুরভি মেখে সুরভিত হওয়ার অদম্য বাসনা নিয়ে লোকজন ছুটে চলেছেন ফুলছোঁয়ার সুবাসভরা মাটিতে এবং শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বিত চর্চার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলছেন ফুলের মত। দেশের অন্যসব মাহফিলের চেয়ে বাস্তবিক অর্থেই ব্যতিক্রম এই মাহফিল। অজস্র অর্থকড়ি ব্যয় করে অনুষ্ঠিত দেশের অসংখ্য ওয়াজ মাহফিলের দশভাগ আয়োজনও যদি ফুলছোঁয়ার আদলে হত তবুও সাধারণ মুসলিম জনতা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আঁধার পেরিয়ে ইলমের সঠিক আলো গ্রহণ করে প্রকৃত দীনদার হওয়ার সুযোগ পেত।

কুরআন হাদীস ও ফিকহের উচ্চতর গবেষণা ও যোগ্য মুফতী তৈরির লক্ষ্যে ফরিদাবাদ মাদরাসার অদূরে আরসিন গেটে তিনি দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ নামে নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এর মাধ্যমে তিনি ইলমে দীনের এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির জন্য নিজস্ব জায়গারও এন্তেজাম হয়েছে। অর্থানুকূল্য ও প্রয়োজনীয় সামর্থ্য সাপেক্ষে আরও বড় ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে।

দরস-তাদরীস ও বয়ান-বক্তৃতার পাশাপাশি দীনি বিষয়ক অনেক লেখালেখির খেদমতও তিনি করেছেন। শিক্ষকতার শুরুর দিকে মাসিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়ীকিতে বেশকিছু প্রবন্ধ লিখেন। বেশিরভাগ লেখা মাসিক মদীনায় ছাপা হয়েছে। মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব হযরতকে বিশেষ স্নেহ ও আস্থার নজরে দেখতেন। ইতিমধ্যে হযরতের লেখা ছোট-বড় কয়েকটি জরুরি বই প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন জরুরি মাসায়েল, আধুনিক সমস্যার ইসলামী সমাধান, চল্লিশ হাদীস, মৌলিক আকীদা, পাঁচ ওয়াক্তের হাদিয়া ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম। আরও কিছু বই বের হয়েছে তাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধান ও নিপুণ সম্পাদনায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'মহিলাগণ কোথায় নামায আদায় করবেন', 'ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী ডাক্তার ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা'।

মানুষের হেদায়াত ও কল্যাণ কামনাই হল তাঁর জীবনের মৌলিক লক্ষ্য। পথহারা মানুষের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে কিভাবে গড়ে উঠে, সে সম্পর্ক কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয়–এই সাধনাতেই তিনি কর্মজীবনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সময় দিয়ে যাচ্ছেন। ফরিদাবাদ মাদরাসা মসজিদ, গেন্ডারিয়া সাধনা মসজিদ ও কুমিল্লা রানির বাজার মসজিদে একেক জুমার খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন মসজিদে নিয়মিত ইসলাহী প্রোগ্রাম করেন। সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার সাধনা মসজিদে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করেন। একইভাবে মাসিক প্রোগ্রামও রয়েছে প্রচুর। এক কথায় সুবিন্যস্ত রুটিনভিত্তিক নিয়মিত প্রোগ্রামে তাঁর পূর্ণ সময় ব্যয় হয়।

দুয়া করি, আল্লাহপাক হযরতকে এ পথে অটল অবিচল রাখুন এবং উম্মতকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

–আবদুল গাফফার শাহপুরী

সংকলকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

১.

২০০৩ সালের কোনো এক শুক্রবার। নারায়ণগঞ্জের সর্ববৃহৎ ও দেশের প্রাচীনতম মাদরাসা জামি'আ আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ-এর জামে মসজিদে মাগরিব নামায আদায় করলাম। শ্বশুরালয়ে বেড়াতে আসার সুবাদে এ সুযোগ মাঝে মধ্যেই হয়। আজ আরো একটি বাড়তি সুযোগ হাতে এলো। যাকে বলা যায় 'সুবর্ণ সুযোগ'। নামাযের পর মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকসহ এলাকার মুসল্লিগণ মিম্বরের দিকে এগিয়ে বসলেন। মিম্বরে আরোহন করলেন সুন্নতি লেবাসে আচ্ছাদিত একজন মধ্যবয়সী আলেম। মধ্যগড়নের শ্যামবর্ণের অথচ জ্যোতির্ময় নূরানী চেহারা। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠে হৃদয়কাড়া দরদপূর্ণ আওয়াজে সাদামাটা ভাষায় বয়ান শুরু করলেন। পূর্ব থেকে বয়ানে বসার কোনো ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আমার ছিল না। কৌতূহলবশত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বসলাম। বয়ানের অভাবিতপূর্ব ধাঁচ ও বিষয়বস্তুর যাদুময় আকর্ষণ আর আমাকে উঠতে দিল না। তন্ময় হয়ে ইশা পর্যন্ত পূর্ণ বয়ানটুকু শুনলাম। বয়ানের মাঝে মাঝে অপূর্ব মধুমাখা সুরে দু'একটি আরবী-উর্দূ-ফার্সী কবিতার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি সে আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বয়ানের পর যখন পরিচয় জেনেছি তখন নিজেকে ধন্য মনে করেছি। আল্লাহর অনেক শোকর আদায় করেছি। কারণ এ মহান ব্যক্তিটি আমার জানা-শোনা প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম। নামধাম শুনেছি অনেক, অবদান ও কৃতিত্বের গল্প শুনেছি বিস্তর। কেবল চোখের তারায় এক নজর দেখা বাকি ছিল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আজ প্রাণভরে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। এরপরের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ।

নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন মসজিদে মাসিক ইসলাহী মাহফিলগুলোতে যথাসম্ভব হাজির থাকার চেষ্টা করেছি। এক পর্যায়ে ফুলছোঁয়ার মাহফিলেও নিয়মিত

যাওয়ার সুযোগ এলো। যতই দেখি ততই মহব্বত লাগে, যতই শুনি ততই ভাল লাগে। ব্যক্তিত্বের বহুমুখী আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

২.

একাধিকবার চিন্তায় এসেছে হযরতের ইসলাহী বয়ানগুলোর লিখিত আকারে সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উম্মতের আরও বেশি ফায়দা হতে পারে। এরই মধ্যে হযরতের এক ভক্ত আমাকে বেশ কিছু বয়ানের অডিও ফাইল হাদিয়া দিলেন। সাথে আমাকে অনুলিপি তৈরি করারও পরামর্শ দিলেন। অযাচিতভাবে কিছু বয়ান পেয়ে যাওয়ায় আমার ইচ্ছাটি আরও প্রবল হল এবং এটাকে গাইবী ইশারা বলে মনে হল। কালবিলম্ব না করে মোবাইল থেকে শুনে শুনে কয়েকটি বয়ানের অনুলিপি তৈরি করলাম।

পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে একদিন ফরিদাবাদ মাদরাসায় হযরতের সাথে সাক্ষাত করলাম। আলোচনার এক ফাঁকে খুব সংকোচের সাথে দুরুদুরু মনে বিষয়টি জানালাম। আল্লাহর শোকর! হযরত শুনে আনন্দিত হলেন এবং কপিগুলো দেখতে চাইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে বের করে অনুলিপির পৃষ্ঠাগুলো হযরতকে দেখালাম। হযরত নেড়ে চেড়ে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখলেন আর বললেন, ভালো উদ্যোগ। কাজ সামনে অগ্রসর হওয়া চাই। সাথে এও বললেন, আরও অনেকে কাজ শুরু করেছে বলে শুনেছি। দেখি কে অগ্রগামী হয়। বুঝতে বাকি রইল না যে, হযরত কাজটি হওয়ার ব্যাপারে শুধু অনুমতিই দিলেন না; বরং উৎসাহ দিলেন। এখানেই শেষ নয়, হযরতের কাছে সংরক্ষিত বয়ানের তিনটি অডিও সিডি আমাকে দিলেন। সেগুলোতে কয়েকশত বয়ান ছিল। কপি করে অতি দ্রুত ফেরত দেয়ার শর্তে সিডিগুলো নিয়ে আসি।

হযরতের সদয় অনুমতি, আগ্রহ প্রকাশ ও বয়ানের সিডি দিয়ে সহযোগিতা আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত করল। অভাবিতপূর্ব এক উদ্দীপনার জোয়ারে ভাসতে শুরু করি। তাই মাদরাসার সবকের ফাঁকে ফাঁকে অনুলিপি তৈরির কাজ চালিয়ে গেলাম বেশ উদ্যমের সাথে।

৩.

২০১৬ ঈ. ফুলছোঁয়া মাহফিলের আগে অন্তত একটি ভলিয়ম প্রস্তুত করে প্রকাশের টার্গেট স্থির করলাম। মাঝে রমযানের ছুটিতে কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। একটি ভলিয়ম হওয়ার মত কাজ সম্পন্ন হল। কিন্তু এতো আমার একতরফা প্রস্তুতি। সময় করে হযরতকে দেখানো, অস্পষ্ট কিছু জায়গা স্পষ্ট করা, বিশেষভাবে হযরতের বয়ানের বিশেষ আকর্ষণ হৃদয়গ্রাহী আরবী, উর্দূ, ফার্সী নানা কবিতাগুলোর সঠিক বানান নিশ্চিতকরণ, প্রুফ দেখাসহ বিস্তর কাজ বাকি। হাতে সময় মাত্র একমাস। তারপরও যোগাযোগ রক্ষা করে চললাম। হযরত আশ্বাস দিলেন। প্রথম দফায় সবগুলো কবিতা নিজ হাতে সম্পাদনা করে দেন। কবিতাগুলোর বিশুদ্ধরূপ পেয়ে বয়ানগুলো যেন পূর্ণতার মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। আমার হিম্মতেও লাগে নতুন হাওয়া।

এরপরের ঘটনা আরো সুখকর। অপূর্ব শিক্ষণীয়। এর জন্য একটু ধৈর্য নিয়ে লেখাটির শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে।

কবিতাগুলোর সম্পাদিত কপি আমার হাতে তুলে দেয়ার সময় হযরত নিজ থেকেই বলেছিলেন, 'সবগুলো বয়ান আমাকে দেখাতে হবে'। আর আমিও তো এটাই চাই। কারণ হযরতের জীবদ্দশায় তাঁর বয়ান ছাপা হবে আর হযরতকে দেখিয়ে ছাপাতে পারব না–এটা বড়ই ব্যর্থতা বলে বিবেচিত হবে। অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমি দুয়েকদিনের মধ্যে পূর্ণ কপিটি হযরতকে দেখাব ইনশাআল্লাহ। হযরত সময় দিলেন ০৩/০২/২০১৬ ঈ. মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা।

যথাসময়ে ফাইলপত্র নিয়ে ফরিদাবাদ মাদরাসায় পৌঁছালাম। যাওয়ার পর হযরতের প্রস্তুতি ও আয়োজন দেখে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাই। ভাবতেও পারিনি আমার এ কাজটি হযরত এতটা গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। প্রথমে আমাকে জানালেন সম্পূর্ণ বইটি যেন আগাগোড়া দেখা হয়ে যায় এজন্য কয়েকজন আস্থাভাজন আলেমকে দাওয়াত করা হয়েছে। তারা পৌঁছলে কাজটি শুরু হবে। এর আগ পর্যন্ত হযরত একটি জরুরী পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। পরামর্শ সভা শেষে আমন্ত্রিত আলেমগণ সবাই হযরতের ছোট্ট কামরায় গাদাগাদি করে বসলেন। তাঁরা হলেন- ফরিদাবাদ মাদরাসার মুহাদ্দিস মুফতী ইমাদুদ্দীন সাহেব, লালমাটিয়া মাদরাসার প্রধান মুফতী ও শাইখে সানি মুফতী নূরুল আমীন সাহেব, আমলাপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মুফতী নেয়ামতুল্লাহ সাহেব, ঢাকা জেলা মজলিসে হেদায়েতুল ইসলামের আমীর মাওলানা ইসহাক সাহেব, দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদের শিক্ষক মাওলানা ইকবাল সাহেব, চৌধুরীপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাহেব।

এতগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে একমাত্র আমিই সাধারণ। খুব আড়ষ্ট বোধ করছি। সেই সাথে গর্বিতও বোধ করছি। এ সামান্য একটু খেদমতের সুবাদে আল্লাহপাক বিশিষ্টদের পাশে এনে বসিয়েছেন। হযরত নিজেও বসলেন। প্রথমে সবার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে বললেন– আপনারা ভাগাভাগি করে বয়ানগুলো দেখে দিন। আপনাদের চোখে কোনো অসঙ্গতি ধরা না পড়লে আমিও আশ্বস্ত হব। ভাষা ও সাহিত্যগত বিষয়টি তেমন দেখতে হবে না। মৌলিকভাবে বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখবেন। আর এক্ষেত্রেও একটি নীতির অনুসরণ করবেন। সেটি এই যে, কোনো দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট কথা সম্পাদনার চেয়ে ঐসব কথা বিশেষভাবে সম্পাদনা করবেন যেগুলো থেকে কোনো ভুল বিষয়ের নিসবত করা যায়। পাঠক কোনো কথা না বুঝলে তেমন সমস্যা নেই, কিন্তু ভুল বুঝলে মারাত্মক সমস্যা হবে।

সকলের হাতে বয়ানের অনুলিপি তুলে দিলাম। আবদুল্লাহ ভাই রঙ্গিন কয়েকটি কলম হাদিয়া দিয়ে মহতী কাজের অংশীদার বনে গেলেন অতি সহজে। যালিকা ফাযলুল্লাহ!

সবাই গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলেন। হযরত আমাকে বললেন, আপনিও কোনো একটি অংশ দেখতে থাকুন। যত দেখবেন ততই ফায়দা হবে। সকলেই দেখছেন। যার নজরে যা ধরা পড়ছে সম্পাদনা করছেন কিংবা আমার সাথে সরাসরি মতবিনিময় করছেন। এভাবে টানা আছর নামায পর্যন্ত দেখার কাজ চলল। প্রায় পুরোটাই দেখা হয়ে যায়।

৪.

এবার আসা যাক নামের প্রসঙ্গে। আমি পূর্ব থেকে খসড়া হিসেবে একটি নাম লিখে রেখেছিলাম 'মাওয়ায়েজে আবু সাঈদ'। এটা হযরত পছন্দ করেননি। তাই সেদিন আছরের পর নামের ব্যাপারে হযরত সম্পাদনা বোর্ডের মতামত জানতে চাইলেন। প্রায় ১২টি নাম প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে দু'টি নামের যে কোনো একটির ব্যাপারে সকলেই মতামত দিলেন। ১. ইসলাহী মাওয়ায়েজ ২. তরবিয়তী বয়ান। প্রথম নামটি মুফতী ইমাদুদ্দীন সাহেব আর দ্বিতীয় নামটি মুফতী নূরুল আমীন সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন। উভয়ে নিজেদের প্রস্তাবিত নামের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে হযরতের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু হযরত উভয়টি নাম নাকচ করে দিলেন। কারো যুক্তিতে প্রভাবিত হলেন না। যে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নাম দু'টি নাকচ করলেন তা তুলে ধরাই হল আমার এত বিশাল কারগুজারির উদ্দেশ্য। এ বইয়ের নাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে হযরতের যে আবদিয়্যাত ও বিনয় প্রকাশ পেয়েছে তা এ যুগে খুবই বিরল।

হযরত বললেন, 'ইসলাহী মাওয়ায়েজ' নাম থেকে বুঝে আসে যে, বয়ানকারী নিজেকে 'মুসলিহ' দাবি করছে। নিজের ব্যাপারে এমন দাবি করা সমীচীন নয়। আর 'তরবিয়তী বয়ান' নামটি থেকে বুঝে আসে বয়ানকারী একজন মুরব্বী। নিজেকে নিজে মুরব্বী ভাবাও ঠিক নয়। নাম হতে হবে সাদামাটা। তাতে কোনো আত্মপ্রচার না থাকতে হবে। 'কিছু দীনি কথা' এ ধরণের একটি নাম দিয়ে দিন। মুফতী ইমাদুদ্দীন সাহেব ও মুফতী নূরুল আমীন সাহেব এবারও পূর্বোক্ত দু'টি নামের যেকোনো একটি রেখে দেয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। হযরত মানলেন না। তারাও নাছোড়বান্দা। হযরত যুক্তিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য বললেন, এখন বিষয়টি স্থগিত রাখুন। পরে সিদ্ধান্ত দিব। সকলে উঠে গেলে মুফতী নেয়ামতুল্লাহ সাহেবকে ও আমাকে ডেকে বললেন, আপনারা দু'জন একমত হয়ে একটি সাদামাটা নাম দিয়ে দিন।

আমরা দু'জন বসে চিন্তা করতে লাগলাম। মুফতী নেয়ামতুল্লাহ সাহেব হযরতের মুখে উচ্চারিত 'কিছু দীনি কথা' নামটিই ভিন্নরূপে 'দীনি মাওয়ায়েজ' নামে প্রস্তাব করলেন। স্বপক্ষে যুক্তি দিলেন, দীনি শব্দের মাঝে ইসলাহ ও তরবিয়ত সবই আছে; কিন্তু আত্মপ্রচারের যে বিষয়টি হযরত অপছন্দ করছেন সেটি নেই। আমার কাছেও সুন্দর মনে হল। সাথে সাথে হযরতকে জানালাম। হযরত কোনো আপত্তি না জানিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন।

ফুলছোঁয়ার মাহফিল ২০১৬ সামনে রেখে বইটির কাজ চলছে। হাতে যে পরিমাণ সময় ছিল তাতে হিম্মত করলে ছাপানো যাবে। কিন্তু আমার সাধারণ এ কাজটির প্রতি হযরতের অসাধারণ গুরুত্ব ও যত্ন প্রদান আমাকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাবলাম কাজটি আরও সুন্দর ও মানসম্পন্ন করা চাই। সম্পাদনা পরিষদের দেখার পর আমি আরেকবার তাতে গভীর নজর দিলাম। অনেক কথা নতুনভাবে সাজালাম। আলোচিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি পেশ করলাম। এসব করতে করতে মাহফিল এসে যায়। কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই মাহফিলে গেলাম। বান্দা যা চায় তা হয় না, বরং আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং তিনি যখন চান তখনই হয়–এ বিষয়টি হযরতের সুহবতে থেকে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পেয়েছি। তাই তাড়াহুড়া না করে স্বাভাবিক গতিতেই কাজ চালিয়ে গেলাম। এদিকে বছরের শেষে মাদরাসায় সবকের চাপ বেশি থাকায় কাজ শেষ হতে আরও সময় লেগে গেল। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় এক পর্যায়ে কাজটি শেষ হল। প্রকাশিত হয়ে সূর্যের আলো দেখতে পেল।

বেশির ভাগ কবিতার অনুবাদ দেয়া হয়েছে। কিছু গদ্যে, কিছু পদ্যে। আর কিছু কবিতার অনুবাদ পেশ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছি। প্রায় প্রতিটি বয়ানের শেষে তারিখ ও স্থানের নাম দেয়া আছে। কিছু বয়ান তোহফায়ে ফুলছোঁয়া থেকে নেয়া হয়েছে। সেগুলোর তারিখ দিতে পারিনি। দু'টি বয়ানের অনুলিপি তৈরি করেছেন ফরিদাবাদ মাদরাসার উস্তাদ ধীমান নবীন আলিম মাওলানা যুবাইর আহমদ, যা মাসিক নেয়ামতে প্রকাশিত হয়েছে। এ কাজের সাথে যুক্ত সকলের কাছে আমি ঋণী। আল্লাহপাক সকলকে তাঁর শান অনুযায়ী বদলা দিয়ে খুশি করে দিন।

সরাসরি মজলিসে হযরতের যবানে বয়ান শুনলে হৃদয়ে যেমন আবেগতরঙ্গ সৃষ্টি হয় আমার লেখায় তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরতের উচ্চারণে যে দরদ-ব্যথা, তড়প, ব্যাকুলতা, প্রাণ ও রুহ রয়েছে তা আমি কোথায় পাবো। আমি আমার সাধ্যমত মূলভাবটা উদ্ধার করে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি, আল্লাহ যেন এ খেদমতটুকু কবুল করে নেন এবং এটাকে আমার নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করেন। হযরতের মজলিসের বয়ান দ্বারা শ্রোতাবৃন্দ যেমন উপকৃত হয়ে থাকেন, লিখিত বয়ান দ্বারাও যেন পাঠকবৃন্দ সমানভাবে উপকৃত হতে পারেন। বিশেষভাবে হযরত মুফতী সাহেব দা. বা.-এর স্নেহের ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করেন। হযরতকে সিহহত ও আফিয়তের সাথে উম্মাহর ইসলাহ ও তালকীনের কাজ বেশি বেশি করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

দেওভোগ মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ

আবদুল গাফ্ফার শাহপুরী
৭ রজব, ১৪৩৭ হি.

বাদ আসর

আমাদের কথা

সত্যিকার ওয়ারিসে নবী হিসেবে দীনের হেফাযত, প্রচার-প্রসার ও বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে এবং মানবাত্মার কাঙ্খিত উন্নয়নে আমাদের দেশে যাঁরা বহুমুখী অবদান রেখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে আমাদের প্রিয় শায়খ হযরত মুফতী আবূ সাঈদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। যাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এ বইয়ের শুরুতে তুলে ধরা হযেছে। শরীয়ত ও তরীকতের সুসমন্বয়ে তিনি তাসাউফ ও আধ্যাত্মসাধনাকে একটি সঠিক পন্থায় এনে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। এ অঙ্গনে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার প্রান্তিকতামুক্ত মেযাজ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন খুব সচেতনতার সাথে। বাস্তবেই তিনি আকাবিরে উম্মতের উজ্জ্বল নমুনা, যা তাঁর ইলমে ওয়াহীর গভীর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, লিখনী, অনুবাদ, সম্পাদনা, মসজিদ-মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোর মজলিসে শূরার সভাপতির দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়া; দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ-নসীহত ও ইসলাহী বয়ান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড থেকে প্রতিভাত হয়।

শায়খের দীনি বহুমুখী খেদমত থেকে নিজেদের ঈমান, আমল, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক ইত্যাদি পরিশুদ্ধ করে এবং দীনের এসব খেদমত অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শায়খের অনুমতি সাপেক্ষে 'মজলিসে হেদায়াতুল ইসলাম' নামে একটি মজলিস গঠিত হয়; যার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আত্মশুদ্ধি, দীনি দাওয়াত ও সেবামূলক মজলিস। কিন্তু এ মজলিস গঠিত হওয়া সত্ত্বেও শায়খের চলমান বহুমুখী দীনি খেদমতসমূহ লিপিবদ্ধ করার তাগিদ ও উপলব্ধি আমাদের হয়নি। এমনকি বিজ্ঞানের এ যুগে হযরতের বয়ানগুলো রেকর্ড করে তা ছাপিয়ে নিজেরা উপকৃত হওয়া এবং অন্যদেরকে এ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগও করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

আলহামদু লিল্লাহ! দেরীতে হলেও আমাদের প্রিয় শায়খের একজন ভক্ত, নারায়ণগঞ্জ দেওভোগ মাদরাসার তাফসীর ও হাদীসের শিক্ষক, নবীন আলেমে দীন ও সুলেখক হযরত মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী সাহেব ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে সুযোগটি সৃষ্টি করে আমাদেরকে জাগ্রত করেছেন। নিরন্তর সাধনা ও ঐকান্তিকতায় হযরতের বহুমুখী খেদমতের কিঞ্চিত ঝলক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শায়খের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বয়ান ব্যক্তিগতভাবে মোবাইল ফোনে রেকর্ডকারীদের মেমোরী থেকে উদ্ধারপূর্বক সংকলন করে লিপিবদ্ধ করার খেদমতটুকু বেশ সফলতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সংকলককে জাযায়ে খায়ের দান করুন। মজলিসে হেদায়াতুল ইসলামের প্রকাশনা বিভাগ এ অনবদ্য সংকলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ ও প্রচার করে কিছুটা হলেও দায়মুক্ত হয়েছে বলে মনে করি। এ কাজের সাথে যুক্ত সকলকে আল্লাহ তাআলা উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

তারিখ : ১৪ শাবান, ১৪৩৭ হি.

মুহাম্মদ ইসহাক
নাজেমে উমূমী
মজলিসে হেদায়াতুল ইসলাম বাংলাদেশ

এ খণ্ডের বয়ান.....

০১. আমরা সবাই আখেরাতের মুসাফির
০২. ফরযে আইন পরিমাণ ইলম সবাইকে শিখতে হবে
০৩. আল্লাহর মহব্বত
০৪. সন্দেহজনক বিষয়ও বর্জনীয়
০৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নফসের ধোঁকা
০৬. মসজিদ : মাগফিরাতের ঠিকানা
০৭. তাজকিয়ায়ে নফস
০৮. আত্মশুদ্ধির ফিকির
০৯. আল্লাহ আমার রব
১০. ওযু ও নামাজ প্রশিক্ষণ
১১. ইলম অর্জনের পথে সাধনা
১২. ইলম অনুযায়ী আমল : গুরুত্ব ও মর্যাদা
১৩. মানুষের মূল্য
১৪. মানুষের যোগ্যতা
১৫. তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের পাথেয়
১৬. ঈমানের স্বাদ
১৭. কুরআনী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা
১৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি
১৯. আমাদের ব্যবহারিক শব্দও ইসলামী ভাবধারার হওয়া উচিৎ
২০. মুসলিম পারিবারিক জীবন
২১. সফরে আখেরাত (মৃত্যু ও কাফন-দাফন)
২২. জিকির : হৃদয়ের প্রশান্তি
২৩. আল্লাহর মহব্বত লাভের গুরুত্ব ও উপায়
২৪. মাহে রামাযান : তাকওয়া অর্জনের ভরা মৌসুম

সূচীপত্র

আমরা আখেরাতের মুসাফির/২৫

মুসাফিরের অর্থ/২৫
মুমিনের জীবন তিনটি/২৭
দুনিয়ার সফর/২৭
আখেরাতের সফর/২৮
আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সফর/২৮
তাকওয়ার ভেতর নজরদারীর ইঙ্গিত রয়েছে/২৯
কলুর বলদের মত চললে পথ ফুরাবে না/২৯
দীনের পথে অস্পষ্টতা নেই/৩০
আমি সামনে অগ্রসর হাচ্ছি তো!/৩০
মুমিন থেকে ঈমান আলাদা হয় না/৩০
শিক্ষণীয় ঘটনা/৩১

ফরযে আইন পরিমাণ ইলম সবাইকে শিখতে হবে/৩৩

পরিবারের সবাইকে দীনদার হতে হবে/৩৪
আকাইদ সম্পর্কে জানতে হবে/৩৫
পরিবারের সকলের আকীদা-বিশ্বাস এক হওয়ার ফায়দা/৩৬
ইবাদতের পদ্ধতি জানতে হবে/৩৬
মুআমালাত সম্পর্কে ইলম শিখতে হবে/৩৮
মুসলমানের বিবাহ-শাদী কেমন হবে/৩৮
বিবাহের পদ্ধতি বিধর্মীদের কাছ থেকে ধার করে আনতে হবে না/৩৯
কনে দেখার নিয়ম/৩৯
আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিধান জানতে হবে/৪০
মোয়াশারাত সম্পর্কে জানতে হবে/৪২
বিচার-প্রশাসনের বিধানও জানতে হবে/৪২
ইলম সবাইকে শিখতে হবে/৪২
ইলম অর্জনের গুরুত্ব/৪৩
ইলমী মু'জিযা/৪৩

ইলমী মাহফিল/৪৪

আল্লাহর মহব্বত/৪৫

দুনিয়ার সাময়িক বিদায় যেন সবক হয় চির বিদায়ের/৪৫
অনন্ত অসীম সফরের সঞ্চয়/৪৬
আল্লাহ নিজে বান্দার সাক্ষাত কামনা করেন/৪৬
আল্লাহর দীদারে অধীর যারা/৪৮
চারিদিকে গুনাহ ও ফেতনার সয়লাব চলছে/৫২
আল্লাহকে পেতে হলে মেহনত করতে হবে/৫৩
তাকওয়া অনুযায়ী চলতে চাইলে আল্লাহ উপায় বের করে দেন/৫৩

সন্দেহজনক বিষয়ও বর্জনীয়/৫৫

তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র/৫৫
হালাল-হারাম সুস্পষ্ট/৫৭
সন্দেহযুক্ত বিষয়/৫৭
মাসআলা জানতে হবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে/৫৭
সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জনে দীন ও ইজ্জতের সুরক্ষা/৫৮
সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কুফল/৫৯

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নফসের ধোঁকা/৬১

মসজিদে বসে থাকাও ইবাদত/৬১
মুসলমানের সমাবেশ/৬২
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য/৬৩
ইবাদতের অর্থ/৬৪
আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলী/৬৪
মাওলার সন্ধানে/৬৫
ইখলাস : ইবাদতের রুহ/৬৫
ইখলাসের আলামত/৬৬
নফসের ধোঁকা খুবই সূক্ষ্ম/৬৮
কয়েকটি ঘটনা/৬৮
আরেকটি ঘটনা/৭০
নফস ও শয়তান/৭১
ইসলাহে নফস বনাম ইসলাহে শয়তান/৭২
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়/৭২
নফসের ব্যাপারে আমৃত্যু সতর্ক থাকতে হবে/৭৪

দীনি কাজ বদদীনি পন্থায় করা যাবে না/৭৫
নিজে আমল করুন এবং অন্যের ব্যাপারে মন্তব্য বর্জন করুন/৭৬
লজ্জাশীলতার বিরল দৃষ্টান্ত/৭৭
মা যখন আল্লাহওয়ালা হোন/৭৮

মসজিদ : মাগফিরাতের ঠিকানা/৮২

মসজিদ আল্লাহর ঘর/৮১
মসজিদপ্রেমিক আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে/৮৩
দুনিয়ার মসজিদসমূহ কাবা শরীফের শাখা/৮৩
রওজা শরীফের মর্যাদা/৮৪
মসজিদের বরকতময় আমলী পরিবেশ/৮৫
মসজিদের প্রয়োজনীয়তা/৮৬
মসজিদ নির্মাণকারী ভাগ্যবান/৮৬
দারুল উলূম দেওবন্দের ঘটনা/৮৮
দাতাদের ইখলাস নষ্ট করবেন না/৯০
কেন এ মসজিদ/৯০
মসজিদ দেখে খুশি হওয়া চাই/৯১
মসজিদকে মহব্বত করতে হবে/৯২
হযরত ওমর (রা.)-এর মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার ঘটনা/৯২
জান্নাত খরিদ করতে হলে মসজিদে আসুন/৯৩
ইমাম-মুয়াজ্জিনকে মহব্বত করতে হবে/৯৩
আখেরাতের সুখই হল আসল সুখ/৯৩
ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ/৯৫
দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত মসজিদ কেন্দ্রিক/৯৬
মসজিদে প্রবেশকারী আল্লাহর মেহমান/৯৭
আল্লাহপাকের মেহমানদারী/৯৮
ক্ষমা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহপাকের রয়েছে/৯৮
ঘটনার শিক্ষা/১০২
অতিরিক্ত উপহার/১০৩
মসজিদকেন্দ্রিক আমল/১০৪
নবী যুগে মসজিদে নববীর আয়তন/১০৪
মসজিদে কূবা ও মসজিদে নববীর নির্মাণ/১০৫

তাযকিয়ায়ে নফস/১০৮

কে সফলকাম/১০৮
কালবে সালীম কী/১২০

হযরত ওমর (রা.)-এর আত্মশুদ্ধির ফিকির/১২০
আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.)-এর আত্মশুদ্ধির ফিকির/১২০
কালবে সালীম/১২৩
কেউ মন্দ বললে করণীয়/১২৪
বিদআতী ইমামের পিছে নানুতবী (রহ.)-এর নামায আদায়/১২৪
দিল সংশোধনে সিরিয়াস হতে হবে/১২৬

আত্মশুদ্ধির ফিকির/১২৮

বংশগৌরব ছেড়ে আমলের ময়দানে সাধনা কর/১২৮
মানুষ কাকে বলে/১২৯
শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)-এর আত্মশুদ্ধির ঘটনা/১৩০
আত্মশুদ্ধির জন্য রিকসা চালানো/১৩৪

আল্লাহ আমার রব/১৩৬

আল্লাহপাক যা চান তাই হয়/১৩৭
আমার কাজ ক্ষমা চাওয়া/১৩৮
রব কাকে বলে/১৪০
ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় রাখুন/১৪২
ঈমানী সম্পর্কের সুফল/১৪৫
পেছনে তাকাবেন না/১৪৬

ওযু ও নামায প্রশিক্ষণ/১৫১

বন্দেগী ও বন্দেগীর পদ্ধতি/১৫১
নামায স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইবাদত/১৫২
নামাজের গুরুত্ব/১৫২
মুসলমান মাত্রই নামাযী হতে হবে/১৫৩
প্রতিষ্ঠালগ্নে মসজিদে নববীর আয়তন/১৫৩
জামে মসজিদের অর্থ/১৫৫
জুমার নামাযের হেকমত/১৫৫
ওযু প্রশিক্ষণ/১৫৭

ওযু ও নামাযের জরুরী মাসায়েল/১৬১

ওযুর সুন্নতসমূহ/১৬১
ওযুর মুস্তাহাব ও আদবসমূহ/১৬২
দাড়ি খিলাল করার পদ্ধতি/১৬২
হাতের অঙ্গুলি খিলাল করার পদ্ধতি/১৬২
মাথা ও কান মাসেহ করার পদ্ধতি/১৬৩
মাথা মাসেহ এভাবেও করা যায়/১৬৩

পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করার পদ্ধতি/১৬৩
নামায পূর্ব শর্ত (ফরয) ৭টি/১৬৩
নামাযের মধ্যে ফরয ৬টি/১৬৪
নামাযের ওয়াজিবসমূহ/১৬৪
নামাযের সুন্নতসমূহ/১৬৬
নামাযের মুস্তাহাব ও আদবসমূহ/১৬৯
নামায পড়ার পদ্ধতি/১৭০
একাকী ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি/১৭০
জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি/১৭২
ইমামতি করার পদ্ধতি/১৭৩
বিতির নামায পড়ার পদ্ধতি/১৭৩
সুন্নত ও নফল নামায পড়ার পদ্ধতি/১৭৩
মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি/১৭৪

ইলম অর্জনের পথে সাধনা/১৭৭

সৃষ্টিকুল মানুষের কল্যাণেই সৃজিত/১৭৮
সাপ কেন সৃষ্টি করা হল/১৭৯
মশা-মাছি কেন সৃষ্টি করা হল/১৮০
বুদ্ধিমান কে/১৮১
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য/১৮২
ইলম শেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/১৮৩
ইলম শিখতে হয় সাধনা করে/১৮৩
শিক্ষণীয় ঘটনা/১৮৪
বুদ্ধিমান তালেবুল ইলম/১৮৬
কওমীতে পড়েও সরকারী মাদরাসায় পরীক্ষা দেয়া/১৮৬
একটি ঘটনা/১৮৭
রিযিক আল্লাহর হাতে/১৮৮
ইলমের সর্বনিম্ন পরিমাণ/১৮৯
ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা/১৯০
প্রকৃত ইলম কোনটি/১৯১
ইলমের শান বজায় রাখতে হবে/১৯১
দু'টি কিতাব পড়ুন/১৯২
সৎসঙ্গ গ্রহণ করবে/১৯২
সার্টিফিকেট লাভের নেশায় পড়বে না/১৯৩
তালেবুল ইলমগণ আল্লাহর হাতে লাগানো চারাগাছ/১৯৪
খাবারের শেকায়েত করবে না/১৯৪
কোনো সংগঠনে ভর্তি হবে না/১৯৫
আমরা সাবই এক সংগঠনের সদস্য/১৯৬

ইলম অনুযায়ী আমল : গুরুত্ব ও মর্যাদা/১৯৭

মুমিন ও আলেম উভয়ের মর্যাদা উঁচু করার ঘোষণা/১৯৮
প্রকৃত ইলম কোনটি/১৯৮
ঈমানদারের মর্যাদা/১৯৯
কাবা শরীফের অপূর্ব সম্মান/২০০
কেবল আল্লাহর বান্দী বিবেচনায় স্ত্রীকে ক্ষমা/২০১
সবার জন্য ইলম/২০১
আলেমের মর্যাদা/২০৩
ইলম অনুযায়ী আমল করার সুফল/২০৪
হযরত নানুতবী (রহ.)-এর ঘটনা/২০৪
দাড়ি রাখা ওয়াজিব/২০৭
সুন্নতের অর্থ/২০৭
তাফসীর অধ্যয়নে সতর্কতা জরুরী/২০৮
দুনিয়া মুমিনের স্বদেশ নয়/২০৯
হিন্দুস্তান আমাদের/২১০
হিন্দুস্তানে সুগন্ধিময় বস্তুর প্রাচুর্য কেন/২১১
মু'মিনের স্বদেশ হল জান্নাত/২১১
মু'মিনের ভবিষ্যত/২১৩

মানুষের মূল্য/২১৫

মুমিনের আনন্দঘন মুহূর্ত/২১৫
মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রা.)-এর ঘটনা/২১৬
দীনের নামে বদদীনি মাহফিল/২১৭
একটা শিরকী কথা/২১৮
শরীয়াত ছাড়া মারেফাত/২১৯
উদ্দেশ্যও একটি, পন্থাও একটি/২১৯
ইসলাহী মাহফিলের অর্থ/২১৯
কী সংশোধন করা হবে/২২০
হিংস্র জন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট কী জিনিস/২২০
নবীদের কর্মক্ষেত্র/২২১
মানুষের মর্যাদা ও যোগ্যতা/২২১
দুনিয়ার হাকীকত/২২৬
দুনিয়া কাকে বলে/২২৯
প্রয়োজন বনাম লোভ/২২৯

মানুষের যোগ্যতা/২৩১

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য/২৩১

আমানত কী?/২৩২
সবচেয়ে বড় মাখলুক/২৩২
আসমানের বিশালতা ও পুরুত্ব/২৩২
যে কারণে সবকিছু মানুষের সেবক/২৩৫
আমানত গ্রহণ করেও জালেম ও জাহেল!/২৩৫
মানুষের যোগ্যতা/২৩৬

তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের পাথেয়/২৩৯

তাকওয়ার অর্থ/২৪০
তাকওয়ার ফায়দা/২৪০
কাফেরের সম্পদ কখন গনীমত হয়/২৪১
তাওয়াক্কুল কী/২৪১
তাওয়াক্কুলের সাথে দীনের কাজে নিয়োজিত হতে হবে/২৪২
তাওয়াক্কুলের ফায়দা/২৪৩
বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর তাওয়াক্কুল/২৪৩
দাওয়াতের মেহনত চলছে তাওয়াক্কুলের উপর/২৪৪
কওমী মাদরাসাগুলো তাওয়াক্কুলের জ্বলন্ত উপমা/২৪৫
চাঁদা করা হয় কেন/২৪৫

ঈমানের স্বাদ/২৪৭

তিন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পায়/২৪৭
হযরত মুয়ায (রা.)-কে নবীজির অন্তিম উপদেশ/২৪৮
তাকওয়ার প্রথম স্তর/২৪৯
দীনি আলোচনার ফায়দা/২৪৯
ঈমানের স্বাদ কী/২৫০
ইবাদতের স্বাদ/২৫০
গোনাহ বর্জনেও মজা রয়েছে/২৫১
ঈমানের স্বাদ পেতে হলে বিপদাপদে ধৈর্য ধরতে হবে/২৫২
সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা/২৫২
ঈমানের স্বাদ পেতে হলে/২৫৩

কুরআনী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা/২৫৭

মানুষের আসল প্রাণ/২৫৭
ইলমে অহীর স্থান/২৫৯
কুরআন সংরক্ষণকারী বাহিনী/২৬২

সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি/২৬৫

রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে/২৬৫
আল্লাহর মর্জি বুঝতে হবে/২৬৬
বিপদ-আপদ দেয়ার কারণ/২৬৭

আমাদের ব্যবহারিক শব্দগুলোও ইসলামী ভাবধারার হওয়া উচিৎ/২৭০

ভাষা মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য/২৭০
ভাষা ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা/২৭২
ভাষা মানুষের মর্যাদাপ্রকাশক/২৭২
ভাষা ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের সাথে
সভ্যতার আমদানী হয়/২৭৪
ভাষার ক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ/২৭৫
শব্দের উপর শরীয়তের অনেক হুকুম জারী হয়/২৭৬
মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ/২৭৬
কিছু উপমা/২৭৭

মুসলিম পারিবারিক জীবন/২৮৬

বাদ ফজরের আমল ও একটি হাদীসের ব্যাখ্যা/২৮৭
সন্তান বালেগ হয় কখন/২৮৯
মীরাছ বণ্টনের ইসলামী নীতি/২৮৯
বিবাহ : পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তি/২৯১
বিবাহের উদ্দেশ্য/২৯২
স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দীনি সহযাত্রী/২৯৩
জীবনসঙ্গী কেমন হওয়া চাই!/২৯৪
ঈসালে সওয়াবের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা/২৯৫
বর-কনের কুফু মিলতে হবে/২৯৬
দাম্পত্য জীবনে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়/২৯৭
আনন্দের মাঝেও আল্লাহকে ভোলা যাবে না/২৯৮
প্রথম সাক্ষাতে করণীয়/৩০০
স্ত্রীকে দীন শেখানোর দায়িত্ব স্বামীর/৩০১
সন্তান গর্ভে থাকাবস্থায় করণীয়/৩০১
সন্তানের হক/৩০৩
মেয়ে সন্তানের অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিন/৩০৪

সফরে আখেরাত [মৃত্যু ও কাফন-দাফন]/৩০৬

দুনিয়ার সফর ও আখেরাতের সফর/৩০৬
জন্মই মৃত্যুর সংবাদ দেয়/৩০৭
আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ বাণী/৩০৭
সর্বশেষ বাণীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত/৩০৯
আখেরাতই নিকটবর্তী/৩১০
একটি মর্মান্তিক ঘটনা/৩১৩
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে/৩১৪
সুন্দর মৃত্যু পেতে হলে যা করণীয়/৩১৬

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে/৩১৮

ওসিয়ত/৩১৮
রোগ/৩১৯
মুমূর্ষু অবস্থায় করণীয়/৩২০
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া/৩২২
গোসলের সুন্নত তরীকা/৩২২
কাফন প্রসঙ্গ/৩২৩
মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে করণীয়/৩২৪
জানাযার নামায/৩২৫
নামাযে জানাযা পড়ার নিয়ম/৩২৬
কতিপয় জরুরী মাস্আলা/৩২৬
লাশ বহন করার নিয়ম/৩২৭
সুন্নত তরীকার কবর/৩২৮
দাফনের বিধান/৩২৯
কবর জিয়ারত/৩২৯
নামায-রোযার ফিদিয়া বা কাফ্ফারা/৩৩০
মৃত ব্যক্তিকে ছাওয়াব পৌঁছানোর উত্তম পদ্ধতি/৩৩০
প্রচলিত বিদআত-কুসংস্কার/৩৩০

যিকির : হৃদয়ের প্রশান্তি/৩৩৩

যে আমলটি বেশি করার তাগিদ এসেছে/৩৩৩
শান্তির ঠিকানা/৩৩৪
যিকিরের স্তর/৩৩৫

আল্লাহর মহব্বত লাভের গুরুত্ব ও উপায়/৩৪২

মানুষের দুর্বলতা ও সক্ষমতা/৩৪২

মানুষের এত দাম কেন/৩৪৩
দিলের ক্ষমতা/৩৪৪
আল্লাহর মহব্বত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে/৩৪৬
আল্লাহর মহব্বত আত্মিক রোগের মহৌষধ/৩৩৪৬
মানুষের দিলে এক সাথে দু'জনের ক্ষমতা চলে না/৩৪৮
মানবদেহ একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী/৩৪৮
কলব : দেহ রাজ্যের রাজধানী/৩৫০
শয়তানী রাজত্ব উৎখাত করতে মুজাহাদা/৩৫১
মুজাহাদার পদ্ধতি/৩৫২
আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নিরাপদ রাস্তা/৩৫৩
আলোচনার সারকথা/৩৫৫

মাহে রামাযান : তাকওয়া অর্জনের ভরা মৌসুম/৩৫৭

কাঙ্ক্ষিত রমাযান/৩৫৭
আল্লাহ আমাদের দেহ ও রূহ উভয়ের রব/৩৫৮
ঈমানী বন্ধন/৩৫৯
রোযার বিধান/৩৫৯
রোযার উপকারিতা/৩৬০
তাকওয়া কী/৩৬০
রোযার বিশেষ উপকারিতা/৩৬১
রোযা রাখতে হবে সবর ও মহব্বতের সাথে/৩৬২

তওবার হাকীকত/৩৬৩

তাড়াতাড়ি ঘুমানো ইসলামী কালচার/৩৬৩
অন্যের উপকার করার নীতিমালা/৩৬৪
তওবার হাকীকত/৩৬৬
নিরাশ হওয়া যাবে না/৩৬৬
মানুষমাত্রই গুনাহগার/৩৬৮
উত্তম গুনাহগার/৩৬৯
তওবার পর ফের গুনাহ হলে/৩৭০
নিরাশ হওয়া যাবে না/৩৭১
গুনাহের চার সাক্ষী/৩৭২
তওবা দ্বারা গুনাহের চিহ্ন মুছে যায়/৩৭৩
অতীত গুনাহের স্মৃতিচারণ ভালো নয়/৩৭৪
সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে/৩৭৬

পরিশিষ্ট/৩৬৩

সফরের কতিপয় আদব/৩৭৮

সফর সংক্রান্ত জরুরী হেদায়াত/৩৭৯
সকাল-সন্ধ্যার দশটি আমল/৩৮০
বাইআত বা মুরীদ হওয়ার পর করণীয়/৩৮৩
শাজারা/৩৮৩
দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ কী ও কেন?/৩৮৪

আমরা আখেরাতের মুসাফির

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [1]

صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ . سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন, শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ ও দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হল দীন। এ দীনের নিসবতে এবং মহব্বতে আমরা এ পর্যন্ত সফর করে এসেছি।

মুসাফিরের অর্থ

পৃথিবীতে আমরা সকলেই মুসাফির। মুসাফির দুই অর্থে। আমরা প্রায়ই নানা প্রয়োজনে এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় যাতায়াত করি। এ যাতায়াতকে আমরা সফর বলি। যে সফর করে তাকে মুসাফির বলি। এই অর্থে সহজেই আমরা মুসাফির শব্দটি বুঝি। আরেক অর্থে আমাদের দুনিয়ার পুরো হায়াতটাই মুসাফিরের জীবন। দুনিয়াতে আমরা পরকালের দিকে সফর করছি। দুনিয়া আমাদের স্বদেশী জীবন নয়; বরং এটা আমাদের পরদেশী জীবন। আমাদের আদি পিতা ও আদি মাতা জান্নাতে ছিলেন। বলতে গেলে আমরা জান্নাত থেকেই এসেছি। নশ্বর

১. সূরা হাশর, আয়াত নং- ১৮

দুনিয়ার সামান্য জীবন কাটিয়ে আমাদেরকে আবার জান্নাতেই ফিরে যেতে হবে। এ হিসেবে আমাদের দুনিয়ার পুরো হায়াতটাই মুসাফিরী হায়াত।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনব্যাপী কাজকর্ম, কথা-বার্তা সবকিছুর মাঝে এ বিষয়টি ফুটে ওঠত যে, দুনিয়ার হায়াত আসলে আমার চিরদিন থাকা বা ভোগের হায়াত নয়। এটা আমার পরদেশী জীবন। এক হাদীসে উম্মতকে নসীহত করে তিনি বলেন–

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ [2]

অর্থাৎ দুনিয়াতে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে তোমার ধারণাটা যেন এমন হয় যে, তুমি একজন পরদেশী মুসাফির। তুমি বিদেশী, স্বদেশী নও। অথবা এ ধ্যান-ধারণা রাখ যে, তুমি একজন পথচারী।

পথচারীর অবস্থাটা মানুষ সহজে বোঝে। কেউ কোনো এক জায়গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। দূরের পথ। পথে একটু বিশ্রামের জন্য বসতে হয়। দুনিয়াতে আমাদের অবস্থাও অনুরূপ। আমরা পথচারী। অন্য জায়গার মানুষ, দুনিয়া অতিক্রম করে সেখানে যেতে হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সফরে কোথায় ঘুমালাম, কেমন কক্ষে বিশ্রাম নিলাম কিংবা কী খেলাম–এসব কেউ ভাবে না। বরং সফরেও আপন নিবাসের কথাই ভাবে। যেভাবেই কাটুক সফরের সময়, খাওয়া-পরার জন্য যাই পাওয়া যাক, মন পড়ে থাকে আপন নিবাসে। কবি বলেন–

مسافر هر كجا باشد وطن را ياد مي دارد
چوں بلبل در قفص باشد چمن را ياد می دارد

মুসাফির যেখানেই থাকুক না কেন নিবাসের কথা স্মরণ করে, যেমন বুলবুলি পাখি পিঞ্জিরায় আবদ্ধ থাকাবস্থায় ফুলবাগানের কথা ভুলে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন–

وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ [3]

তুমি নিজেকে কবরের বাসিন্দা মনে করো। কবরকে তোমার প্রকৃত ঠিকানা মনে করো। কেননা, কবর থেকেই আখেরাতের জীবন শুরু হয়।

২. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪১১৪
৩. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪১১৪

মুমিনের জীবন তিনটি

দোস্ত! আমাদের জীবন তিনটি।

এক. দুনিয়ার জীবন।

দুই. বরযখ বা কবরের জীবন। মৃত্যু থেকে শুরু হয়ে হাশরের পূর্ব পর্যন্ত জীবনকে 'বরযখ' বা কবরের জীবন বলা হয়।

তিন. আখেরাতের জীবন। এটা হাশরের ময়দান থেকে অনন্তকাল ও চিরদিনের জীবন। চির সুখী বা চির দুঃখী হয়ে কিংবা কিছু দুঃখী হয়ে চির সুখী হওয়ার জীবন। এ জীবনে এক ভাগ মানুষ তো প্রথমেই জান্নাতী হবে। আরেক ভাগ সূচনা থেকেই চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। আরেক ভাগ কিছুদিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করে আবার চিরস্থায়ী জান্নাত পেয়ে যাবে। হিসাব-নিকাশের পর থেকে যে হায়াত শুরু হবে সেটা আখেরাতের জীবন। অনেক সময় বরযখ ও আখেরাতের জীবন উভয়টিকেই আখেরাতের জীবন বলা হয়। বস্তুতঃ আমাদের জীবনের তিনটি অংশ বা পর্ব রয়েছে।

দুনিয়ার সফর

পূর্বে বলে এসেছি সফর দু'রকমের। আপনারা নিজ নিজ এলাকা ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছেন—এটাও একটি সফর। যারা সফর করেছেন তারা মুসাফির। শরয়ী দূরত্ব ৪৮ মাইল দূর থেকে যারা সফর করে এসেছেন তারা শরয়ী মুসাফির। এই সফর আমরা সবাই বুঝি। আমরা দৈনন্দিন বা সপ্তাহে কিংবা মাসে সকলেই কমবেশি এদিক সেদিক সফর করি। সফরের অনেকগুলো আদব রয়েছে। দু'আ রয়েছে। এগুলো আমাদের শিখতে হবে। আমাদের তো সফর করতেই হয়। তাই তার নিয়ম জেনে করা উচিত। সফরের শুরুতে কী করব, সফর অবস্থায় কী করব, সফর থেকে ফিরে আসার সময় কী করব; এসব জানতে হবে।

আমরা আমাদের জীবনে প্রায়ই সফর করে থাকি। শত শত সফর করি। আমরা অনেকেই সফরের নিয়ম-কানুন জানি না। চলছি, গাড়ীতে উঠছি, নামছি আর গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছি। সফর শেষ করে আবার একইভাবে বাড়ী ফিরে আসছি। একজন হিন্দুর সফর আর আমার

সফরের মাঝে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। অথচ উভয়ের সফরে পার্থক্য হওয়া উচিৎ। (সফরের আদব ও এ বিষয়ে জরুরী হেদায়াত কিতাবের শেষে দেয়া আছে।)

আখেরাতের সফর

আরেকটা সফর হল আমার দুনিয়ার জীবন। দুনিয়ার পুরো জীবনটাই আমার সফর। ঘরেও আমি সফরে আছি। মসজিদেও সফরে। গাড়ীতেও সফরে। প্রবাসেও সফরে। আবাসেও সফরে। সব জায়াগায় সফরেই আছি। যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদেরও কিন্তু এ সফরটা হচ্ছে। দুনিয়ার হায়াত শেষ হয়ে গেলেই তো পরকালে যাবে। তারা পরকাল বিশ্বাস করে না এবং তার জন্য আমল করে না। এটা তাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আখেরাতের সফর তাদের জন্যও আছে। এই দুইটি সফর ঈমানদার ও বেঈমান সবার বেলায় প্রযোজ্য।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সফর

এই দুই সফরের ভেতর তৃতীয় আরেকটা সফর রয়েছে, যেটা শুধু ঈমানদারের হয়, বেঈমানের হয় না। আল্লাহপাক মূলতঃ আমাদেরকে ঐ সফরের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

হযরত আবু আলী কলন্দর (রহ.) বলেন–

سفر از خود بدل می بایدت کرد
نه در دنیا زمین پیما یدت کرد

আরেকটা সফর আছে। এ সফরটা তোমার দিলের মাঝে আর আল্লাহপাকের যাতের মাঝে। এ সফর দিলের মাঝে আর দিলের মালিকের মাঝে। এটা ঈমানের সফর। ঈমানদার এ সফর বোঝে, বেঈমান বোঝে না। তাদের সামনে এ সফর নেই।

কুরআনে কারীমের অনেক জায়গায়, বিশেষভাবে যেসব জায়গায় তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে এ সফরের কথা বলা হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ --_[4]

৪. সূরা হাশর, আয়াত নং-১৮

–হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।

এ আয়াতেও ঐ সফরের কথা বলা হয়েছে।

তাকওয়ার ভেতর নজরদারীর ইঙ্গিত রয়েছে

উপরোক্ত আয়াতে তাকওয়ার কথা দুইবার বলা হয়েছে। তাকওয়া শব্দের মূল উপাদান হল وَقْيٌ আর এ থেকেই وِقَايَةٌ মাসদারটি সৃষ্টি হয়েছে। الوقاية অর্থ নজরদারী করা। বোঝা গেল, তাকওয়ার ভেতর নজরদারী আছে। কিসের নজরদারী? আমার দিলের নজরদারী। আমার দিল আমার মাওলার পথে কতখানি ধাবমান আছে এর নজরদারী।

কলুর বলদের মত চললে পথ ফুরাবে না

আমরা কালেমা তায়্যেবা لا اله الا الله محمد رسول الله পড়ে মাওলার পথে সফর শুরু করেছি। তারপর অগ্রসর হচ্ছি। আসলেই অগ্রসর হচ্ছি কি না—এ বিষয়টি নজরদারী করতে হবে।

কলুর বলদ নামে একটা কথা আছে। এটা আগের পরিভাষা। এখনকার নওজোয়ানরা নাও বুঝতে পারে। এখন তো সরিষার তেল মেশিনে ভাঙানো হয়। আগে মেশিনে ভাঙানো হত না। ঘানিতে ভাঙানো হত। কোনো কোনো জায়গায় হয়ত এখনও আছে। ঘানি ঘুরানোর জন্য বলদ ব্যবহার করা হত। বলদের কাঁধে এটা বেঁধে দেয়া হয়। কলুর বলদের চোখ বেঁধে দেয়া হয়। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরতে থাকে। এটাকে حَرَكَت مُسْتَدِير বলে। এর অর্থ হল একই বৃত্তের উপর চলা। এতে রাস্তা অতিক্রান্ত হয় না। যেখান থেকে চলা শুরু করল সারা দিন ঘুরে সন্ধ্যায় একই জায়গায়। ধান মাড়ানোর ক্ষেত্রেও গরু এমনভাবেই চলে। দীর্ঘক্ষণ চলে কিন্তু রাস্তা অতিক্রান্ত হয় না। গরুটি যদি এভাবে না হেঁটে লম্বা পথ হাঁটত তাহলে অনেক দূর চলে যেত।

দীনের পথে অস্পষ্টতা নেই

সীরাতুল মুস্তাকীম একটা রাস্তা। এটাই আমাদের গন্তব্যের রাজপথ। পথটি খুবই সুস্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَ نَهَارُهَا سَوَاءٌ [5]

আমি তোমাদেরকে এমন একটা রাস্তার উপর রেখে গেলাম যার রাত এবং দিন সমান। অনেক রাস্তা এমন রয়েছে যেখানে দিনের বেলা চলাচল সহজ কিন্তু রাতের বেলা সহজ হয় না। রাতে পথ দেখা যায় না। তোমাদেরকে যে রাস্তায় তুলে দিয়ে গেলাম তাতে দিনের বেলা চলা যেমন সহজ, রাতে চলাও তেমন সহজ। অর্থাৎ এখানে অস্পষ্টতা বলতে কিছু নেই।

আমরা ঈমানদারগণ এ রাস্তা পছন্দ করি বিধায় কালিমা لا اله الا الله محمد رسول الله পাঠ করে এ রাস্তা ধরেছি, আল্লাহকে উদ্দেশ্য বানিয়েছি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুরো তরীকাটাই হল রাস্তা। গন্তব্য হল আল্লাহ তাআলা। لا اله الا الله হল উদ্দেশ্য। আর محمد رسول الله হল আদর্শ। আদর্শ মানে মডেল, নমুনা।

আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি তো!

আমরা ঈমানদারগণ এ তৃতীয় নম্বরের সফর করি। যে সফরের গন্তব্য হল মাওলায়েপাক। এখন দেখার বিষয় হল আমার সফরটা কি কলুর বলদের মত হচ্ছে, নাকি সীরাতে মুস্তাকীমে হচ্ছে। এমন যেন হয় সময় যাচ্ছে, আমিও অগ্রসর হচ্ছি। প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লাহপাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এর বিপরীত যেন না হয়। আমাদের দু'দিন ব্যাপী এ মজলিস সেই সফরকে কেন্দ্র করে।

মুমিন থেকে ঈমান আলাদা হয় না

ঈমান এমন একটি জিনিস যা এক সেকেন্ডের জন্য আলাদা হয় না। ঈমানদার যখন ঘুমায় তখন ঈমান নিয়েই ঘুমায়। ঈমানদার ঘুমন্তঅবস্থায়ও ঈমানের হালতে থাকে। আমরা অনেকে মনে করি, একটা মানুষ মারা যাওয়ার সময় তাকে কালিমা পড়তে হবে। তাই জোর দিয়ে বলতে থাকি 'কালিমা পড়ুন, কালিমা পড়ুন'। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে এ

৫. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৫

সময় এমন হুকুম করা উচিত নয়। খোদা না করুন, সে যদি কষ্টের কারণে বলে ফেলে আমি পড়ব না তাহলে কেমন হবে। নিয়ম হল তার পাশে বসে আপনি নিজে কালিমা পড়তে থাকুন। আপনার পড়া শুনে হয়ত সে মনে মনে পড়বে। তাকে কালিমা পড়ার নির্দেশ করা যাবে না। তাকে কালিমা পড়ার হুকুম করার প্রয়োজন নেই। কারণ সে তো ঈমানের হালতেই আছে। বেঈমানের হালত মনে করব কিভাবে। সে তো মুখ দিয়ে এ পর্যন্ত কোনো কুফরী কথা বলেনি। তাই শুধু শুধু কেন তাকে অন্য কিছু ভাবব। কুফরীর কোনো কথা উচ্চারণ করে যেহেতু সে মরেনি সেহেতু ধরে নিতে হবে তার মৃত্যু ঈমানের হালতেই হয়েছে। ঈমানদার ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঈমানদার থাকে। আর বেঈমান ঘুমায়ও কুফরীর হালতে।

আমরা তৃতীয় নম্বরের সফর করছি। এ সফর একমাত্র ঈমানদারই করে। অন্য কেউ করে না। এখন দেখার বিষয় হল আমার এ সফরটা কলুর বলদের মত হচ্ছে না তো! এক জায়গায়ই হাঁটাহাঁটি করছি, নাকি দূরত্ব অতিক্রম করছি।

দোস্ত! আমাদের হালত দেখলে তো মনে হয় আমরা কলুর বলদের মত এক জায়গায় ঘুরছি। সামনে অগ্রসর হচ্ছি না।

সকলে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন যে, আমার মালিকের মাঝে আর আমার মাঝে প্রতিনিয়ত দূরত্ব বাড়ছে, না কমছে। যদি একই জায়গায় ঘুরতে থাকি তাহলে দূরত্ব কমবে না। আল্লাহপাকের দিকে অগ্রসর হতে পারব না। এ চিন্তাটা ভিতরে এলে অবশ্যই উন্নতি হবে।

আমরা অনেকে নিজের ব্যাপারে ভালো ধারণা করে বসে আছি। বাস্তবেই উন্নতি হচ্ছে কি-না সেটা দেখতে হবে। আর এটা বড়দের কাছে জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ করে জানা যাবে।

শিক্ষণীয় ঘটনা

এখানে সবার জন্য শিক্ষামূলক একটি ঘটনা বলছি। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর নাম আমরা জানি। তাঁর মেহনত ও কুরবানীকে আল্লাহপাক এমনভাবে কবুল করেছেন যে, গোটা দুনিয়াতে তাঁর মেহনত চলছে। মুসলিম-অমুসলিম, ইউরোপ-আমেরিকা সব দেশেই দাওয়াতের কাজ চলছে। যাদের সামান্যতম অনুভূতি রয়েছে তারা চিন্তা করলে বুঝতে পারব এ মেহনতের উসিলায় দীনের কী

পরিমাণ উপকার হচ্ছে। কত বিধর্মী মুসলমান হয়েছে। কত ফাসেক-ফুজ্জার পাপাচার ছেড়ে আল্লাহওয়ালা হয়েছে। কেবল বাংলাদেশে নয় বরং দুনিয়া ব্যাপী এ মেহনত চলছে এবং সর্বত্র উপকার হচ্ছে। একবার মুফতী শফী (রহ.) দিল্লীতে হযরতজী (রহ.)-এর সাথে দেখা করতে গেলেন। তখন হযরতজীর বার্ধক্য অবস্থা। আলাপ-আলোচনার এক ফাঁকে হযরত ইলিয়াস (রহ.) মুফতী শফী (রহ.) কে সম্বোধন করে বলেন,

'মৌলভী শফী! বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ব্যাপকভাবে চলছে। আমার ভয় হয় এটা কোনো ইস্তেদরাজ কি-না। বিষয়টি তুমিও একটু চিন্তা করে দেখ'।

ইস্তেদরাজ হল আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে মানুষকে ঢিল দেয়া, পাপের সুযোগ দেয়া। বেশি বেশি পাপ করতে করতে যেন কঠিন আযাবের উপযুক্ত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ --[6]

আমি তাদেরকে এমনভাবে ঢিল দেই যে, তারা অনুভব করতে পারে না।

চিন্তা করুন, নিজের ব্যাপারে তিনি কেমন ভয় করেছেন! এত বিশাল দীনি কাজ করেও ভয় করেছেন যে, এটা কোনো ইস্তেদরাজ কি-না, আমার পাপ বৃদ্ধির জন্য এমনটা হচ্ছে কি-না। দোস্ত! এই ভয়ের কারণেই এই মেহনত এত কবুল হয়েছে।

জলীলুল কদর নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) খানায়ে কা'বার মত পুণ্যময় গৃহ নির্মাণ করেছেন। অথচ তাঁর মাঝে কোনো অহংকার ছিল না। ছিল ভয় ও শঙ্কা। কোনো 'উজব' বা আত্মপুলক ছিল না। তাই কা'বাগৃহ নির্মাণ করার পর তিনি কেঁদে কেঁদে কবুলিয়াতের জন্য দু'আ করেছেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ --[7]

হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে এ খেদমতটুকু কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

---

৬. সূরা আনআম, আয়াত নং- ১৮২
৭. সূরা বাকারা, আয়াত নং-১২৭

সুতরাং হে দোস্ত-আহবাব! আমরাও আমাদের আমলের খোঁজ-খবর রাখব। যারা এ লাইনের বড় তাদের সাথে পরামর্শ করব। আল্লাহপাক সবাইকে তৌফিক দান করুন। আমীন! *

* ১৫/০২/১৩ইং তারিখে ফুলছোঁয়া মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত জুমআপূর্ব বয়ান।

ফরযে আইন পরিমাণ ইলম সবাইকে শিখতে হবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ [৪] سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন। শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ, দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন। জুমার নামায আদায়ের জন্য আগে আগে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন। সে সুবাদে কিছু কথা বলা ও শোনার সুযোগ দিয়েছেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসভাণ্ডার থেকে ছোট্ট একটি হাদীস তেলাওয়াত করা হয়েছে। এ হাদীসটি খুবই প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে যারা আছি আশা করি সকলেই হাদীসটি জানি

৮. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২২৪

এবং সকলেরই মুখস্থ আছে। আমাদের মুসলিম শিশু-কিশোরদের বিশুদ্ধ কুরআন ও দীনের মৌলিক বিষয়াবলী শিক্ষাদানের জন্য যেসব মকতব বা নূরানী মাদরাসা রয়েছে সেগুলোতে বাচ্চাদেরকে প্রথম দিকেই এ হাদীসটি পড়ানো হয় এবং মুখস্থও করানো হয়। সত্যি বলতে কি, আমরা সবাই এ হাদীসটি জানার পিছনে ঐ মক্তবের বিরাট অবদান রয়েছে। হাদীসটিতে একটি মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

পরিবারের সবাইকে দীনদার হতে হবে

আমাদের দেশে একজন বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুজুর ও মুফাসসির সাহেব নামে। আজ থেকে দশ-বারো বছর আগের কথা। তিনি তখন অসুস্থ। জীবনে কখনো দেখিনি। তাই দেখার বড় সাধ ছিল। ঢাকা থেকে আমরা কয়েকজন গেলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে অবস্থিত জামিয়া ইউনুসিয়া এবং শহরের সন্নিকটে অবস্থিত ভাদুঘর মাদরাসা তাঁর দীর্ঘ দিনের কর্মস্থল। ভাদুঘর মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠাতা তিনি নিজেই। তাঁর জীবন-যাপন ঐ মাদরাসা কেন্দ্রিকই। বাড়ীও মাদরাসার পাশে। অসুস্থতার কারণে মাদরাসায় তেমন একটা আসেন না। শুধু যোহরের সময় আসেন। লোকজন এলে মসজিদেই দু'চার কথা বলেন। সেদিন তিনি যোহরের নামায পড়তে এসেছেন। নামাযের পর আমরা দেখা করলাম। কুশল বিনিময়ের পর তিনি কিছু নসীহতমূলক কথা বললেন। প্রথমেই তিনি এ হাদীসটি পড়েছেন– طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ এবং আলোচনার ফাঁকে কতক্ষণ পরপর তিনি এ হাদীসটি পড়েছেন। আমরা হযরতের সাথে ৫/৭ মিনিট কথা বলার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু পূর্ণ এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। কতক্ষণ পর পরই তিনি এ হাদীসটি পড়েছেন।

তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, আমাদের পারিবারিক সমস্যার মূল জিনিসটা কী? তিনি বলেন, যে ঘরে স্বামী দীনদার কিন্তু স্ত্রী দীনদার না, সে জানে তার কত কষ্ট। এজন্যই তো ইলমে দীন শিক্ষা করা সবার জন্য ফরয করা হয়েছে। যে ঘরে বাবা দীনদার নয়, ছেলে দীনদার, সে জানে জীবন কত কষ্টের! এজন্যই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ সবার উপর ইলমে দীন শেখা ফরয।

কয়েক ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই দীনদার। এক ভাই মাদরাসায় পড়ে আলেম হয়েছে আর কেউ হয়নি, সে জানে জীবন কত কষ্টের! এজন্যই তো সবার জন্য ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। ছোট ভাই আলেম হয়েছে, বড় ভাই হয়নি, সে জানে তার কত কষ্ট! এজন্যই তো ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরয। হযরতের পূর্ণ আলোচনা ছিল এ বিষয়ে।

এ বিষয়ে আমাদের যে পরিমাণ অনুভূতি ও উপলব্ধি পূর্বে ছিল হযরতের মজলিসে বসা ও তাঁর কথা শোনার দ্বারা তা বহু গুণ শানিত হয়েছে। তিনি বাস্তব এক বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

দীন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা উচিত। কমপক্ষে ফরযে আইন পরিমাণ ইলম সবাইকে শিখতে হবে।

আকাইদ সম্পর্কে জানতে হবে

আকাইদের ইলম তথা আল্লাহপাকের যাত ও সিফতের ইলম শিখতে হবে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কী আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কী বিশ্বাস থাকতে হবে, উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদ কী পরিমাণ ছিল, তাঁর ফিকির ও মিশন কী ছিল; এসব বিষয়গুলো জানা অপরিহার্য। অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে আমাদের কী ধারণা রাখা উচিত– তাও জানতে হবে। ইহুদীরা এক নবীকে মেনেছে আর অন্যদেরকে অস্বীকার করেছে। এমনকি তারা অনেক নবীকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে তো মানার প্রশ্নই আসে না। খ্রিস্টানরাও এমন। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে নবী হিসাবে খুব মানে। অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' বলে বিশ্বাস করে। অপর দিকে তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে মানে না। আরও অনেক নবীকে মানে না। আমরাও কি ওদের মতো? না। আমাদের সব নবীকে মানতে হবে। মানার কী অর্থ, কিভাবে মান্য করব? আমরা নবীকে মানি– এর কী অর্থ? মানার পদ্ধতি কী? পরকাল তথা

কবর-হাশর ইত্যাদি সম্পর্কে কী বিশ্বাস রাখা চাই? ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আকাইদ বলে।

যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তার জন্য এ আকাইদের ইলম জানা ফরয। চাই সে সুস্থ হোক, চাই সে অসুস্থ হোক, চাই সে যুবক হোক, চাই সে বৃদ্ধ হোক, চাই সে নারী হোক, চাই সে পুরুষ হোক, চাই সে শাসক হোক, চাই সে শাসিত হোক, চাই সে মালিক হোক, চাই সে শ্রমিক হোক, চাই সে গৃহকর্তা হোক, চাই সে ভৃত্য হোক, চাই সে মহাজন হোক, চাই সে কৃষক হোক। যে নিজেকে মুসলমান ভাবতে চাইবে তার জন্য প্রথমেই আকীদা সহীহ করা ফরয। এক্ষেত্রে কোনো রকমের ব্যতিক্রম নেই। কোনো ওজর চলবে না। এটাকে ঈমানের মেহনত বলে। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে এটাকেই ঈমানের মেহনত বলা হয়। এতো হল আকাইদ।

পরিবারের সকলের আকীদা-বিশ্বাস এক হওয়ার ফায়দা

এক ঘরের মানুষ কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ মাদরাসায় পড়ে, কেউ কলেজে পড়ে, কেউ পড়ে না। তাদের সবাই যদি আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানে তাহলে কত ভালো হবে। সবাই যেহেতু এক আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাই তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হবে। কারণ ঐ আকীদা থেকেই মানুষের মন-মানসিকতা পয়দা হয়। মানুষ যেসব আমল করে তাও উৎসারিত হয় ঈমান থেকে। আকীদা-বিশ্বাস থেকেই আমল বের হয়ে আসে।

ইবাদতের পদ্ধতি জানতে হবে

আকাইদের পরে রয়েছে ইবাদাত। নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি হল ইবাদত। নামায সবার জন্য। নামাযের জন্য বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিখতে হবে। রোযা সবার জন্য। যাকাত সম্পর্কে কমপক্ষে এতটুকু জেনে রাখতে হবে যে, কী পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিতে হবে। আমার হয়ত এখন নেসাব পরিমাণ সম্পদ নাই, কিন্তু মাসআলা তো জানতে হবে। বলা যায় না আল্লাহপাক কখন সম্পদ দিয়ে দেন এবং যাকাত এসে যায়। আমি যদি পূর্ব থেকে জেনে না রাখি তাহলে সময়

মত কিভাবে যাকাত দিব। যদি যাকাত না দেই তাহলে তো কবরে আমাকে সাপ-বিচ্ছু কামড়াবে। এ সম্পদই সাপ ও বিচ্ছু হয়ে কামড়াতে থাকবে। এজন্য মাসায়েল জানা থাকা চাই।

কখন হজ ফরয হয় জানা থাকতে হবে। আমরা তো অনেকেই ধনী হতে চাই। কিন্তু ধনী হওয়ার পর কী হুকুম বর্তাবে সেটা জানতে চাই না। সেটাও জানা উচিত। কেননা এসব ইবাদতের মাসায়েল জানা ফরযে আইন। যেমন ওযুর মাসআলা জানতে হবে, মহিলাদের হায়েয-নেফাসের মাসআলা স্বামীকে জানতে হবে এবং সে অনুপাতে স্ত্রীকে দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। ইবাদতের জন্য অনেক শর্ত থাকে। যেমন নামাযের জন্য তাহারাত থাকতে হয়। শরীর পাক, কাপড় পাক, নামাযের জায়গা পাক। এসব কিছু জানা থাকতে হবে। ওযুর সঠিক পদ্ধতি শিখতে হবে। কীভাবে ওযু করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক হবে সে পদ্ধতি শিখতে হবে।

উলামায়ে কেরাম জানেন 'সালাতুস আকূস' নামে কিতাবে একটি নামাযের কথা আছে। صَلٰوةُ الْعَكُوْس অর্থ উল্টা নামায। কোনো এক কালের মানুষেরা ইলমের অভাবে মনে করে বসেছেন এভাবে নামায পড়লে কষ্ট বেশি হবে তো সাওয়াব বেশি হবে। এ নামায হবে? হবে না। তো হুকুমগুলো জানার পাশাপাশি তার পদ্ধতিও জানতে হবে।

ওযু করতে হয়। ওযুতে কী কী ধুইতে হয় জানি। জানলে হবে না। ধোয়ার পদ্ধতিও জানতে হবে। অনেকে তো ওযুর চারটি ফরযের কথাও জানে না। গোসলের তিন ফরয জানে না। একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো গোসলে কয় ফরয? সে জবাব দিল তিন ফরয। জিজ্ঞেস করা হল কী কী? বলল: লুঙ্গি লওয়া, গামছা লওয়া, সাবান লওয়া। সে তার বুঝ মত বলেছে। অনেকে ফরয গোসল করে নাপাক কাপড় পরেই। নাপাক কাপড় নিয়ে পানিতে নেমে গোসল করে ওঠে যায়। তার সারা শরীরে পানি পৌঁছে গেছে কিন্তু তার লুঙ্গি নাপাক রয়ে গেছে। আগে নাপাকের পরিমাণ কম হলেও এখন পানি লাগার কারণে সারা লুঙ্গিতে ছড়িয়ে গেছে। এতে শরীরও নাপাক থাকবে। তাই গোসল ফরয হলে গোসল করতে হয় একথাটুকু জেনেই কেবল গোসল করলে গোসল হবে না, বরং গোসলের পদ্ধতিও জানতে হবে। সর্বপ্রথম শরীর বা কাপড়ে

কোথাও নাপাকী লেগে থাকলে তা দূর করতে হবে। সম্পূর্ণ কাপড় ধুতে হবে না। যেখানে নাপাক লেগেছে সে স্থানটুকু ধুয়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে। তারপর এটা আমার পরনে থাকতে পারে। আর যদি নাপাকী বেশি পরিমাণে বিভিন্ন স্থানে লেগে থাকে তাহলে সেটি খুলে একটি গামছা পরে নিব। তারপর লুঙ্গিটা পাক করব। তারপর প্রয়োজনে এ লুঙ্গি পরে গোসল করব। এটা একটা উদাহরণ দিলাম। এরকম অনেক ব্যাপার রয়েছে। তাই পদ্ধতিও শিখতে হবে। শরীয়তের আহকাম জানতে হবে। তার পদ্ধতিও জানতে হবে।

মুয়ামালাত সম্পর্কে ইলম শিখতে হবে

এরপর হল মুআমালাত। মানুষ সামাজিক জীব। সে একা একা চলতে পারে না। মানুষের একাকী জীবন কল্পনা করা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব হওয়ার কারণে অনেকগুলো জিনিস এমনিই চলে আসে।

মুসলমানের বিবাহ-শাদী কেমন হবে?

মুয়ামালাতের মধ্যে এক নম্বরে চলে আসে তার পরিবার ও পারিবারিক বিষয়াদী। এর সূচনা হয় বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে। এজন্য মানুষকে বিবাহ-শাদীও করতে হবে। আর যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব তাই একটি ছেলে কিংবা একটি মেয়ের পারস্পরিক সম্মতিতেই বিবাহ হয়ে যাবে না। সমাজকে জানিয়ে, মানুষের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বিবাহ করতে হবে। সমাজে তাদের একটি অবস্থান থাকার স্বার্থে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী হতে হবে। ছেলে মেয়ে বাদেও কমপক্ষে আরো দু'জন সাক্ষী হতে হবে। অন্যথায় এটা বিবাহ বলে গণ্য হবে না।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করেছেন ভরা মজলিসে বিবাহ পড়ানোর প্রতি। যেহেতু নামাযের সময় মানুষের সমাবেশ ঘটে। তাই বিবাহ-শাদী মসজিদে পড়ানো উচিৎ।

আজকাল তো কেবল জুমার দিনে মুসল্লির ঢল নামে। এ দিন মসজিদ উপচে পড়ে। অন্য ওয়াক্তে কোনো ভিড় থাকে না। আসলে এটা তো কাম্য নয়। রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগের চিত্র এমন ছিল না। পাঁচ ওয়াক্তের

প্রতি ওয়াক্তে মসজিদ ভরা মুসল্লি থাকত। জুমা-গায়রে জুমা সব ওয়াক্তে পর্যাপ্ত মানুষ থাকতেন।

অবশ্য কোনো কোনো পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমা হত না, বিধায় সেখানকার মুসল্লিরা আশেপাশের জামে মসজিদে জুমার নামায পড়ার জন্য যেতেন। সে সমাজের একশ ভাগের একশ ভাগ মুসলমান নামাযী ছিলেন। নামাযের সময় তারা কোনো না কোনো মসজিদে হাজির থাকতেন। তাই মুসলমানের বিবাহ-শাদী মসজিদে হবে। নামাজের পর সবার সামনে বিবাহ পড়ানো হবে। সবাই দু'আ দিবে-

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ

আহ! কত বরকতময় বিবাহ! কত সৌভাগ্যবান ঐ দম্পতি, যারা নামাযের পর মসজিদে মুসল্লিদের দু'আ পেয়ে গেল!

মনে রাখবেন, সামাজিক জীবনের প্রথম ভিত্তি এই বিবাহ। পারিবারিক জীবনেরও ভিত্তি এই বিবাহ। আমরা সকলেই বিবাহকে শুভ কাজ বলে বিশ্বাস করি। অনেকে তো ছেলে মেয়ের বিবাহ অসম্পন্ন হওয়ার অজুহাতে হজে যায় না। জিজ্ঞেস করলে বলে, শুভ কাজ সম্পন্ন করে যাব। এসব চিন্তা ঠিক না। বিবাহও হবে, হজেও যাব। ইনশাআল্লাহ সব কিছু আপন সময়ে হতে থাকবে। হজ ফরয হলে বিলম্ব না করে আদায় করে ফেলব। মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হলে এবং পছন্দসই পাত্র পাওয়া গেলে বিবাহ দিব। ছেলের বিবাহ সময় মত উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া গেলে হবে। এখন যেহেতু হজ ফরয হয়েছে তাই আদায় করে ফেলতে হবে।

বিবাহের পদ্ধতি বিধর্মীদের কাছ থেকে ধার করে আনতে হবে না

বিবাহ শুভ কাজ। এ শুভ কাজের পদ্ধতি কি আল্লাহর নবী আমাদেরকে শিখিয়ে যাননি? না কি এ বিবাহের পদ্ধতি আমাদের আমেরিকা, লন্ডন, ভারত থেকে, হিন্দু ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের থেকে ধার করে আনতে হবে? না কি মুসলমানদের এসব নিয়ম শিখানো হয়েছে। এজন্য বলি, বিবাহ শুভ কাজ। এর পদ্ধতিও শিখতে হবে। আমার জানা না থাকলে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শিখে নিব।

কনে দেখার নিয়ম

বিবাহের সময় কনে দেখা লাগে। এর নিয়ম রয়েছে। কে দেখবে, কতখানি দেখবে– এ ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নিয়ম রয়েছে। একজন কন্যার জীবন ইসলামে অনেক সম্মানের। কন্যারাও আদম সন্তান। এদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়ে আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ .[9]

আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি।

কন্যা এমন বস্তু নয় যে, একেবারে ওপেন করে দিব, যার মনে চায় সেই দেখবে। এটা তো বাজারের বলদ-গরু নয় যে, অমুকে এসে দাঁত দেখবে, অমুকে এসে চোখ দেখবে। এটা অনেক সম্মানিত বস্তু। দেখার যে নিয়ম আছে ঐসব নিয়মেই দেখতে হবে। দেখার পর যদি বিবাহটা না হয় তাহলে তো আরো সমস্যা। এজন্য এক্ষেত্রে যত গোপনীয়তা অবলম্বন করা যাবে, যত সহজে সারা যাবে ততই ভালো, ততই মঙ্গলজনক। সবার জন্যই ভালো। হয়ত আমার পছন্দ হলো না। কিন্তু এ তো একজন মুসলিম কন্যা। আমার পছন্দ না হওয়া ভিন্ন কথা, কিন্তু আমার কামনা থাকতে হবে এর বিবাহ আমার চেয়ে আরো ভালো জায়গায় হয়ে যাক। এই কামনা পোষণ না করলে আমি কিসের মুসলমান! এজন্য যতটা সম্ভব দেখার পর্বটি চুপে চুপে সারতে হবে। আমার পছন্দ না হলে বিবাহ না করলাম, কিন্তু এটা জানাজানি হলে মানুষ মেয়েটি সম্পর্কে নানা মন্তব্য করবে। মনে করবে এর মাঝে কোনো দোষ বা সমস্যা আছে। তাই হাঁকডাক দিয়ে কনে দেখার আয়োজন করা যাবে না। আমার পছন্দ না হতে পারে, আরেকজনের পছন্দ হতে পারে। এসব বিষয় আজ উপেক্ষিত। এসব নিয়ম-নীতির কিছুই আমরা মানি না। এজন্য বলি, একটা কাজ সম্পন্ন হলেই হবে না। আমাদেরকে তার বাস্তব পদ্ধতিও অনুসরণ করতে হবে। তাই পদ্ধতি শিখতে হবে।

আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিধান জানতে হবে

৯. সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০

এভাবে আর্থিক মুয়ামালা ও লেনদেন সম্পর্কেও জানতে হবে। এ লেনদেনের মধ্যে একটি লেনদেন হল বন্ধক রাখা। বন্ধক রাখা জায়েয আছে। এটা মনে করে অনেকে জমি বন্ধক রেখে টাকা এনেছে। কিন্তু মাসআলা না জানার কারণে সুদে লিপ্ত হয়ে গেছে। জায়েয লেনদেনের মাসআলা না জানার কারণে সেটি সুদে পরিণত হয়ে গেল। আমি তো টাকার হেফাজত ও নিরাপত্তার জন্য বন্ধক রাখলাম, টাকা না পেলে জমিটি আমার আয়ত্তে আছে। কিন্তু এ জমি চাষ করে ফসল ভোগ করতে পারব না। আমি একজনের উপকারের জন্য ঋণ দিলাম আবার ফায়দাও নিলাম– এর নামই তো সুদ। হাদীস শরীফে এসেছে–

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا –[10]

যে ঋণ লাভ টেনে আনে সেটাই তো সুদ বলে।

মাসআলা না জানার কারণে বৈধ জিনিসটি হারাম হয়ে গেল। উলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করলে হয়ত এ বিষয়টিকে একটি সঠিক পদ্ধতিতে আনা যেত। উভয়ের উদ্দেশ্যই হাসিল হত। কিন্তু আজ আলেমদের সাথে কোনো যোগাযোগ রক্ষা না করে অহরহ এসব লেনদেন হচ্ছে। সুদের মত জঘন্য জিনিস আমাদের সমাজে ঢুকে যাচ্ছে। কারণ এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানা নেই। তাই মুআমালাতের ইলম শেখাও ফরয।

মসজিদের মধ্যে বেচা-কেনা সম্পূর্ণভাবে হারাম। মনে করুন, আমার লেখা কোনো ধর্মীয় বই ছাপানো হয়েছে। বইটি পড়লে মানুষের বেশ ফায়দা হবে। ঘোষণা দেয়া হল ভাই একটি ভালো বই আছে, সবাই সংগ্রহ করবেন। একথা শুনে অনেকেই আগ্রহের সাথে বইটি কিনল। যিনি বিক্রি করেছেন তার মাঝেও ইখলাস রয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই। এর দ্বারা তার ব্যবসাও উদ্দেশ্য নয়। খরচ উঠে এলেই চলবে। কিংবা কিছু লাভ হলে তা কোনো প্রতিষ্ঠানের থাকবে। কিন্তু মসজিদে বেচা-কেনা শুরু হয়ে গেছে। হুড়াহুড়ি লেগে গেছে। এদিক থেকে একজন বলে আমাকে একটি বই দিন ওদিক থেকে আরেকজন বলে আমাকে একটি বই দিন। ক্রয়কারী এবং বিক্রয়কারী উভয়ে গুনাহগার। কারণ মসজিদ ক্রয়-বিক্রয়ের জায়গা নয়।

১০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং-২০৬৯০

শুধু যিনি এতেকাফ করেন তার জন্য এখানে পণ্য হাজির না করে দরদাম ঠিক করার অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা এখন মসজিদে ধর্মীয় বই বিক্রি শুরু করে দিয়েছি। মসজিদের মাসআলা সম্পর্কিত বই হলেও মসজিদের ভিতর বিক্রি নিষিদ্ধ। যে বইয়ের মধ্যে এ মাসআলাটি লেখা আছে যে, 'মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই' সে বইটিও মসজিদে বিক্রি করা জায়েয হবে না। তবে ফ্রি বিতরণ করা যাবে। অনেকে মসজিদের কোণায় দাঁড়িয়ে আতর কিংবা ইসলামী পত্রিকা বিক্রি করে। মসজিদের সীমানায় হলে জায়েয হবে না।

বাজারে একজনে একটি পণ্য সম্পর্কে দাম করছে। এখনও কথা শেষ হয়নি। এর ভিতরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই দাম কত? এটা নাজায়েয। প্রথম ব্যক্তি দরদাম করে যদি সরে যায় তাহলে আমি দাম করতে পারব। মনে করুন, একজন দাম বলেছে পঞ্চাশ টাকা। এখনও সে জায়গা থেকে সরে যায়নি। এমতাবস্থায় আমি পাঁচ টাকা বাড়িয়ে পঞ্চান্ন টাকা বললাম, এটা হারাম হবে। বস্তুত এসবই হল ঝগড়ার উপকরণ। এগুলো মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। চিন্তা করুন, বিষয়টা যদি আমার ক্ষেত্রে হয় তাহলে আমার মনে কষ্ট লাগবে কি না। আমি যদি আরেকজনের দামের উপর দাম বলি তাহলে আমি কেমন হৃদয়ের অধিকারী হলাম। আমার একজন মুসলমান ভাই একটা বস্তু কিনে সুবিধা পাক এটা আমার অন্তরে থাকতে হবে। মুসলমান তো এমন হওয়ার কথা যে, সঙ্গতি থাকলে অপর ভাইকে এমনিতেই দিয়ে দিব। আমার মুসলমান ভাইয়ের একটা বস্তুর প্রয়োজন পড়েছে আর সেটা আমার কাছে আছে, তো সঙ্গতি থাকলে আমি তাকে বিনামূল্যে দিয়ে দিব। এতদসত্ত্বেও যদি বেশি দাম দিয়ে তার সামনে থেকে নিয়ে আসি–সেটা কত জঘন্য ব্যাপার হবে! এসব বিষয় জানা ফরয। মুআমালাত ও লেনদেন সম্পর্ক ইলম অর্জন করা ফরয।

মুয়াশারাত সম্পর্কে জানতে হবে

এমনিভাবে মুসলমানদের সামাজিকতা ও আচার-আচরণ ভালো হওয়া চাই। কারো সাথে কথা বললে কথাটা কিভাবে বলব। আস্তে বলব, না জোরে বলব। কেউ আমাকে সালাম দিল। বলল, আস্সালামু

আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আমি আরেক দিকে ফিরে বললাম, ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ– এটা ঠিক নয়; বরং তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় জবাব দিব। এতটুকু আমার কাছে তার পাওনা। এজন্য পিছন দিক থেকে সালাম দেয়া ঠিক নয়। এগুলো সবই আমাদের জানার বিষয়, শেখার বিষয়।

বিচার-প্রশাসনের বিধানও জানতে হবে

আরেকটি বিষয় রয়েছে মুহাকামাত। এটা বিচার-প্রশাসনের বিষয়। দুইজনে ঝগড়াঝাটি হয়। বিচারকদের কাছে মামলা যায়। বিচারক যদি মুসলমান হন তাহলে তাকে এগুলো অবশ্যই জানতে হবে।

ইলম সবাইকে শিখতে হবে

মুহাকামাতের এ বিষয়টি না হয় বিচারকদের জন্য রেখে দিলাম। কিন্তু বাকী সব বিষয় আমাদের শিখতে হবে এবং এ বিষয়ক জ্ঞান রাখা সকলের উপর ফরযে আইন। মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে সবার জন্য জানা ফরয। রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই বলেছেন নিম্নোক্ত হাদীসে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ _[11]

সব মুসলমানের উপর ইলমে দীন তলব করা ফরয।

কিন্তু আমাদের পরিবার ও সমাজের অবস্থা হল একজনে একটু জানে, অপরজন মোটেই জানে না। ফলে প্রত্যেকের মন-মানসিকতা এক রকম হয় না এবং নানা ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুযুর এ বিষয়টিই বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। যে পরিবারের এক ভাই আলেম হয়েছে, অন্য ভাই আলেম হয়নি—সে আলেম জানেন জীবন কত কষ্টের! এজন্যই তো আল্লাহপাক সবার জন্য ইলম শিখা ফরয করেছেন।

১১. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২২৪

এজন্যই ইসলামে ইলমে দীন শেখার অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইলমে দীনের সাথে জড়িতদের এত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব

নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلاتَكُنْ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ[12]

كُنْ عَالِمًا তুমি আলেম হও। اَو مُتَعَلِّمًا না হয় তুমি ইলমে দীন শিক্ষাকারী হও। او مُستمعا তাও যদি না পার কমপক্ষে শুনে শুনে শিক্ষা গ্রহণকারী হও। যদি তাও না পার তাদেরকে মহব্বতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। অন্তরের অন্তস্থলে তাদের মহব্বত পোষণ কর। যারা ইলম শিখে ও শেখায় এ ধরণের চার গ্রুপের মধ্যে তোমাকে অবশ্যই থাকতে হবে। وَلاتَكُنْ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ এ চার গ্রুপের বাইরে যেটাই হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ পঞ্চম নম্বরে গেলে ধ্বংস অনিবার্য।

ইলমী মু'জিযা

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহপাক ঐ ধরণের মু'জিযা দিয়েছেন যে ধরণের মু'জিযা দ্বারা তার কওম তাকে সহজে মেনে নিতে পারে। আর আমাকে দেয়া হয়েছে ইলম। নবীজির প্রধান মু'জিযার নাম হল ইলম।

কুরআন শরীফ পুরোটা মুজিযা, অলৌকিক। কুরআনে কারীম সূচনা থেকে চ্যালেঞ্জ। এখনও চ্যালেঞ্জ। কেয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। এটা মু'জিযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার মু'জিযা হল ইলম, আমার নবুওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত, তাই আমার চ্যালেঞ্জ ও মু'জিযা কেয়ামত পর্যন্ত।

ইলমী মাহফিল

১২. আল-ইবানাতুল কুবরা লিইবনে বাত্তাহ, হাদীস নং-২১০

আমাদের মাদরাসার ছাত্ররা সারা বছর কিতাবাদী পড়ে–এটাও ইলম চর্চা। আর এই যে দু'দিনের মাহফিল–এটা কোনো তামাশা, রুসুম-রেওয়াজ ইত্যাদি কিছু নয়; বরং এটাও ইলম চর্চার আয়োজন। আমাদের কামনা হল আল্লাহপাক তৌফিক দিলে এ মাহফিল যেন কেয়ামত পর্যন্ত ইলমের চর্চা হিসেবেই পরিচালিত হয়। যারা এখানে আসবে তারাও যেন ইলম শেখার উদ্দেশ্যেই আসে। এ ব্যাপারে অমি সকলের কাছে দু'আপ্রার্থী। যেন কেয়ামত পর্যন্ত এখানকার সবগুলো জিনিস ইলমী হয় এবং যত আমল হবে সব যেন ইলম অনুযায়ী হয়, জাহালাত থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন। *

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

---

* ১৪/০২/১৪ইং সালে ফুলছোঁয়ার বার্ষিক মাহফিলে জুমআর পূর্বে প্রদত্ত বয়ান

আল্লাহর মহব্বত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ (الحديد : 16)

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

দুনিয়ার সাময়িক বিদায় যেন সবক হয় চির বিদায়ের

আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, তিনি আমাদেরকে দু'দিন যাবত দীনের কথা বলা ও শোনার তাওফিক দান করেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদেরকে সমবেত করেছেন। একমাত্র তাঁর দীনের উদ্দেশ্যে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এখন আমাদের বিদায়ের সময়, আমরা বিদায় হব। আমাদের এ বিদায়টা যেন সবক হয় আসল বিদায়ের। দুনিয়া মূলতঃ বিদায়েরই জায়গা। একেক স্থান হতে একেক উদ্দেশ্যে আমাদের বিদায় হতে হয়। এভাবে এক দিন দুনিয়া থেকে সকলের চির বিদায় ঘটবে। চির বিদায়ের পর আমরা যে জগতে যাব সেখানে আর বিদায় বলতে কিছু থাকবে না।

অনন্ত অসীম সফরের সঞ্চয়

সেই অনন্ত অসীম সফরের জন্য যে সঞ্চয় ও সামান নিয়ে যেতে হবে সেটা হল দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের মহব্বত। অন্তরে আল্লাহপাকের ভালোবাসা ও মায়া-মমতা নিয়ে যেতে হবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে দিল দিয়েছেন। দিলের মধ্যে বড় একটি যোগ্যতা ও সঙ্গতি দিয়েছেন। দিলের মধ্যে যেন আল্লাহ পাকের জায়গা হয়, গায়রুল্লাহ যেন দিলের বাইরে থাকে। প্রকৃত মহব্বত ও ভালোবাসা যেন একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়। আর অন্য যত কিছুর মহব্বত রয়েছে, যেটা মানুষের মজ্জাগত বিষয়, সেটাও আল্লাহপাকের নির্দেশিত স্থানে ব্যয় করব। অন্তরে মা-বাবার মহব্বত থাকা চাই, সন্তানাদির মহব্বত থাকা চাই, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সবকিছুর মহব্বত পেয়ে আল্লাহপাককে ভুলে যাব। যে দিলের মধ্যে আমি কাউকে জায়গা দিচ্ছি সে দিলটা তো সে বানায়নি; বরং আল্লাহপাক বানিয়েছেন।

কুরআন কারীমে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ [13]

ঈমানদারদের কি এখনও সময় আসেনি যে, আমার স্মরণে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?

দোস্ত! আল্লাহপাকের মহব্বত হল আমাদের পরজগতের সফরের সামান। এ সামান আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ নিজে বান্দার সাক্ষাত কামনা করেন

আমাদের তো আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতেই হবে। উপস্থিত না হয়ে কোনো গতি নেই। দুশমন হলেও উপস্থিত হতে হবে, দোস্ত হলেও উপস্থিত হতে হবে। দুইজনের অবস্থা দুই রকম হবে। একজন আসামী হয়ে উপস্থিত হবে। তাকে আল্লাহপাক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আরেকজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে উপস্থিত হবে। তাকে আল্লাহপাক জান্নাতে পৌঁছাবেন।

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَه وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَه [14]

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে পছন্দ করেন আল্লাহ পাকও ঐ বান্দার সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করেন।

শুধু বান্দাই চায় না যে, আমি আল্লাহর কাছে যাই; বরং আল্লাহও চান বান্দা আমার রহমতের কোলে চলে আসুক।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যাওয়া পছন্দ করে না। আল্লাহপাকও বলেন তার আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই, আমিও চাই না সে আমার কাছে আসুক। কিন্তু তারপরও আসতে হবে। আল্লাহর কাছে না গিয়ে কারো উপায় থাকবে না।

একটি ঘটনা

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জলীলুল কদর তাবেয়ী কিংবা তাবে-তাবেয়ী ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) একটি শিক্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন।

১৩. সূরা হাদীদ : ১৬

১৪. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪২৬৪

এক বাদশাহ খুব শান-শওকতের সাথে কোনো অভিযানে যাচ্ছেন। সাথে বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত। সকলেই অশ্বারোহী। পথিমধ্যে হঠাৎ এক জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তি এসে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, বাদশা নামদার! থামুন।

বাদশা বললেন, আমি এখন জরুরী কাজে যাচ্ছি, তোমার কোনো কথা থাকলে আমি যখন বাড়ি ফিরব তখন দেখা করবে। তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

লোকটি বলল, আমার কথা এখনই শুনতে হবে।

অবস্থা দেখে বাদশা বুঝলেন যে, এর কথা এখনই শুনতে হবে। তাই ঘোড়া থেকেই কানটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বলো, কী বলতে চাও।

লোকটি বলল, আমি মালাকুল মাওত–মৃত্যুর ফেরেশতা। আমাকে আল্লাহপাক আপনার জান কবজ করার জন্য পাঠিয়েছেন।

বাদশা বললেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে একটু সুযোগ দাও। যাতে আমি বাসভবনে ফিরে গিয়ে হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে পারি এবং সন্তানাদিকে কিছু অসীয়ত-নসীহত করতে পারি।

ফেরেশতা বললেন, কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ পাক আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আপনি যে অবস্থায় আছেন এ অবস্থাতেই যেন জান কবজ করি।

আর কোনো কথা নেই। পিছন থেকে সকল সৈন্য-সামন্ত লক্ষ্য করল যে, বাদশা তার ঘোড়া থেকে কাঁত হয়ে পড়ে গেলেন। গাছ থেকে যেমন গাছের ডাল ভেঙে পড়ে যায়। বাদশার জান কবজ করে ফেরেশতা চলে গেলেন।

যাওয়ার পথে ফেরেশতা আরেক ব্যক্তির জান কবজ করার জন্য গেলেন। বললেন, আল্লাহ পাক আপনার কাছে সালাম পাঠিয়েছেন। আমি মালাকুল মাওত ফেরেশতা। এ কথা শুনে লোকটি বলল, ভাই! আমি তো তোমারই অপেক্ষায় আছি। তুমি আসতে অনেক দেরী করে ফেলেছো। তখন ঐ ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে বলে দিয়েছেন আপনি যদি অসীয়ত-নসীহত করার জন্য কোনো সুযোগ চান তা যেন আপনাকে দিই।

লোকটি বললেন, আমার কোনো সুযোগের প্রয়োজন নেই। আমি তো অসীয়ত-নসীহত আগেই করে রেখেছি। আমি সব কিছু গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছি। এর জন্য আমার আর কোনো সুযোগের প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর দীদারে অধীর যারা

বস্তুতঃ পরজগতকে যদি কেউ আবাদ করতে সক্ষম হয় তাহলে তার অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। সে অপেক্ষায় থাকে যে, কোন সময় ডাক আসবে আর চলে যাবে। আল্লাহর এক আরেফ বলেন–

منتظر گشته نشستم سوئے تو
آمده بارے نمایم روئے تو

–মাওলা গো! তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। তোমার দীদারের আশায় প্রহর গুণছি। আরেক জন বলেন–

تیرے لئے جهان میں بے چین ونه قرار هے
دلوں میں هے بے قراریاں آنکهوں میں انتظار هے

–তোমার জন্য পৃথিবীতে অস্থির সময় যাপন করছি। অন্তরে সীমাহীন অস্থিরতা আর চোখে অপেক্ষা আর অপেক্ষা!

আমি রাতে অনেকবার আমার শায়খ (রহ.)-এর পাশাপাশি শোয়ার সুযোগ পেয়েছি। রাত যখন তিনটা বেজে যেত তখন আর তিনি বিছানায় থাকতেন না। উঠে একা একাই জরুরত সেরে এবং উযু করে আল্লাহকে ডাকতে থাকতেন আর কেঁদে কেঁদে বলতেন–

زندگی گذری تیری دیدار کی امیدوں میں
اب تو پیری آگئی هے رحم فرما اے خدا
جسم سے طاقت گئی هے قلب سے همت گئی
هے دماغ آفت رسیده رحم فرما اے خدا

–হে আল্লাহ! তোমাকে দেখার আশায় আমার গোটা জীবন শেষ হয়ে গেল। এখন তো বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি, তাই আমার প্রতি দয়া করো। দেহ থেকে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, অন্তর থেকে সাহস চলে গেছে। স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, তাই আমার প্রতি রহম করো।

দোস্ত! যাদের পরকালীন জগতটা আবাদ আছে তাদের কোনো পেরেশানী নেই; বরং তারা অপেক্ষায় থাকে কখন চলে যাওয়ার সময় আসবে। তখন তাদের অভিব্যক্তিটা কেমন হয় তা নিচের কবিতায় ফুটে উঠেছে–

وقت آں آمد که من عریاں شوم
جسم بگذارم سراسر جاں شوم

–আমি দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুধু রূহ হয়ে আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

خُرّم آں روز کزیں منزلِ ویراں بروم
راحتِ جاں طلبم وازپاے جاناں بروم

–সে দিনটা আমার কাছে আনন্দের যে দিন আমি দুনিয়ার বিরান বাড়ি ছেড়ে কবর দেশে পৌঁছব। যে দিন আমি আমার মাহবুবের পদপ্রান্তে পৌঁছব সে দিন আমার আত্মা শান্তি পাবে।

মনে করুন, কেউ শ্বশুর বাড়ি গেল। হরেক রকমের খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ণ করা হল। কিন্তু সে যার উদ্দেশ্যে শ্বশুর বাড়ি গেল তাকে যদি না পায় তাহলে তার কাছে কেমন লাগবে? অনুরূপভাবে যার মনে আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বত আছে, যার দিলে তাওহীদের মজা রয়েছে তার কাছে দুনিয়াটা তেমন। সেভাবে হে আল্লাহ! তোমার নাজ-নেয়ামত ভক্ষণ করছি, তোমার দেয়া চোখ দিয়ে সব কিছু দেখছি, তোমার দেয়া কান দিয়ে কত কিছু শুনছি, তোমার চন্দ্র-সূর্যের আলো উপভোগ করছি, তোমার অসংখ্য নেয়ামত উপভোগ করছি; কিন্তু মাওলা তোমাকে তো পাচ্ছি না। তোমাকে দেখার জন্য দিল বেকারার হয়ে আছে। আল্লাহর ওলীগণ সদা মাওলাকে পাওয়ার জন্য পেরেশান থাকেন।

كب تلك گهو متا رهوں میں در بدر
اے خدا اب تو لگا دے راه پر

তারা আল্লাহকে তালাশ করার জন্য অস্থির হয়ে যান। এদিক সেদিক যান। কখনো রাতের অন্ধকারে মসজিদে গিয়ে তালাশ করেন। কখনো মক্কা শরীফ চলে যান। কখনো কুরআন শরীফ খুলে পড়তে থাকেন।

" দিনের বেলায় পাইনি সময় তাই নিরালা রাত্রে

দেখি তোমার পাইনি সন্ধান কুরআনের আয়াতে।
মসজিদে যাই আধারাত্রি, খুঁজি তোমায় হাত পাতি।
ঝরলে পাতা ডাকলে পাখি ভাবলে তোমায় চমকে উঠি "

گه معتکف دیرم و گه ساکن کعبه
یعنی که ترا می طلبم خانه بخانه

মাওলা! তোমাকে খুঁজতে কখনো মসজিদে যাই। সেখানে না পেয়ে মক্কা শরীফ খানায়ে কা'বায় চলে যাই। তোমাকে তালাশ করি। সেখানে গিয়ে না পেলে খানায়ে কাবাকে জিজ্ঞেস করি–

بتا کعبه میرےمولی کها ں هے

হে কা'বা! তুমি বলে দাও আমার মাওলা কোথায় আছেন।

দোস্ত! বলছিলাম ঐ জগতটা যার আবাদ রয়েছে, মাওলার সাথে যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে সে সদা মাওলার কাছে চলে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। তাই ঐ লোকটি মৃত্যুর ফেরেশতাকে পেয়ে বলে উঠেছে- তুমি আরও আগে কেন এলে না? দেরী করলে কেন? ফেরেশতা তাকে সময় দিতে চাইলে সে বলে, আমি তো প্রস্তুত হয়ে আছি। আমি তো অপেক্ষায় আছি। আহ! আল্লাহপাক অপেক্ষমাণ বান্দার জন্য, বান্দাও অপেক্ষমাণ আল্লাহর জন্য।

তখন ঐ ফেরেশতা বলেন, আপনি যদি কোনো ভালো হালতে মরতে চান আল্লাহ পাক আপনাকে সে সুযোগ দিতে বলেছেন। আপনি সে অবস্থা গ্রহণ করার পর আপনার জান কবজ করতে আমাকে নির্দেশ করেছেন। একথা শোনার পর আল্লাহর বান্দা বললেন, হ্যাঁ, এটা একটা ভালো প্রস্তাব। আমার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয় সেজদারত অবস্থায় তুমি আমার জান কবজ কর। কারণ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় অবস্থা হল বান্দার সেজদারত অবস্থা।

বান্দা যখন সেজদায় থাকে ঐ মুহূর্তে সে আল্লাহর যত নিকটে পৌঁছে অন্য কোনো মুহূর্তে তত নিকটে পৌঁছতে পারে না। বান্দার দিল যদি 'দিল' হয় তাহলে তখন তার রুহ আল্লাহর আরশে চলে যায়।

بظاهر سجده گاهش بر زمیں بود
بباطن مسجدش عرش بریں بود
কপালটি তার লেগে আছে মাটির ফরশে
রূহ তো তার উড়ে গেছে মহান আরশে

–বাহ্যত দৃষ্টিতে তো দেখা যায় যে, সে মাটিতে সেজদা করছে, আসলে সে আল্লাহপাকের মহান আরশে সেজদা করে।

লোকটি বলছে আল্লাহ পাকের কাছে যেহেতু সবচেয়ে প্রিয় হল বান্দার সেজদারত অবস্থাটি তাই আমিও আমার মাওলার কাছে সেজদারত অবস্থায় যেতে চাই। এজন্য তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি ওযু করে দুই রাকাত নামাযের নিয়ত করে যখন সেজদায় যাব তখন তুমি আমার জান কবজ করে নিও। ঠিক তাই করা হল। যখন নামাযের নিয়ত করে তিনি সেজদায় গেলেন ঐ বান্দার জান আল্লাহপাক কবুল করে নিয়েছেন।

یه سجده ریا کاری هے وه سجده ادا کر
جو سجده خدا وندِ دو عالم سے ملا دے
রিয়াকারীর সেজদা ছাড়ো, আসল সেজদা ধরো
যে সেজদায় তুমি মাওলাপাকের দীদার পেতে পারো

দোস্ত! দুনিয়া ছেড়ে তো যেতেই হবে। না যেয়ে তো কোনো উপায় নেই। তাই আমার যাওয়াটা যেন মাওলায়েপাকের পছন্দনীয় অবস্থায় হয়। এমনভাবে যেতে হবে যে, মাওলাও কামনা করেন যে, আমার বান্দা আমার কাছে চলে আসুক। আর আমার দিলের মধ্যেও এ ভাব আসে যে, আমি আল্লাহ পাকের কাছে যাব। আমি আল্লাহর রহমতের কোলে যাব। তাহলে মৃত্যু খুশির বিষয় হবে। দুঃখের বিষয় হবে না। তাই দিলের অবস্থা এমন সৃষ্টি করতে হবে। আর অবস্থাটা এমনিতেই সৃষ্টি হবে না। এর জন্য অনবরত মেহনত করতে হবে। মেহনত ছাড়া পাওয়া যাবে না। কিছু দিন মেহনত করে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না।

আরেফবিল্লাহ হাফেয শিরাজী (রহ.) বলেন–

دست از طلب ندارم تا کار من بر آید
یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن بر آید
আমি ক্ষান্ত হবো না, যাচনা ছাড়বো না
যতক্ষণে প্রিয়ের কাছে পৌঁছতে পারবো না

"আমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। হয় আমার দেহ চলে যাবে প্রিয়ের কাছে, না হয় দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে"

চারিদিকে গুনাহ ও ফেতনার সয়লাব চলছে

চারিদিকে গুনাহ ও ফেতনার সয়লাব চলছে। যে দিকে তাকাই সেদিকেই গুনাহ আর গুনাহ। মুহূর্তের মধ্যে আমার ঈমান ধ্বংস করে দিতে পারে। রাস্তায় চলতে গেলে বেপর্দা নারী, লঞ্চে-গাড়ীতে চললে টিভির বাক্সে অনবরত অশ্লীল ছবি। সেখানে এমন এমন অশ্লীল দৃশ্য চোখে পড়ে যা মুহূর্তের মধ্যে শরীরে খারাপ ধরনের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এগুলোর দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই অনেক মেহনত ও সাধনা করতে হবে। রাস্তায় চলার সময় দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে। বাসে উঠে ড্রাইভারকে টিভি বন্ধ করার কথা বলতে হবে। যে ঘরে টিভি আছে সে ঘরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যে বাসে টিভি চলে সে বাসে চড়া থেকে পরহেয করতে হবে।

মুসলমানের দেশে আজ হাজারো বদদীনি শুরু হয়েছে। এমন এমন জিনিস আমদানী শুরু হয়েছে যা আমাদের ঈমান মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। যতই ফেতনা আসুক আমার ঈমান আমাকে বাঁচাতে হবে। কে কী বলল, তা দেখে লাভ হবে না। আল্লাহকে পেতে হলে কষ্ট করতে হবে। মানুষ খারাপ বলুক তাতে কিছু আসে যায় না। যদি আমার মাওলা ভালো বলেন তাহলেই ভালো। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারাই হল আমার কামিয়াবী।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .[15]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত হাসিল করতে পারাই হল কামিয়াবী।

অনেকে অভাব অনটনে পড়ে বা নানা কারণে কোনো ব্যক্তি কিংবা সংস্থা থেকে সুদে টাকা নিয়ে থাকে, অনেকে নিজেরা লাভে টাকা-পয়সা লাগায় অথচ এটা অনেক জঘন্য অপরাধ। সুদের গুনাহকে যদি ছেচল্লিশ ভাগ করা হয় এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর ভাগের যে গুনাহটা হবে সেটা হল নিজের মায়ের সাথে জিনা করার সমান।

হে মুসলমান! চিন্তা করো, ঈমান ও আমল নিয়ে কীভাবে কবরে যাবে। সর্বদা এ নিয়ে ফিকিরমান্দ থাকতে হবে।

আল্লাহকে পেতে হলে মেহনত করতে হবে

১৫. সূরা আলে-ইমরান : ১৮৫

দোস্ত! আল্লাহকে পেতে হলে মেহনত করতে হবে। আল্লাহর মহব্বত দিলের মধ্যে জায়গা দিতে হবে। গুনাহ ও নাফরমানীর কাজ ছাড়তে হবে।

দোস্ত! মেহনত করতেই হবে। মেহনত ছাড়া এ সম্পদ পাওয়া যাবে না। আপনি গুনাহ ছাড়তে থাকবেন তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন। আল্লাহ পাক আপনার দিকে এগিয়ে আসবেন। আপনি যেমন জীবন যাপন করতে চাইবেন। আল্লাহ পাক ঐ রকম অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। বান্দা যেভাবে চলতে চায় আল্লাহ পাক তাকে সেভাবে চলার সামান করে দেন। সবকিছুর আয়োজন করে দেন।

তাকওয়া অনুযায়ী চলতে চাইলে আল্লাহ উপায় বের করে দেন

এ সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনুন। হযরত থানভী (রহ.) একবার সফরে যাচ্ছেন। রেল স্টেশনে পৌঁছলেন। রেল আসতে এখনও অনেক দেরী। তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। রেলের কোনো এক অফিসার হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি হযরতকে তার রুমে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই সাথে স্টেশন মাস্টারকে হযরতের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। মাগরিবের সময় হয়ে গেছে। অন্ধকার হতে শুরু করেছে। তখন তো বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। হ্যারিকেন দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হত। হযরত থানভী (রহ.) মাগরিব নামায পড়বেন। তাই রুমে আলোর প্রয়োজন। স্টেশন মাস্টার সরকারী হ্যারিকেন নিয়ে এলো। হযরত চিন্তা করলেন আমি তো এখানে অফিসারের রুমে আছি। আর এ হ্যারিকেন তো সর্ব সাধারণের জন্য। এটি আমি একা ব্যবহার করার অধিকার রাখি না।

তিনি খুব পেরেশানীতে পড়লেন। এদিকে স্টেশন মাস্টার হল হিন্দু। তাকে তাকওয়া বোঝাবেন কীভাবে। তাকওয়া তো মুসলমানগণই ঠিকমত বোঝে না। তাই তিনি বলাও মুনাসিব মনে করেননি। এ মুহূর্তে অফিসার লোকটি স্টেশন মাস্টারকে ডেকে বললেন, হযরতের জন্য আমার নিজস্ব হ্যারিকেনটি জ্বালিয়ে দাও। স্টেশনেরটি দিও না। সাথে সাথে হযরতের পেরেশানী দূর হয়ে গেল। তিনি কিন্তু কাউকে মুখ খুলে কিছু বলেননি। কেবল মনে মনে পেরেশান হচ্ছিলেন।

দোস্ত! কী বোঝা গেল? যে যেভাবে চলতে চায় আল্লাহপাক তাকে ঐভাবেই চালান। একথা বলবেন না যে, চলতে পারি না, বাঁচতে পারি না। ইচ্ছা করলেই বাঁচা যায়। আমি একটু অগ্রসর হলে আল্লাহপাক আরও অনেক বেশি অগ্রসর হবেন। প্রথমে অগ্রসর হতে হবে আমাকে। চেষ্টা আমার পক্ষ থেকে হতে হবে। গুনাহ ছাড়তে হবে। আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই এ মাহফিলে আসা স্বার্থক হবে। টিভি দেখব না, বেপর্দা হব না, বেগানা মহিলাদের দিকে তাকাব না।

দোস্ত! আসুন একটু মেহনত করি। কয় দিনের মেহনত! অল্প দিনের মেহনতের বদৌলতে আল্লাহ পাক এমন জান্নাত দিবেন যার নাজ-নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.[16]

তুমি দুনিয়াতে মনের বিরুদ্ধে চলেছ, আমাকে রাজি করার জন্য তুমি মনচাহী জীবন বর্জন করেছ, তাই তোমাকে আমি এমন জান্নাতের ব্যবস্থা করেছি যেখানে তোমার মনচাহী জীবন চলবে। মনে যা চাইবে তাই পাবে।

দোস্ত! যদি চোখের হেফাজত না করেন, রাস্তায় চলতে বেগানা নারীর দিকে যদি তাকান তাহলে মনে রাখবেন জান্নাতের হুর আপনার জন্য হারাম হয়ে যাচ্ছে। জাহান্নামের পথ সুগম হচ্ছে। মজা অল্প দিনের কিন্তু সাজা অনন্তকালের। আর যদি অল্প দিনের জন্য এ সামান্য মজা বর্জন করেন তাহলে চিরস্থায়ী মজা লাভ করবেন। ঐ মজার কাছে দুনিয়ার এ মজা কোনো মজাই না। আর এভাবে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে থাকুন। তখন দুনিয়ার মজা কোনো মজাই মনে হবে না। এগুলোর চেয়ে বেশি মজা পাবেন ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে।

আল্লাহপাক সকলকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। অবশিষ্ট জীবন তাঁর রাজি-খুশিমত কাটানোর তৌফিক দান করুন। আমীন।
*

* ২০০৯ ঈ. সালে ফুঁলছোয়ার বার্ষিক মাহফিলের বয়ান

১৬. সুরা হা-মীম সেজদাহ : ৩১

সন্দেহজনক বিষয়ও বর্জনীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ _ [17]

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র

তিলাওয়াতকৃত হাদীসটি হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ প্রায় সব কিতাবেই রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তিরমিযী শরীফে লেনদেন বিষয়ক অধ্যায়ের শুরুতে সর্বপ্রথম এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যতগুলো হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শাগরেদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নাম আমরা সকলেই জানি। হানাফী মাযহাবের যত কিতাবাদী আমরা দেখি, হানাফী মাযহাবকে লিখিতভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা, যার তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)

১৭. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৯৮৪, জামি তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৪

প্রায় সব বিষয়েই কিতাব লিখেছেন। তাঁর রচিত অনেক কিতাব রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- مَا كَتَبْتَ كِتَابًا فِى الزُّهْدِ আপনি এত কিতাব লিখেছেন কিন্তু 'জুহদ' সম্পর্কে তো কোনো কিতাব লিখলেন না। লিখলে ভালো হত।

'জুহদ' অর্থ হল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীন থাকা। এটাকে আমরা দরবেশী বলে থাকি। তো লোকটি তাঁকে প্রশ্ন করেছেন আপনি এত অধিক পরিমাণ কিতাব রচনা করলেন কিন্তু তাকওয়া ও পরহেজগারী বিষয়ে কোনো কিতাব লিখলেন না। জবাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন- كَتَبْتُ كِتَابَ الْبُيُوْعِ فِى الزُّهْدِ অর্থাৎ, আমি আমার মাবসূত নামক কিতাবের 'বুয়ূ' তথা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়টি রচনা করেছি জুহদ সম্পর্কে।

বস্তুত এ অধ্যায়টিই তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিষয়। এর অর্থ হল নামাযের সময় হল তো নামায পড়লাম, লম্বা পাঞ্জাবী পরলাম, পাগড়ী ও টুপি মাথায় দিলাম। দাড়ি রাখলাম। কিন্তু আমার লেনদেন সঠিক নয়। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক নয়। ওয়াদা-অঙ্গীকার ঠিক নয়। হালাল-হারাম বেছে চলি না। মন চেয়েছে তো একটি জিনিস খেয়ে ফেললাম। কিন্তু এটা আসলে আমার জন্য হালাল হয়েছে, নাকি হারাম হয়েছে–এ ব্যাপারে কোনো খেয়াল নেই। অথচ লেনদেন ও মুআমালা পরিচ্ছন্ন থাকার গুরুত্ব অনেক বেশি। সকল পীর-দরবেশের দরবেশী এখানে নিহীত। যাদের মুআমালাত ও লেনদেন ঠিক নয় তারা পরকালে এসবের কারণে ধরা খেয়ে যাবে। কারণ এর সম্পর্ক বান্দার সাথে, হক্কুল ইবাদের সাথে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইসলামের মৌলিক বাণী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তন্মধ্যে এটি একটি–

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.[18]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট...।

১৮. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৯৮৪

হালাল-হারাম সুস্পষ্ট

অনেক কিছু হালাল কিন্তু আমরা অনেকে জানি না। অনেক কিছু হারাম কিন্তু আমরা অনেকে জানি না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হারাম এবং হালাল উভয়টি স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হল হালাল এবং হারাম যদি স্পষ্ট হয় তাহলে আমরা জানি না কিভাবে? এর জবাব হল– হালাল আর হারাম দলীলের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট। শরীয়তের হুকুম যেসব দলীলের ভিত্তিতে নির্গত হয় সেই দলীল তথা কুরআন ও হাদীসে হারাম-হালাল স্পষ্ট। কোনো জিনিস হারাম কিংবা হালাল হতে হলে দলীলের অধীনে আসতে হবে। সন্দেহের দ্বারা কোনো জিনিসের হালাল কিংবা হারাম হওয়ার ফয়সালা করা যাবে না।

আমরা সাধারণ মানুষ তো দলীল খুঁজে পাব না। আমরা শিখব উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে। উলামায়ে কেরাম যেভাবে বলবেন আমরা সেভাবে চলব। তাই তো যারা উলামায়ে কেরামের সাথে বেশি বেশি উঠাবসা করেন তারা হালাল-হারাম বেশি জানেন। এটা উলামায়ে কেরামের সাহচর্যের বরকত।

সন্দেহযুক্ত বিষয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ

হালাল ও হারামের মাঝে অনেকগুলো সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে।

অনেক জিনিস এমন রয়েছে যেগুলো হালাল, না হারাম–তা বোঝা যায় না। এগুলোকে মুশতাবিহাত বা সন্দেহযুক্ত বিষয় বলা হয়।

মনে করুন, বর্তমানে এম.এল.এম নামে একটি ব্যবসা শুরু হয়েছে। এটা নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ব্যবসা। পদ্ধতিগুলো এমন প্যাচানো যে, শরয়ী বোর্ডের মুফতীদেরও হিমশিম খেতে হয়। এ ব্যবসাটাকে হারাম বলব, না হারাম বলব। তার সমাধান দেয়া ভারি কঠিন। এতে এক সাথে কয়েকটি লেনদেনের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এমনিভাবে ডেসটিনি ২০০০ নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সম্পর্কেও কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া মুশকিল। এমন আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মাসআলা জানতে হবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে

আমাদের দেশের জনগণের একটা বৈশিষ্ট্য হল দেখতে হুজুরের মত কেউ কোনো কিছুকে হালাল বললেই হালাল মনে করে, আবার

কেউ হারাম বললেই হারাম মনে করে বসে। এটা কেমন কথা! আমাদের কারো রোগ হলে সেটা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করি, দীনি মাসআলা-মাসায়েল জানার ক্ষেত্রে তেমনটা করি না। ডাক্তারে পর ডাক্তার, হাপতালের পর হাসপাতাল পরিবর্তন করি। দেশে রোগ নির্ণিত না হলে বিদেশে চলে যাই, কিন্তু দীনি মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে এমনটা করি না। মাসআলা-মাসায়েল গ্রহণ করতে হবে মুহাক্কিক ও বিজ্ঞ আলেমদের কাছ থেকে। যারা এ বিষয়ে পারদর্শী। এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে।

আমাদের সমাজে নানা পেশার লোক রয়েছে। একজন ডাক্তার হয়, আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার হয়। প্রত্যেকে তার নিজ বিভাগে পারদর্শী। অন্য ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা অচল। এমনিভাবে মাদরাসার লাইনেও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। ওয়াজ-নসীহত সবার কাছ থেকেই শুনতে পারি কিন্তু মাসআলা-মাসায়েল সবার কাছে জানা যাবে না এবং এগুলো জানতে হবে মুহাক্কিক আলেমদের কাছ থেকে। সরাসরি তাদের কাছে যাব, কিংবা লিখে পাঠাব। সেখান থেকে যে ফয়সালা আসবে সেটাই গ্রহণ করব। এ মূলনীতিটা মনে রাখব। অন্যথায় ধোঁকা খাবেন। আর ধোঁকাটা আমরা নিজেদের কারণেই খাব। আমরা কেন আমাদের রোগের ব্যাপারে সতর্ক হলাম না।

সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জনে দীন ও ইজ্জতের সুরক্ষা

এ সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কী করণীয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

যে সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকল সে নিজের দীনকেও হেফাজত করল, নিজের ইজ্জত-সম্মানকেও হেফাজত করল।

দীন ও ইজ্জত হেফাজত করার পদ্ধতি কী? এর পদ্ধতি হল মুহাক্কিক ও অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া। তিনি ফয়সালা দেয়ার পূর্বে আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকব। মুফতী সাহেব যে সিদ্ধান্ত নিবেন সেটা মানার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকব। সিদ্ধান্তে যদি সেটি করার অনুমতি থাকে তো করব, অন্যথায় বিরত থাকব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে এভাবে সতর্কতার সাথে চলবে সে তার দীনও হেফাজত করল, ইজ্জত-সম্মানও হেফাজত করল।

দীন হেফাজত করল কীভাবে? যদি সন্দেহযুক্ত বিষয়টিতে আপনি লিপ্ত না হন এবং পরে জানতে পারেন যে, সেটি হারাম ছিল তাহলে আপনি হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন। এটাই আপনার দীন হেফাজত করা। ইজ্জত হেফাজত করলেন কিভাবে? যদি আপনি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়ে থাকেন আর পরে সে সম্পর্কে হারাম ফতুয়া আসে, তাহলে লোকজন আপনার সম্পর্কে বলাবলি করবে আরে তার কথা বলো না, ওতো এখন মুফতি বনে গেছে। আগে তো নিজেই সুদ খেতো। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে, এর মাঝে তোমার দীন ও ইজ্জত উভয়টির সুরক্ষা রয়েছে। এর নামই তাকওয়া।

সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কুফল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

যে সন্দেহযুক্ত জিনিসে লিপ্ত হল সে হারামে লিপ্ত হল।

আর হারামে লিপ্ত হওয়া মানে আল্লাহপাকের ক্রোধে নিপতিত হওয়া।

একটি উপমা

কিভাবে হারামে লিপ্ত হয়—এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন–

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ،

আগের যমানায় রাজা-বাদশাদের ঘোড়া চরানোর জন্য কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকত। সাধারণ কোনো নাগরিকের পশু-প্রাণী সেখানে যেতে পারত না। কারো পশু এই বেষ্টনীর ভিতরে এলে পশুর মালিককে বড় ধরনের শাস্তি পেতে হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ নিষিদ্ধ এলাকার পাশ দিয়ে যায় না।

সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে যে বাঁচে সে বুদ্ধিমান। সে হারাম থেকে বাঁচতে পারে। আর যে সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে না, সে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে।

রাজা-বাদশাদের যেমন একটি নিষিদ্ধ এলাকা থাকে যেখানে সর্বসাধারণের পশু-প্রাণীর প্রবেশ নিষেধ, এমনকি তার আশেপাশেও চরানো নিষেধ। কারণ সম্ভাবনা আছে আশেপাশে চরতে চরতে একসময় নিষিদ্ধ এলাকায় পৌঁছে যাবে, অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকেরও একটি নির্ধারিত নিষিদ্ধ এলাকা রয়েছে। যার নাম হল হারাম। কোনো মুসলমান যেন সে নিষিদ্ধ এলাকায় চলে না যায় সে জন্য সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বাঁচার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আর এ বিষয়গুলো আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও খানাপিনার সাথে সম্পৃক্ত। হোটেল-রেস্তোরায় আমরা যেসব খাবার খাই তা জেনে-বুঝে খেতে হবে। বাজার থেকে আমরা মোরগ জবাই ও ড্রেসিং করে নিয়ে আসি তা হালাল পন্থায় হচ্ছে, নাকি হারাম পন্থায়–সে সম্পর্কে আমাদের জানা থাকতে হবে। *

* ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈ. ফুলছোঁয়ার বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নফসের ধোঁকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ _ (سورة الذريٰت : 56)

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

মসজিদে বসে থাকাও ইবাদত

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন; শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন; মন-মগজ ও দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন; মাগরিবের নামায জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন; নামাযান্তে আল্লাহপাকের ঘরে কিছু সময় কাটানোর তৌফিক দিয়েছেন। যতক্ষণ আমরা আল্লাহর ঘরে আছি, যদি কোনো বয়ান নাও হয়, কোনো আলোচনা নাও হয়, এমনকি এভাবে একত্রে বসাও না হয় বরং কেউ যদি আল্লাহর ঘরে একা একা শুধু এ নিয়তে বসে থাকে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ঘর এজন্য আমি এখানে অবস্থান করলাম, তাহলেও সওয়াবের অধিকারী হবেন। এর নামই ই'তেকাফ। আল্লাহর নিসবতে এ ঘর, এজন্য আমি এখানে আছি– আল্লাহপাকের কাছে এটা অনেক প্রিয় আমল।

মুসলমানের সমাবেশ

এর সাথে আরেকটি বিষয় যোগ হয়েছে যে, এখানে আমরা অনেক মুসলমান ভাই একত্রে বসেছি। মুসলমানের ইজতিমা বা একত্রিত

হওয়াও অনেক বড় আমল। এক হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَمُودًا مِنْ يَاقُوتَةٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَلَاقُونَ فِي اللهِ –[19]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের একটি খুঁটি হবে। এ দুনিয়াতেই তো কত রকম দামি দামি মারবেল পাথর রয়েছে। কী ঝকঝক করে! আর এ খুঁটি মারবেলের নয়; বরং ইয়াকুত পাথরের হবে। দুনিয়ার পাথর নয়, জান্নাতের পাথর। জান্নাতের মাটিরও এমন শানশওকত ও চমক হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মানুষের নখে যতটুকু ধারণ করতে পারে এতটুকু পরিমাণ মাটিও যদি কোনোভাবে দুনিয়াতে বিকশিত হয় তাহলে এর চমক ও উজ্জ্বলতায় চন্দ্র-সূর্যের আলো ম্-ান হয়ে যাবে।

তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের তৈরি খুঁটি হবে। তারপর বলেন,

عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ

এ খুঁটির উপর হবে একটি অট্টালিকা। যে অট্টালিকাটি হবে জবরজদ পাথরের তৈরি। দুনিয়ার জবরজদ পাথর নয়, বেহেশতের জবরজদ পাথর।

لَهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ

এ অট্টালিকার চার দিক খোলা থাকবে। (যেন সবকিছু দেখা যায়, আলো-বাতাস আসতে পারে। চিত্তবিনোদনের জন্য যা কিছু দরকার তা সেখানে থাকবে।)

تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ

সেটা এমনভাবে ঝলমল করতে থাকবে যেমন আকাশে উদিত তারকারাজি ঝলমল করতে থাকে।

قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ يَسْكُنُهَا؟

১৯. শুয়াবুল ঈমান লিল বায়াহাকীর বরাতে মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ৫০২৬; আল-যুহদু ওয়াররিকাকি লি ইবনিল মুবারক, হাদীস নং-১৪৮১

সাহাবায়ে কেরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ অট্টালিকাতে কারা বসবাস করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَلَاقُونَ فِي اللهِ

এ অট্টালিকাতে ঐসব মানুষ বসবাস করবে যারা কোনো স্থানে একত্রিত হয়েছে একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে আল্লাহকে খুশি করার জন্য, এ ছাড়া তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহর মহব্বতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যারা পরস্পরকে ভালোবাসে কিংবা কোনো মজলিসে একত্রে বসে কিংবা সাক্ষাতে মিলিত হয় তারা সেই অট্টালিকাতে বাস করবে।

দোস্ত! শুধু একত্রিত হওয়ার মধ্যেও এত ফায়দা। কোনো আলোচনা হল না, এমনিই একসাথে বসলাম—এটাও অনেক বড় আমল। আবার কোথায় বসেছি? মসজিদে। একা একা নয়, একত্রে বসেছি। আবার উলামায়ে কেরামের সাহচর্যে। মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ! এটা বড় খোশ কিসমত! আমার শায়েখ হযরত নানুপুরী (রহ.) বলতেন–

خوش آں وقتے کہ خُرّم روز گارے
کہ یارے برخورد از وصل یارے

''এর চেয়ে বড় আনন্দের ও খুশির বিষয় আর কী যে, আমার মাওলা আমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, আমাকে মাওলার কাছে নেয়ার জন্য এন্তেজাম করছেন।''

এটা আল্লাহ পাকের বড় এহসান ও দয়া। এতে বহু ফায়দা রয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন এ মজলিসকে আমাদের নাজাতের সামানা ও যরীয়া বানান। আমীন!

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

দোস্ত! আল্লাহপাক আমাদেরকে বানিয়েছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য।

আল্লাহ পাক বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ –[20]

আমি জিন-ইনসান একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

২০. সূরা যারিয়াহ্ : ৫৬

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– لِيَعْبُدُوْنِ-এর তাফসীর হল, لِيَعْرِفونِ অর্থাৎ, আমি আল্লাহকে যেন চিনে এ জন্য জিন-ইনসান বানিয়েছি। কারণ আল্লাহপাককে চিনলেই ইবাদতটা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় সেটা খেল-তামাশা হবে। কেউ কাউকে চিনলেই সম্মান করে, ভয় করে।

ইবাদতের অর্থ

ইবাদত কাকে বলে? هِيَ غَايَةُ التَّذَلُّلِ ইবাদত হলো নিজের ইজ্জত-আব্রু যা কিছু আছে সব বিলিয়ে দেয়া, যিল্লতির একেবারে চরম শিখরে পৌঁছে যাওয়া। কার জন্য? আল্লাহর জন্য। এ অবস্থাটা কি এমনিতেই হবে? মাওলার সঠিক পরিচয় লাভ করার পরই এ অবস্থা সৃষ্টি হবে।

আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলী

মাওলায়ে পাকের করুণা ও ক্ষমতা যে অনুভব করতে সক্ষম হবে তার পক্ষেই ইবাদত সম্ভব হবে। যে মাওলার বেনিয়াজী বুঝবে তার পক্ষেই যিল্লতীর চরম শিখরে পৌঁছা সম্ভব হবে। আমার মাওলা যে কেমন বেনিয়াজ তা হাকিম সুনায়ী রহ. এর নিম্নোক্ত কবিতায় ফুটে উঠেছে–

نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی
نتواں شرح تو کردن که تو در شرح نیائی
احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی
لمن الملك توگوئی که سزاور خدائی

"হে মাওলা! তোমার গুণ বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা তুমি বর্ণনার ঊর্ধ্বে। তোমার ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমার নেই। কেননা তুমি ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। তুমি একক ও বেনিয়াজ, তোমার মত কেউ নেই। তুমি রাজাধিরাজ। কেয়ামতের ময়দানে তুমি প্রশ্ন করবে আজকের রাজত্ব কার? তুমি নিজেই জবাব দিবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর।"

দোস্ত! যে আল্লাহকে চিনবে। আল্লাহর দয়া কী, করুণা কী, তাঁর ক্ষমতা কী, রাগ কী, তার কাহহারিয়াত কী, তাঁর সামাদিয়াত কী?— এসব যে জানবে তার থেকেই غَايَةُ التَّذَلُّل বা চরম পর্যায়ের যিল্লতি ও

হীনতা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হবে। এ জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) لِيَعْبُدُوْنِ -এর তফসীর করেছেন لِيَعْرِفُوْنِ দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহপাক জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরিচয় পাওয়ার জন্য। পরিচয় যখন হাসিল হবে তখন তার পক্ষে ইবাদত করা সম্ভব হবে। আর তখনই ইবাদতটা প্রকৃত ইবাদত বলে গণ্য হবে।

মাওলার সন্ধানে

আমরা ইবাদত করি, নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ করি, কত কিছুই তো করি।

گه معتکف دیر م و گه ساکن کعبه
یعنی که ترا می طلبم خانه بخانه

মাওলার জন্য বান্দা কত কি যে বিসর্জন দেয়। শেষ রাতে আরামের ঘুম বিসর্জন দেয়। গভীর রজনীতে মাওলার তালাশে অবতীর্ণ হয়। মসজিদে আসে। কত কী যে করে। এই ইবাদত করে, ঐ ইবাদত করে। মাওলাকে তালাশ করতে করতে মক্কা শরীফে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তালাশ করে আর বলে–

بتا کعبه میرے مولی کهاں هے

হে কা'বা! তুমি বলে দাও, আমার মাওলা কোথায়?

লায়লার ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে মজনু বলে–

اَمُرُّ عَلى الديار دِيارِ لَيلٰى ... وَاُقَبِّلُ ذَ الْجِدَارَ وَذَا الجِدَارا
وَما حُبُّ الديارِ شَغَفْنَ قَلْبِى ... ولٰكِن حُبّ مَن سَكَنَ الدِّيَارا

"আমি লায়লার বাড়ীর দেয়াল ও মাটিতে চুমু খাই মাটি এবং দেয়ালের ভালোবাসার কারণে নয়, বরং আমি চুমু খাই এ জন্য যে, এই মাটি ও ঘরে বসবাসকারী মানুষটি হল আমার প্রিয়। তার ভালোবাসায় মত্ত হয়ে আমি এখানে ওখানে চুমু খাচ্ছি।"

ইখলাস : ইবাদতের রুহ

রুহবিহীন মানুষের যেমন কোনো দাম নেই, তেমনি যে ইবাদতে রুহ নেই তারও কোনো দাম নেই। ইবাদতের রুহ হলো ইখলাস। আমার শায়খ হযরত সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) বলতেন, মানুষের যেমন চোখ আছে, চোখের একটি রাজা আছে। এ রাজার আবার রাজা

আছে। এমনিভাবে আমরা যে ইবাদত করি এই ইবাদতের একটি রুহ আছে, সে রুহের আবার রুহ আছে।

আমাদের দাদাপীর পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী আজীজুল হক সাহেব রহ. এ রুহের হাকীকত বর্ণনা করেছেন খুব সুন্দরভাবে। তিনি বলেন–

اِسی آہ وزاری سے مقصود کیا ھے
لِقائے خدا ھے رضائے خُدا ھے
نہ عزّت نہ دولت نہ لذت نہ راحت
نہ دنیا نہ عقبی کہ سب ماسوا ھے
یہ جنت بھی مطلوب ھے اس وجہ سے
کہ دار اللقاء ھے مقام الرضا ھے

এই যে শেষ রাতে উঠে আহাজারী ও কান্নাকাটি করি, মসজিদে যাই, কত দৌড়ঝাঁপ দেই, মাদরাসা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করি, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত নিয়ে এখানে সেখানে যাই, ওয়াজ-নসীহত করি–এসব কিছুর পিছনে একটি 'ভিন্ন জিনিস' রয়েছে। কাজ তো বিভিন্ন রকম। কিন্তু সবগুলোর পিছনে একটা 'ভিন্ন জিনিস' কাজ করে। সবগুলোর পিছনে যে জিনিসটা কাজ করে, এসবের দিকে যা তাড়িত করে সেটা হল শুধুমাত্র একটি জিনিস। সেটা হল রুহের 'রুহ'। কী সেটা لقائے خدا ھے رضائے خدا ھے আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন।

ইখলাসের আলামত

মাদরাসায় পড়ানো ভালো কাজ কেবল পড়ালেই কাজ হবে না, রুহ থাকতে হবে। রুহ কী? আল্লাহর সন্তুষ্টি। যখন মাওলার সন্তুষ্টির জন্য পড়াব তখন চিন্তা আসবে আমি যেভাবে পড়াই সেভাবে পড়ালে আল্লাহ সন্তুষ্ট কি-না। আমি মাদরাসায় পড়িয়ে যে বেতন গ্রহণ করি, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যা কিছু আমাকে প্রদান করেন আমি তার হক আদায় করি কি না। হক আদায় হলেই তো মাওলা রাজী হবেন, অন্যথায় রাজী হবেন না। ছাত্রদের পিছনে মেহনত করি। আসলে আমি যথাযথ মেহনত করি কি না। আন্তরিকতার সাথে মেহনত করি কি না, তারপরই তো মাওলা রাজী-খুশি হবেন। নাকি শুধু ডিউটি পালনের চিন্তায় থাকি। শুধু কি হাজিরা খাতা পূরণ করার ডিউটি করি, নাকি মাওলার সন্তুষ্টির চিন্তায়

বিভোর থাকি। মাওলার সন্তুষ্টি পেতে হলে সব সঠিকভাবে করতে হবে। এটা হল সব কিছুর রুহের রুহ।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করি, দেখতে হবে আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট কি না? দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত তো ভালো কাজ। কিন্তু আমার এ মেহনতটি আল্লাহপাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে কি না। যদি আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে তাহলে যেসব কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে সেটা কিন্তু আমি করতে পারব না।

কোনো বুযুর্গের হাতে বায়আত হয়েছি, যিকির-আযকার করি– এটা যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় তাহলে ঠিক আছে।

ওয়াজ-নসীহত করা ভালো কাজ। অনেক সময় জযবায় অনেক কিছু বলতে মনে চায়, দেখতে হবে আমার এ কথায় আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন কি-না। আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেই সেটা করা যাবে। এটাই হল রুহের রুহ তথা মাওলার সন্তুষ্টি। সর্বক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টি লাগবে।

اِسی آہ زاری سے مقصود کیا ھے
لقاء خدا ھے رضائے خدا ھے

এ সব কিছুর পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হল মাওলার সন্তুষ্টি ও মাওলার দীদার লাভ করা।

نہ عزت نہ دولت نہ لذّت نہ راحت
نہ دنیا نہ عقبی کہ سب ماسوا ھے

ইজ্জতও আমার উদ্দেশ্য নয় যে, আমি এভাবে চলি তো মানুষের মাঝে ইজ্জত বাড়বে। এটা দীনি কাজের উদ্দেশ্য হতে পারবে না। কেননা এটা গাইরুল্লাহ। ধন-দৌলত হাসিল হবে– এটাও গাইরুল্লাহ। মজা লাগবে, নিজের কাছে ভালো লাগবে, এটাও গাইরুল্লাহ।

নফসের ধোঁকা খুবই সূক্ষ্ম

নফসের মত ধোঁকাবাজ আর কিছুই নেই। নফস হল আমার মন। এ 'মন' কতভাবে যে আমাকে ধোঁকা দেয় তা বোঝা ভারি মুশকিল। নফস বেশি ধোঁকা দেয় ইবাদতের সুরতে, দীনের সুরতে। তাই বলি, ইবাদত করলেই হবে না, দেখতে হবে সে ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে কি

না। যে আমল নফসের মজা লাগে বিধায় করি কিন্তু তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই, সে আমল কোনো কাজে আসবে না।

কুরআন কারীমে আল্লাহপাক বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ـ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا _[21]

অনেকে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কোনো দীনি কাজ করছে আর মনে করছে যে, আমি একটা কাজের কাজ করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ আমল 'জল্লা' গেছে। জল্লা যাওয়ার অর্থ কী? গ্রামের ছোট ছেলেরা গোল্লাছুট নামে একটি খেলা খেলে। ওরা চার দিকে দাগ দেয়। খেলোয়াড়দের সবাইকে দাগের ভিতর থাকতে হয়। দাগের বাইরে চলে গেলে তারা বলে জল্লা গেছে। এমনিভাবে আল্লাহপাকও ইবাদতের জন্য দাগ দিয়ে দিয়েছেন। সে দাগের নাম হল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ দাগের বাইরে গেলে যত ভালো কাজই হোক না কেন **ضَلَّ سَعْيُهُمْ** তার সমস্ত মেহনত ও প্রচেষ্টা জল্লা গেছে (নিস্ফল হয়েছে)।

কয়েকটি ঘটনা

দোস্ত! **حظ نفس** 'হাযযে নফস' বলে একটি বিষয় রয়েছে। এটি খুব জটিল ব্যাপার। এ সম্পর্কে ছোট দুয়েকটি ঘটনা বলি। আমাদের এ মজলিসের নাম হল ইসলাহী মজলিস। সর্বপ্রথম আমার নিজের ইসলাহ দরকার। এজন্য আমার নিজের ইসলাহের জন্য ঘটনাগুলো বলছি। এ উসিলায় যদি আল্লাহপাক আমার নিজের ইসলাহ নসীব করেন। সেই সাথে যারা শুনছেন তাদেরকেও আল্লাহপাক ইসলাহ নসীব করেন। (আমীন)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) কেমন উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা আমরা অনেকেই হয়ত জানি। প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, সম্ভবত কোনো এক হজের সফরে। তিনি এক উর্দূভাষী লোকের সাথে কথা বলছিলেন। কথার প্রসঙ্গে হযরত থানভী (রহ.)-এর আলোচনা এলো। প্রফেসর হামীদুর রহমান

২১. সূরা কাহাফ : ১০৪

হলেন হযরত হাফেজ্জী (রহ.) ও হারদুই উভয় হযরতের খলীফা। প্রফেসর সাহেব ঐ উর্দূভাষীকে জিজ্ঞেস করলেন–

آپ حضرت اشرف علی تھانوی کو پہچانتے ہوں؟

আপনি কি হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কে চিনেন?

সে লোকটি জবাব দিল–

وہ کونسا مسلمان ہے جو انکو نہیں پہچانتے ہونگے

'যে হযরত থানভীকে চিনে না সে আবার কেমন মুসলমান!'

হযরত থানভী (রহ.) কর্তৃক লিখিত ফাতাওয়ার কিতাব ইমদাদুল ফাতাওয়া। তাঁর শায়খের নামে কিতাবটির নামকরণ করেছেন। তিনি হাজারের অধিক কিতাব লিখেছেন। অনেকগুলো কিতাব এমন রয়েছে যেগুলো কয়েক খণ্ডের। তিনি নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো মাসআলা হলে সেটার সমাধান নিজে দিতেন না। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতি হযরত মুফতী শফী (রহ.) ছিলেন হযরত থানভী (রহ.)-এর খলীফা। হযরত থানভী (রহ.) নিজের বিষয়ে কোনো মাসআলা হলে মুফতী শফী (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করতেন। হযরত মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, হযরত! আমাদের সকল মাসআলার সমাধান আমরা আপনার কাছ থেকে লাভ করি আর আপনি কিনা আমাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন–এটা কেমন কথা? তখন হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'হাযযে নাফস' বলে একটি জিনিস রয়েছে। প্রত্যেকের মাঝে যে নফস রয়েছে তার একটি হিসসা বা অংশ রয়েছে। এটা শুধু নিজের দিকে টানে। এর থেকে বাঁচার জন্য আমি এ পন্থা অবলম্বন করি। আমি যদি আমার ব্যাপারে ফায়সালা অপরের নিকট হতে না জানি, তাহলে আমার নফস নিজের মত করে পেশ করে বসে। না জানি ধোঁকায় পড়ে যাই। তার ধোঁকা বোঝার কোনো রাস্তা নেই। এজন্য তোমাকে জিজ্ঞেস করি।

যাই হোক, মুফতী শফী (রহ.) যে সমাধান দিতেন হযরত থানভী (রহ.) সে অনুযায়ী আমল করতেন।

এবার বুঝুন! নফস কেমন জিনিস! আল্লাহর এক আরেফ বলেন-

میری گھات میں ہے خود نفس میرا
الھی اسکو بے مقدور کردے

''আমার নিজের নফসই আমাকে ধ্বংস করার জন্য ওত পেতে রয়েছে। তাই, আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ ও সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসকে ক্ষমতাহীন করে দিন।"

আরেকটি ঘটনা

তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর হাতে বায়আত ছিলেন। গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হয়েছেন। তিনি হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। উজানীর কারী ইবরাহীম (রহ.)-এর পীরভাই। হাটহাজারীর মুরব্বীদের মধ্যে মাওলানা জমীরুদ্দীন সাহেব (রহ.) নামে যিনি ছিলেন তাঁরও পীর ভাই। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) অনেক বড় আলেম ছিলেন। তাঁর রচিত কিতাব আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বযলুল মাজহুদ' যখন ছেপে আরব বিশ্বে পৌঁছেছে তখন আরবের আলেমগণ মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দুস্তানের আলেমদেরকে আল্লাহপাক ইলম দিয়েছেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর ফয়জুল বারী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ)-এর বযলুল মাজহুদ, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর আওজাযুল মাসালিক, আবওয়াবুত তারাজিম লিল বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থ দুনিয়ার সকল আলেম-উলামার মাথা নুইয়ে রেখেছে।

তো হযরত ইলিয়াস (রহ.) কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর পর হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। হযরত ইলিয়াস (রহ.) দাওয়াত ও তাবলীগ নামে যে মেহনত শুরু করেছেন তা আল্লাহপাকের কাছে এত মকবুল হয়েছে যে, এ মেহনত গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। একবার হযরত মুফতী শফী (রহ.) হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সাথে দেখা করতে নিজামুদ্দীন গেলেন। আলাপ-আলোচনার এক ফাঁকে হযরতজী (রহ.) মুফতী সাহেবকে বললেন, ভাই শফী! এই দাওয়াতের কাজ চার দিকে চলছে, তুমি একটু চিন্তা করে বলো তো এটা কোনো ইস্তেদরাজ নয় তো? বিষয়টি নিয়ে আমার ভয় হয়। ইস্তেদরাজ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত একটি প্রসিদ্ধ শব্দ। ইলমুল কালামেরও পরিভাষা।

ইস্তেদরাজ কাকে বলে? ইস্তেদরাজ হল কারো পাপ বাত্তি করার জন্য ঢিল দেয়া। পাপ বাত্তি আমাদের চাঁদপুরের শব্দ। কোনো জিনিস বাত্তি হওয়া মানে পরিপক্ব হওয়া। কারো অন্যায়কে বাত্তি করার জন্য, তাকে ভালো করে ধরার সুবিধায় আল্লাহপাক পাপ বাত্তি করেন। এটাকে ইস্তেদরাজ বলে। ইস্তেদরাজ অর্থ ঢিল দেয়া। কোনো কোনো বান্দাকে আল্লাহপাক ঢিল দেন। এজন্য ঢিল দেন যে, সে তার নফসের চাহিদা মোতাবেক চলতে থাকুক। এরপর তাকে শক্ত করে ধরব। ধরাটা যেন টাইট হয় এজন্য আগে ঢিল দেন। এটাকে ইস্তেদরাজ বলে। কুরআন শরীফে কাফেরদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে–

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ --_ [22]

আমি তাদেরকে এমনভাবে ঢিল দিব যে, তারা অনুভব করতে পারবে না।

চিন্তা করে দেখুন, হযরত ইলিয়াস (রহ.)-এর দৃষ্টি কোথায় পড়েছে! তিনি বলছেন, ভাই শফী! বিশ্বব্যাপি দাওয়াতের যে মেহনত চলছে এটা কোনো ইস্তেদরাজ কি না! এটা আল্লাহর মকবুল কোনো কাজ, নাকি তিনি ঢিল দিচ্ছেন যে, এ কাজ আরো সামনে বাড়ুক, যাতে সবার গুনাহ আমার আমলনামায় আসে। আমার ভয় হয়।[২৩]

এবার চিন্তা করে দেখুন, তাঁদের ভিতরে কী পরিমাণ ইসলাহ ছিল। এত বড় দীনি কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অথচ অন্তরে কোনো অহমিকা নেই, নেই কোনো ওজব বা আত্মপুলক। একটা কিছু করছি—এমন কোনো ভাবসাব নেই।

নফস ও শয়তান

দোস্ত! হাযযে নফস, নফসের হিসসা, নফসের ধোঁকা খুবই সূক্ষ্ম ও মারাত্মক হয়ে থাকে। সবার ভিতরেই এ প্রতারক নফস রয়েছে।

আমরা কিন্তু বেশির ভাগ সময় শয়তানের দোষ দিয়ে থাকি। বলি, হুজুর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে করে ফেলেছি। আসলে এটা সঠিক কথা

---

২২. সূরা আনআম : ১৮২

২৩. মুফতি শফী ছাহেব বললেন, এটা ইসতেদরাজ নয় মক্বুলিয়্যাত। হযরতজী বললেন, আপনার কাছে কি দলীল আছে? বললেন, হ্যাঁ আছে। আল্লাহ যাদেরকে ঢিল দেন, তাদের মনে এ ভয় আসেই না। আপনার অন্তরে এ ভয় আসাই দলীল, এটা ইসতেদরাজ নয়, মক্বুলিয়াত। –সূত্র: মাসিক আল–কাউসার, পৃষ্ঠ-২৮, সংখ্যা- 'জুন–জুলাই' ২০১৫ইং।

নয়। কারণ শয়তান তো হল বাইরের দুশমন। শয়তানের ইসলাহ বা সংশোধন করা সম্ভব নয়। এটা হল এমন একটি জিনিসের দোষ দিয়ে বাঁচা যার উপর আমার ক্ষমতা নেই। মনে রাখবেন, শয়তান ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করতে পারে না, যতক্ষণ নফস ভিতর থেকে সবুজ সংকেত না দেয়। আমাদের প্রকৃত দুশমন তো হল নফস। এটা শয়তানের চেয়েও মারাত্মক দুশমন।

শয়তান তো শয়তান ছিল না। আজাজীল ছিল। ফেরেশতাদের উস্তাদ ছিল। তাকে তো তার নফসই শয়তান বানিয়েছে। তাহলে জানা গেল যে, শয়তানের গুরু হল নফস।

ইসলাহে নফস বনাম ইসলাহে শয়তান

এ জন্য আমাদের পীর-মাশায়েখ 'ইসলাহে নফস' বলেন, ইসলাহে শয়তান বলেন না। অনেকের ভাবসাব এমন মনে হয় যে, সে শয়তানের ইসলাহ করে ফেলবে। কিছু কিছু মানুষ হজে গেলে অপেক্ষায় থাকে দশ তারিখটা কবে আসবে। সেদিন মিনায় গিয়ে শয়তানকে পাথর মারবে। কী আশ্চর্যকর জযবা! আর ওখানেই দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। আর এ জযবার কারণেই সেসব দুর্ঘটনা ঘটে। মনে করে বিশাল একটা কিছু করে ফেলবে। শয়তানকে পাথর মেরে ইসলাহ করে ফেলবে।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়

মনে রাখবেন, শয়তানের ইসলাহ করার ক্ষমতা আল্লাহপাক কারো হাতে দেননি। শয়তানকে আল্লাহপাক এত ক্ষমতা দিয়ছেন যে, অলীদের কথা তো বাদ নবীদেরকেও আল্লাহপাক বাঁচিয়ে রেখেছেন তো বেঁচে থেকেছেন। অন্যথায় শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচা অসম্ভব। শয়তানের ইসলাহ আমাদের হাতের কাজ নয়। এ জন্য আল্লাহ পাক নফসের ইসলাহ বিষয়ে অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। বলেছেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ـ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى .[24]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত রাখে, জান্নাতই তার একমাত্র ঠিকানা।

২৪. সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১

আল্লাহপাক অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى --[25]

নিশ্চয় সফল সে, যে আত্মিক ব্যাধি থেকে পরিশুদ্ধ হয়।

এরূপ অনেক অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে নফসের ইসলাহ বা পরিশুদ্ধি প্রসঙ্গে। কিন্তু শয়তানের সাথে মুজাহাদা করলে কিংবা শয়তানকে ইসলাহ করলে কী ফায়দা হবে– এটা কোথাও বলেননি; বরং যেখানে শয়তানের ব্যাপার রয়েছে সেখানে এসেছে– **اعوذ بالله من الشيطان الرجيم** 'আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। অর্থাৎ, শয়তানের সাথে মোকাবেলা নয় বরং তার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। শয়তানের বিরুদ্ধে এমনটি বলা হয়নি। এ ক্ষেত্রেও আমরা একটি ধোঁকায় পড়ে আছি। কারণ আমার নফসের উপর ব্যয় করতে পারার মত ক্ষমতা আল্লাহপাক আমাকে দিয়েছেন। এ ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন। এজন্য নফসের ইসলাহ বা তার খাহেশাত হতে বেঁচে থাকার হুকুম আল্লাহ পাক প্রত্যেককে দিয়েছেন। নফসের ধোঁকা থেকে বাঁচা ফরজ। আর যেখানে শয়তানের বিষয় এসেছে সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। কারণ এটা এত শক্তিশালী যে, কাউকে তার উপর কর্তৃত্ব দেননি। এজন্য শয়তান যেহেতু খুব শক্তিশালী তাই কী করতে হবে? তার চেয়েও বড় শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। আর আল্লাহপাক যেহেতু শয়তানের উপর শক্তিশালী তাই আল্লাহপাকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কোনো দুর্বল ব্যক্তি যদি তার চেয়ে সবল কারো দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে তাঁর চেয়ে বড় শক্তির কাছে সাহায্য চায়। কোনো ব্যক্তি যদি মেম্বার দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে আরেকজন মেম্বারের কাছে সাহায্য চাইলে কাজ হবে না। চেয়ারম্যানের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি চেয়াম্যানের দ্বারা আক্রান্ত হয় সে ক্ষেত্রেও আরেকজন চেয়ারম্যানের কাছে সাহায্য চাইলে কাজ হবে না। চেয়ারম্যানের উপর ক্ষমতাবান কারো কাছে সাহায্য চাইতে হবে। এমপি বা মন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইলে কাজ হবে। এমনিভাবে শয়তানের উপর

২৫. সূরা 'আলা : ১৪

আমাদের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই। শয়তানের ক্ষমতা আছে আমাদের উপর। এজন্য এর চিকিৎসার একমাত্র পথ হল আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। এমন দোয়া করা যে, হে আল্লাহ শয়তানের ধোঁকা প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি আমাকে বাঁচান। এজন্য হাদীস শরীফে অনেক দোয়া বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে– তোমরা যদি কুকুরের আওয়াজ শুনতে পাও, গাধার আওয়াজ শুনতে পাও, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর। এর কারণ হল– কুকুর এবং গাধা শয়তান দেখতে পায়, তাই ঘেউ ঘেউ করে বা হিঃ হিঃ করে ডাকতে থাকে। এটা একটি লক্ষণ। এজন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

এ জন্য প্রত্যেকের উচিৎ হল নিজের নফসের ফিকির করা। নফসের ফিকির বলতে নফসের ইসলাহ ও সংশোধন করার ফিকির করা। নফসকে কীভাবে দমন করে রাখা যায়, সব সময় এ ব্যাপারে চেষ্টা করা।

নফসের ব্যাপারে আমৃত্যু সতর্ক থাকতে হবে

নফসকে মারা যায় না, দমন করে রাখা যায়। যতদিন আপনার হায়াত আছে ততদিন নফসও আছে। আরেকটা বিষয় হল, আপনি যতদিন সবল থাকেন ততদিন নফস যেমনই থাকুক কিন্তু যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবেন তখন সেটা বৃদ্ধ হবে না। সে আরো তাজা হবে। এটাকে দমিয়ে রাখতে হয়। এজন্য বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদাও বাড়িয়ে দিতে হয়। তখন তো আর তেমন কাজ থাকে না, তাই নফসের মুজাহাদা বেশি বেশি করা। এটা মনে করার সুযোগ নেই যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে আছি তাই নফসও বুঝি দমে গেছে। গায়ে শক্তি নেই দেখে হয়ত চুপচাপ আছে কিন্তু সুযোগ পেলে ছাড়বে না। শীতকালে সাপ একদম মরার মত পড়ে থাকে। তেমন নড়াচড়া করে না। মানুষ পা দিয়ে লাথি মারলেও তেমন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। নফসকে বড় জোর এরকম বানানো যায়। এর চেয়ে বেশি নয়। মুজাহাদা করে, নফসের বিরোধিতা করে শীতকালের সাপের মত দমিয়ে রাখা যায়।

নফস দমে থাকলে মনে করবেন না যে, কাবু পেয়ে গেছেন। যে কোনো মুহূর্তে সে নড়াচড়া করে উঠতে পারে। কারণ সে তো মরেনি।

শীতে নীরব হয়ে আছে। আবার যখন রোদের তাপ পাবে তো নড়াচড়া করে উঠবে। তাই নফসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, এর ইসলাহের ফিকির সব সময় করতে হবে।

দীনি কাজ বদদীনি পন্থায় করা যাবে না

আরজ করছিলাম, সব ইবাদতের ক্ষেত্রে রুহ চাই, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি চাই। যে কোনো কাজই করতে যাব, দেখব এ কাজে আমার মাওলা সন্তুষ্ট কি না। এ কাজে মাওলার অসন্তুষ্টিপূর্ণ কোনো কাজ হচ্ছে কি না।

আমরা অনেকে ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে ছবি তুলে আনি। এ ছবিটা তোলার সময় মনের ভিতর তো ভালোই লেগেছে। কী সুন্দর মজলিস, হুজুর সুন্দর করে বয়ান করছেন, এর একটু ছবি তুলে রাখি, মাঝে মধ্যে দেখব ভালো লাগবে। ঘরে নিয়ে মাকে দেখাব, বিবিকে দেখাব, কত ভালো হবে! কচুর ছড়া হবে। কচুর ছড়ারও দাম আছে। কিন্তু এ ছবির কোনো দাম নেই। আপনার ওয়াজ শোনার চেয়ে না শোনাই ভালো ছিল। ওয়াজে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভালো ছিল। ওয়াজে গিয়ে গুনাহগার হয়েছেন। যে কাজগুলো করেছেন তা মনের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগার জন্য করেছেন। ভালো তো আপনার নফসের কাছে লেগেছে। আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ভালো লাগেনি। এজন্য মনকে জিজ্ঞেস করবেন, হে মন! কাজটি তো ভালোই লাগছে কিন্তু আসলে আল্লাহ তা'আলা রাজী হবেন কি না। মনকেও যদি জিজ্ঞেস করতেন, ও মন! তুমি বলো তো একাজে আল্লাহ রাজী হবেন কি? তাহলে সে বলতো, ছবি তোলা তো হারাম, যে ঘরে ছবি থাকবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা যায় না। আপনার মনই যেখানে এটাকে সওয়াবের কাজ বলে স্বীকৃতি দেয় না, আপনি সে কাজটি কিভাবে করবেন।

একজন হজ করে এসে বিরাট আয়োজন করেছেন। এমনভাবে কথাবার্তা বলছেন যে, বিরাট কিছু করে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ পর জানা গেল যে, হজে তার সাথে তার ভাবী সাহেবাও গেছেন। ভাই মারা গেছেন। ভাবীর উপর হজ ফরজ হয়েছে। ছোট ভাই হজে যাবে তো ভাবীকে সাথে নিয়ে গেছেন। কাগজপত্রে তো মাহরাম লাগে। তিনি নিজে মাহরাম সেজে গেছেন। কাগজে ভাই লিখে দিয়েছেন। এমন তো কতজনই যাচ্ছে আর হজ করে আসছে। তো সে ভাবীর মাহরাম হয়ে

হজ করে এলো। ভাবনাটা হলো এই– ফরজ আদায়ে সাহায্য করে ভাবীর বিরাট উপকার করেছি। আবার নিজেও হজের মত একটা আমল করে এলাম। কী যে খুশি! ভাবীও খুশি, দেবরও খুশি। অনেক বড় কিছু করে এসেছেন। খুশির আতিশয্যে গরু দুইটার বদলে পাঁচটা জবাই করে এলাকাবাসীকে আপ্যায়ণ করে শুকরিয়া আদায় করেছেন।

আল্লাহ কী বলেন? আল্লাহ বলেন, তোমার মন খুশি হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার নফস এ হজে খুশি হয়েছে; কিন্তু আমি মাওলা খুশি হতে পারিনি। কেন? ভাবীর সাথে দেখা দেয়া হারাম। আর সফরে এভাবে থাকা, টিকিট করা, পাসপোর্ট প্রদর্শন করাসহ কত কাজ। এক সাথে তওয়াফও করেছেন। এ তওয়াফে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ দয়া-মায়া করেন বিধায় রক্ষা। অন্যথায় গজব দিয়ে ওখানেই শেষ করে দিতেন।

এটাই হল 'হাযযে নফস' বা নফসের ধোঁকা। সব কাজে দেখতে হবে আমার মাওলা রাজী কি না। সমাজ সন্তুষ্ট হবে, পরিবারের সদস্যগণ সন্তুষ্ট হবে, আমার কাছেও ভালো লাগবে যে, আমার বিধবা ভাবীর একটু উপকার করে দিলাম। মানলাম তুমি খুব ইখলাসের সাথে উপকার করেছ, মনে কোনো দুষ্ট চিন্তা ছিল না, জাগেওনি, তারপরও কি এ হজে আল্লাহ তা'আলা রাজী হবেন? হবেন না। কেন? পদ্ধতি সঠিক নয়।

দুনিয়াতে কোনো ওলী-বুযুর্গ নফসের ব্যাপারে কখনো গাফেল ও উদাসীন থাকেননি। সব সময় সচেতন থেকেছেন, নজরদারী করেছেন। আশঙ্কা করেছেন কোনো ধোঁকায় পড়ে যাই কি না। নফসের ধোঁকা বোঝাও অনেক মুশকিল।

নিজে আমল করুন এবং অন্যের ব্যাপারে মন্তব্য বর্জন করুন

আমার নিজের সাথে একজনের এক কারগুজারী শোনাই। বহু আগের ঘটনা। শায়েখ (রহ.) তখন জীবিত। কমপক্ষে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা হবে। ওয়াজে গিয়েছিলাম। আমার সাথে হযরতের একজন মুরিদ ছিলেন। সেখানে রাত্রী যাপন করি। সেখানে আরও উলামায়ে কেরাম ছিলেন। আমি আগে বয়ান করে এসে নির্ধারিত

কামরায় শুয়ে পড়েছি। এজন্য শেষ রাতে আগে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আমি আর আমার সাথী উঠেছি। নামায পড়ে যিকির করলাম, আমাদের পাশে দু'জন আলেম ঘুমাচ্ছেন। তারা গভীর রাত পর্যন্ত বয়ান করেছেন। জাগ্রত হতে পারেননি। আযান দেয়ার পর তারা উঠেছেন। আমার সাথী আযানের আগে বলতে চাইলেন, এখনও তারা শুয়ে আছেন! তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন না! আমি ইশরা দিয়ে বললাম, চুপ, চুপ।

ভিতরে যদি এতটুকু বিষয় চলে আসে যে, আমি উঠেছি আর তিনি উঠেননি, তাহলে সব শেষ। এ উঠার চেয়ে না ওঠা ভালো। এসব হল নফসের ধোঁকা। বোঝা উচিত ছিল আমি একা একা ইবাদত করছি। আর তারা অনেক রাত্রে বয়ান করেছেন। হাজার হাজার মানুষকে দীনের কথা শুনিয়েছেন। তাদের আমলটা অনেক সওয়াবের ছিল। ঘুম কম হওয়ায় এখনও উঠতে পারেননি। আমরাও যদি দেরীতে ঘুমাতাম তাহলে হয়ত জাগ্রত হতে পারতাম না।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ছোটবেলা আমি আমার আম্মার সাথে রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠেছি।

আপনারা শেখ সাদীকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন জানি না। অনেকে হযরত শেখ সাদীকে একজন পর্যটক হিসেবে জানেন, কারণ তাঁর অনেক ভ্রমণকাহিনী ও উপদেশবাণী রয়েছে। শেখ সাদীর পরিচয় কেবল এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি ছিলেন সমকালীন বড় মাপের একজন বুযুর্গ। হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। ঐ তরীকার উঁচু পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন।

লজ্জাশীলতার বিরল দৃষ্টান্ত

হযরত শেখ সাদী ও তাঁর পীরের নাম বলতে গিয়ে একটি সুন্দর কথা মনে পড়েছে। হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেন, আমার শরীরের এক জায়গায় একটি ফোঁড়া হয়েছিল। শায়খ বিষয়টি জানতেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার ফোঁড়াটার কী অবস্থা? এমন প্রশ্ন তিনি অনেক দিন করেছেন। কিন্তু কোনো দিন এটা জিজ্ঞেস করতেন না যে, তোমার ফোঁড়াটা কোথায় হয়েছে? একথা বলে তিনি বলেন, আমি এ থেকে বুঝে নিয়েছি যে, মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন নয় যার আলোচনায় আনা যায়।

গোপন অঙ্গের আলোচনা করা ভালো নয়, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাও ভালো নয়, কান দিয়ে শোনাও ঠিক নয়। এরও একটা লজ্জাশীলতা রয়েছে। যেমনিভাবে অঙ্গটার লজ্জা রয়েছে, তেমনিভাবে শব্দটারও লজ্জা রয়েছে। আমরা তো ধীরে ধীরে অনেক বেহায়া হয়ে যাচ্ছি। আর ফোন মোবাইল লজ্জা-শরম সবটাই খেয়ে ফেলেছে। একজন তার স্ত্রীর সাথে কথা বলছে। আশে পাশে অনেক মানুষ। শরম থাকা দরকার। আর যদি বিষয়টি আলেম-উলামার হয় তাহলে কত জঘণ্য হবে? আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলছি, এটা মানুষ জানবে কেন? লজ্জা-শরম থাকা চাই।

এগুলো নিজের নফসের হিসসা। আর নিজের হারীমের হিসসা অন্যকে দেয়ার শামিল। মানুষ এবং প্রাণীর মাঝে পার্থক্য থাকা চাই।

কোনো মহিলা যদি পর্দানশীন হন, তিনি পছন্দ করেন না যে, তার কথাগুলো অন্য কেউ শুনুক, তাহলে আপনি যে মানুষের সামনে ফোন করলেন এবং মানুষ তার কিছু কথা শোনল বা বুঝল এটা তার উপর একটা জুলুম হবে। আপনি জালেম হবেন।

শেখ সাদী (রহ.) বলেন, আমি আম্মার সাথে শেষ রাতে উঠেছি। তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর আম্মাকে বললাম, আম্মা! আমরা তো উঠে নামায পড়লাম। কিন্তু আশেপাশের মানুষগুলো কেউ উঠল না। তারা যদি উঠত ভালো হত। তাঁর আম্মা বললেন, বাবা! তুমি না উঠাই ভালো ছিল। তুমি উঠে এ ধরণের একটি ধারণার শিকার হলে যে, তুমি ভালো আর তারা ভালো নয়, এতে তো তোমার ক্ষতি হয়ে গেছে। উঠে যা হাসিল করেছ, আর না উঠলে যা ঘাটতি হত এতটুকু ধারণা লালন করার কারণে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।

মা যখন আল্লাহওয়ালা হোন

যেসব মা সন্তানকে এ ধরণের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সন্তানগণ আলোকিত মানুষ হবেন না কেন? আগের মায়েরা কেমন ছিলেন আর বর্তমানের মায়েরা কেমন। এই মায়েদেরকে তো আমরাই লালন-পালন করি। আমার মেয়ে মা। আমার মেয়ে আমার নাতনীর মা। আমি কি আমার মেয়েকে ঐ রকম গুণে গুণান্বিত মা হিসেবে গড়ে তুলছি যে ঘরে

শেখ সাদীর মত মানুষ জন্ম নিবে। ঐ রকম মা হলেই তো তার সন্তান শেখ সাদী হবে, আব্দুল কাদির জিলানী হবে।

এবার আমার মায়ের একটি কথা বলি। একেবারে ছোট বেলার কথা। ছোটবেলার কথাটিও আল্লাহর মেহেরবানীতে স্মরণ আছে। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে সর্বপ্রথম যা শিখেছি তা আমার স্মরণ আছে। একদিন মা আমাকে তার কাছে শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। আমার বড় বোনও পাশে শোয়া। আমার মনে আছে, মা তখন ঘুম পাড়ানোর জন্য বলছিলেন–

جرس هردم بگوید الله هو ÷ نه گوید ٹن ٹنا ٹن نه ٹو ٹو

এটা তো ফার্সী কবিতা। তিনি এর অর্থও আমাদেরকে বলেছেন যে, ঘড়ি থেকে টুনটুন আওয়াজ বের হয়। আসলে ঘড়ি টুন টুন করে না। বরং এটা আল্লাহু আল্লাহু করে।

بظاهر سمع می آید که ٹو ٹو ÷ که در معنی بگوید الله هو

আম্মাজানের কাছে কারী ইবরাহীম (রহ.)-এর একটি ঘটনা শুনেছি। আম্মাজান তো হলেন কারী ইবরাহীম সাহেবের নাতিন। আমার নানা ছিলেন মাওলানা শামসুল হক সাহেব। কারী সাহেবের পর তিনি উজানীর খলীফা ছিলেন। তার হাতে লোকজন বায়আত হতেন। কারী ইবরাহীম সাহেব আমাদের বাড়ীতে প্রায় আসতেন। একদিন মসজিদে মাগরিব নামাজ পড়ে ঘরে এসেছেন নফল নামায পড়ার জন্য। ঘরের বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি ও হুড়াহুড়ির কারণে তাঁর নামাজে ব্যাঘাত হচ্ছিল। তখন তিনি মুসাল্লাটা কাঁধে নিয়ে বাড়ির দক্ষিণ পাশে পুকুরের মাঝখানে চলে গেছেন। পুকুরের মাঝখানে মুসাল্লা বিছিয়ে নামায পড়া শুরু করেছেন। অলীদের কারামত সত্য। অনেক নামধারী মুসলমানও এখন এগুলো বিশ্বাস করে না। নাউযুবিল্লাহ! যারা এ বিশ্বাস রাখবে না, তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত থেকে খারেজ হয়ে যাবে। কারণ এ বিশ্বাসটা নস তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে সাহাবায়ে কেরামের বহু কারামাতের কথা এসেছে।

তো দোস্ত! আমরা আমাদের মা'দেরকে কী বানাচ্ছি। আমার মেয়েও তো একদিন মা হবে।

হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর মা তাকে দীনদারী শিক্ষা দিচ্ছেন। নফসের ধোঁকা সম্পর্কে সাবধান করছেন সে ছোট বেলা থেকেই। তাই আমরাও সাবধান হই। রুহের রোগ খুঁজে বের করি। যদি নফসের রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি তাহলে নফসের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

নফসের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য ভিন্ন কিছুর প্রয়োজন হবে না। শুধু নফসের রোগগুলো সম্পর্কে জানলেই হবে। এর একটি উদাহরণ শুনুন। আমার এক মহব্বতের মানুষ চরমোনাইর মরহুম পীর হযরত মাওলানা ফজলুল করীম সাহেবের হাতে বায়আত হয়েছেন। তিনি বেশ সম্পদশালী। আমাদের দেশের কিছু সংগঠন আছে যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করে। তারা দেশের বড় বড় মানুষকে টার্গেট করে দাওয়াতী কার্যক্রম চালায়। উনার কাছেও আসত। বারবার এসে বিরক্ত করত।

আরসিন গেটের ইমাম মুফতি ইমামুদ্দীন সাহেব একদিন তাকে বলেন, আবার যদি তারা আসে, তাহলে আপনি বলে দিবেন আমি চরমোনাইর পীরের হাতে বায়আত হয়ে গেছি। দেখবেন আর কেউ কাছে ভিড়বে না। ঠিকই পরে যখন এসেছে তখন তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন আমি চরমোনাই মুরীদ হয়ে গেছি। ঠিকই এরপর আর তারা আসেনি।

এ উদাহরণটি এই জন্য দিলাম যে, আমরা যদি একটা টার্গেট ঠিক করতে পারি যে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই, আর কিছুই চাই না, যত কিছু করব, তাবলীগ করব, যিকির করব, মাদরাসায় পড়াব, আরও যত কাজ করব সবগুলোতে তালাশ করব আমার রূহ ঠিক আছে কি না। আমার এ কাজে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট আছেন কি না। দলের সন্তুষ্টি, নাকি নফসের সন্তুষ্টি। পরিবারের সন্তুষ্টি, নাকি সমাজের সন্তুষ্টি। যদি এ মূলনীতি সামনে রাখেন যে, আমার মাওলা সন্তুষ্ট কি না, তাহলে নফস সোজা হয়ে যাবে। আমার মাওলা সন্তুষ্ট হলেই চলবে। আর কারো সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার সবাই বেজার হয়ে যাক। সবার রাজী দিয়ে আমি কী করব? সবাইকে রাজী করলাম কিন্তু আমার মাওলা রাজী নন, তাহলে কী লাভ হবে?

আল্লাহপাক আমাদেরকে কথাগুলো বোঝার ও আমলের তৌফিক দান করুন। আমীন! *

* ২০১৪ ঈ. সালে নারায়ণগঞ্জ ডি.আই.টি মসজিদে প্রদত্ত বয়ান

মসজিদ : মাগফিরাতের ঠিকানা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا _[26]

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيه وَسَلَّمَ : اِنَّ الْمَسَاجِدَ سُوقٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ، مَنْ دَخَلَهَا كَانَ ضَيْفًا لِلّٰهِ، قِرَاهُ الْمَغْفِرَةُ، وَتَحِيَّتُهُ الْكَرَامَةُ _
(كنز العمال، رقم الحديث : 20348)

و قال النَّبِي ﷺ : مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَه الْبَيْتَ فِى الْجَنَّةِ.[27]

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

২৬. সূরা জ্বীন : ১৮
২৭. শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-২৬৭৮

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন। শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ ও দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হল দীন। এ দীনের নিসবতে এবং এ দীনের মহব্বতে আমাদেরকে এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন।

মাগরিবের নামায আদায়ান্তে আল্লাহপাকের ঘর মসজিদে বসার তৌফিক দান করেছেন। এ মুহূর্তে আল্লাহ পাক কত মানুষকে কত জায়গায় রেখেছেন। একদল সিনেমা হলে রয়েছে, একদল টেলিভিশনের সামনে রয়েছে, একদল নারী-পুরুষ একসাথে গোনাহের পরিবেশে রয়েছে। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। আমাদের কিছু সংখ্যক লোককে দয়া-মায়া করে তাঁর পবিত্র ঘর মসজিদে এনে বসিয়েছেন।

মসজিদ আল্লাহর ঘর

কুরআন কারীমে আল্লাহপাক বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ মসজিদসমূহ হল আল্লাহর। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর ঘরে এনে বসিয়েছেন- এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। মসজিদে যদি আমরা কোনো আমল না করে শুধু বসে থাকি তাতেও অনেক অনেক ফায়দা। এর সাথে যদি কিছু আমল করি, কিছু মুযাকারা ও আলোচনা করি, তাহলে আরও বেশি ফায়দা। কেউ বললাম, কেউ শুনলাম। আলোচনা করতে হলে তো কেউ বলতে হয়। সবাই চুপ করে থাকলে তো আর আলোচনা হবে না। যিনি বলেন, তিনি অন্যদের চেয়ে বড় কিছু এমনটিও নয়। কোনো একজনকে তো বলতেই হবে। তাই বলব। বলা এবং শোনা উভয়টি মিলে একটি জিনিস। যেমন বনভোজন করতে গেলে কেউ ভাত রান্না করে, কেউ লাকড়ী সংগ্রহ করে, কেউ পানির ব্যবস্থা করে। সবার কাজ কিন্তু একটিই। এখানে কেউ বড় কিংবা ছোট এমন কিছু নয়। বনভোজন করতে হলে কর্মবণ্টন করেই করতে হয়। এমনিভাবে কোনো ব্যাপারে আলোচনা করতে হলে কেউ বলবে আবার কেউ শুনবে। সবাই বললেও হবে না, সবাই শুনলেও হবে না। তাই ভাগ করে নেয়া হয়েছে।

অন্যথায় শোনাটা আমারও কাজ, আবার বলাটা আপনাদেরও কাজ। আমরা ভাগ করে নিয়েছি যে, কেউ বলবে, কেউ শুনবে।

আল্লাহ পাক বড় এহসান ও অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলা ও শোনার জন্য মসজিদে এনে বসিয়েছেন।

মসজিদপ্রেমিকগণ আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে

হাদীসে পাকে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাশরের কঠিন দিবসে সাত রকম মানুষ আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। সে সাত দলের মধ্যে এক দল হল- وَرَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ 'ঐ ব্যক্তি যেখানে থাকুক না কেন, তার মনটা মসজিদের সাথে লেগে থাকে। আসর নামায পড়ে বের হয়েছে। বের তো হতেই হয়। বের হওয়ার পর মা-বাবার সেবা কর, প্রয়োজন থাকলে হালাল রিজিক অন্বেষণ কর, কিন্তু আবার ডাক দেয়া হলে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়াও আল্লাহর হুকুমে, আবার আযান হলে চলে আসাও আল্লাহর হুকুমে। মুসলমান মসজিদ থেকে বের হয় কিন্তু দিলটা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। নামায শেষে বের হচ্ছে, কিন্তু আবার আযান হলে চলে আসে। এটা সাধারণ কোনো আমল নয়; যে এ আমলটি করবে সে কঠিন হাশরের দিনে আরশে আজীমের ছায়ার নিচে স্থান পেয়ে যাবে।

দোস্ত! এ সময় কত মানুষ কত রকম গুনাহে লিপ্ত আছে আর মনে করছে যে, খুব আরামে আছে, মওজে আছে, আনন্দে আছে। আসলে কোন অবস্থায় আছে তা আল্লাহ পাকই জানেন। আল্লাহ পাক দয়া-মায়া করে আমাদেরকে মসজিদে এনে বসিয়েছেন।

দুনিয়ার মসজিদসমূহ কাবা শরীফের শাখা

দুনিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ইবাদতখানা কাবা শরীফ। আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির আগে এমনকি হযরত আদম (আ.)-এর জন্মেরও পূর্বে ফেরেশতাদের মাধ্যমে খানায়ে কা'বা বানিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম

(আ.) তা পূনঃনির্মাণ করেছেন। সর্বপ্রথম ফেরেশতা দিয়ে, তারপর আদম (আ.)-কে দিয়ে। এটা দুনিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ঘর এবং সর্বপ্রথম মসজিদ। শুধু মসজিদই নয়; দুনিয়ার অগণিত মসজিদের কেবলা। প্রতিটি মসজিদ খানায়ে কা'বার শাখা। আল্লামা ইকবাল বলেন–

دنیا کے بتکدو ں میں وہ پہلا گھر خدا کا
ہم اس کےپاسپاں ھیں، وہ پاسپاں ھمارا

পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ঘর হল বাইতুল্লাহ শরীফ। আমরা সে গৃহের সংরক্ষক এবং সে গৃহ আমাদের সংরক্ষক।

এক হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের পূর্বে যখন একদল মানুষ খানায়ে কা'বায় আক্রমণ করতে আসবে তখন আল্লাহপাক খানায়ে কা'বাকে আসমানে উঠিয়ে নিবেন। এরপর পরই কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

কা'বা শরীফের উদাহরণ হল, মানুষের দেহের মধ্যে মাথার মত। মানুষের মাথাটা যে পজিশনে রয়েছে, ঠিক পৃথিবীতে খানায়ে কা'বা ঐ পজিশনে। মানুষের দেহ থেকে মাথাকে উচ্ছেদ করা হলে যেমন মানুষটি বাঁচে না তদ্রুপ কা'বা শরীফকে যখন পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে তখন পৃথিবীও থাকবে না, কেয়ামত হয়ে যাবে। আর এ ঘরটি উঠিয়ে নেয়ার আগে পৃথিবীর মসজিদগুলোকে তার সাথে মিলিয়ে দিবেন। কা'বার সাথে মসজিদগুলোও উঠিয়ে নিবেন।

এবার বলুন তো, এ মসজিদের সাথে যাদের মহব্বতের সম্পর্ক থাকবে, যাদের দিলটা এ মসজিদের সাথে যুক্ত থাকবে; এদের সাথে আল্লাহ পাক কেমন আচরণ করবেন?

জমিনের উপরে সবচেয়ে দামি জায়গা হল বাইতুল্লাহ শরীফ। আর এসব মসজিদ যেহেতু বাইতুল্লাহর শাখা, তাই প্রত্যেক অঞ্চলে মসজিদের চেয়ে উত্তম কোনো জায়গা নেই।

রওজা শরীফের মর্যাদা

আর জমিনের ভিতর হিসেবে সবচেয়ে উত্তম জায়গা হল মদীনা শরীফ। কারণ মদীনা শরীফের জমিনে শায়িত আছেন মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মদীনার জমিন অনেক দামী। এমনকি আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস হল মাটির যে অংশটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকের সাথে লেগে আছে এ অংশটার মূল্য আল্লাহপাকের কাছে আরশে আজীমের চেয়েও বেশি। এক নবীপ্রেমিক রওজায়ে আতহারের সামনে দাঁড়িয়ে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ছন্দ পাঠ করেছিলেন–

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهُ ... فَطابَ مِن طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ ... فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ
اَنْتَ النَّبِيُّ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهُ ... عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ

ওগো মহান! যার সমাধী সমান মরুভূমি
যাঁর সুবাসে ধন্য হল টিলা ধূসর ভূমি।
রওজাপাকের তরে জান করিলাম কুরবান
নিরাপত্তা, দয়া, দান যেথায় বিরাজমান।
আপনি এমন বন্ধু যাঁহার সুপারিশ কবুল
পুলসিরাতে যখন সবাই থাকিবে ব্যাকুল।

মসজিদের বরকতময় আমলী পরিবেশ

আল্লাহ পাকের অনেক বড় এহসান ও দয়া এই যে, তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী স্থানে এনে বসিয়েছেন। এখানে আল্লাহ পাকের ইবাদত ছাড়া অন্য কিছু করার অবকাশ নেই। যত বড় ধুমপায়ী হোক না কেন, মসজিদে এসে আর ধুমপান করে না। কোনো মদখোর মসজিদে এলে মদ খায় না। গাড়িতে লেখা আছে 'ধুমপান নিষেধ' তারপরও মানুষ ধুমপান করে। ড্রাইভার, কন্ট্রাকটাররাও বিড়ি-সিগারেট খায়। অথচ লেখা আছে 'ধুমপান নিষেধ'। বিমানে ধুমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ। সেখানেও মানুষ ধুমপান করে।

মসজিদে কেউ সিগারেট খায় না। যত বড় ধুমপায়ীই হোক না কেন সেও মসজিদে ধুমপান করে না। কারণ মসজিদটা হল ভালো হওয়ার একটা পরিবেশ। মসজিদ সুগন্ধিময় বস্তুকে আহ্বান করে। মসজিদের পরিবেশই মানুষকে বাধা দেয় যে, আমার ভেতর তুমি এ কাজ কর না। এ জন্য কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ মুখ

থেকে কাঁচা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ আসবে। এতে ফেরেশতারা কষ্ট পাবে, পাশের মুসল্লি কষ্ট পাবে। এবার বলুন তো, যে বিড়ি খায় তার মুখে কি ভালো সুবাস থাকে, না দুর্গন্ধ থাকে? এজন্য মসজিদে এসে মানুষ এগুলো খায় না।

মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাকের আজমত ও ভয় রয়েছে বিধায়ই তাদের অন্তরে মসজিদের সম্মানবোধ রয়েছে। এখানে মূল সম্মান ঘরের নয়, বরং ঘরওয়ালার। মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, সেহেতু এ ঘরের এত মর্যাদা। আল্লাহপাক হলেন মর্যাদাবান সত্তা। তাই যেসব জিনিসের সাথে তাঁর নিসবত রয়েছে সেগুলোও মর্যাদাবান হয়েছে।

মসজিদের প্রয়োজনীয়তা

মসজিদ আমাদের দরকার কেন? আমরা আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাদের রব। বান্দা হিসেবে আল্লাহকে আমাদের অবশ্যই তালাশ করতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। যদি আমরা আল্লাহকে তালাশ না করি, তাহলে আমরা আল্লাহর কেমন বান্দা হলাম। ছেলে যদি মা-বাবার সাথে কোনো যোগাযোগ না রাখে, তাহলে কি তাকে সুসন্তান বলা হবে? অনুরূপভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যদি কেউ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক না রাখে সেও ভালো বান্দা নয়। বরং সে কুসন্তানের চেয়েও জঘন্য।

আর আল্লাহ পাকের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তিনি দুনিয়াতে খানায়ে কা'বা বানিয়ে দিয়েছেন। আর ওখানে তো সকলে যেতে পারবে না। তাই ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ করেছেন অবশিষ্ট পাথরগুলো নিক্ষেপ করো। তিনি নিক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ পাক কুদরতীভাবে তা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেন সব জায়গায় একটা একটা মসজিদ হয়। আপনাদের এ মহল্লায়ও একটা পাথরখণ্ড পড়েছিল তাই তো মসজিদ হয়েছে। মসজিদ কেন? শুধু এজন্য যে, আল্লাহর বান্দারা তো সব জায়গায়ই থাকবে। আল্লাহর সাথে তো তাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আল্লাহকে পেতে হবে। এজন্য আল্লাহ পাক বিভিন্ন স্থানে তাঁর সাথে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন।

মসজিদ নির্মাণকারী ভাগ্যবান

আপনারা মনে করবেন না যে, আপনারা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এটা মনে করার সুযোগ নেই। আপনারা না করলেও যেখানে মসজিদ হওয়ার সেখানে মসজিদ হয়েই যাবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণে শরীক হয় সে ভাগ্যবান। কেউ যদি মনে করে যে, আমি না করলে মসজিদ হত না, সে অনেক বোকা। মসজিদ সম্পর্কে তার ধারণা নেই। মাওলা সম্পর্কেও তার ধারণা নেই। সে যে মাওলার গোলাম, সেটাও সে বোঝে না। না বুঝলেই এরকম হয়।

কেউ যদি খুব গর্ব করে বলে যে, আমি বাদশার খেদমত করি, বাদশা আমার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেন– এটা তার বোকামী হবে।

আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ডা. হারুন নামে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। কেউ কোনো বিষয়ে বড় ও পারদর্শী হলেও তাকে সৌদির নাগরিকত্ব দেয়া হয়। যেমন অনেক বড় মাপের ডাক্তার। তার দ্বারা দেশের উপকার হবে। তাই তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়। আবার বড় মাপের আলেম বা বুযুর্গ হলেও নাগরিকত্ব দিয়ে সেখানে নিয়ে যান। তো ডা. হারুন সাহেব বিজ্ঞ ডাক্তার হওয়ার কারণে তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি মসজিদে নববীর ইমাম শাইখ হুযাইফী সাহেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। শাইখ হুযাইফী সাহেব হলেন, বাদশা ফাহাদের শ্বশুর। দীর্ঘ দিন যাবত তিনি মসজিদে নববীর ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আচ্ছা বলুন তো ডা. হারুন সাহেব যে সেখানকার নাগরিকত্ব পেয়ে শাইখ হুযাইফীর চিকিৎসক হলেন– এটা কি তার নিজস্ব কৃতিত্ব, না কি সৌদি সরকারের বিশেষ দয়া? একমাত্র তাদের দয়া। কারণ তাদের তো আর ডাক্তারের অভাব নেই। এর মধ্যে তাকে পছন্দ করেছেন– এটাই তাদের দয়া। মদীনা শরীফের ইমাম সাহেব তাকে তার চিকিৎসার জন্য পছন্দ করেছেন–এটা তার খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।

হযরত শেখ সা'দী (রহ.) বলেন–

منت منه كه خدمت سلطان همي كنى
منت شناس ازو كه بخدمت بدا شتت

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে তুমি গর্ববোধ করো না যে, তুমি বাদশার খেদমত কর; বরং বাদশা তোমাকে তার খেদমতে নিযুক্ত করেছেন– এটা তার অনুগ্রহ মনে কর।

যারা বলে– 'আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি, মাদরাসা নির্মাণ করেছি, আমরা না করলে কি আর হতো' – এসব হল সম্পূর্ণ পাগলের প্রলাপ, ভ্রান্ত কথা; বরং আল্লাহ পাক যে আমাদের মাধ্যমে করিয়েছেন এতে আমাদের ভাগ্য খুলেছে।

আমাদের কিছু পয়সা এ কাজে ব্যয় হয়েছে তো মনে করতে হবে আমাদের পয়সাগুলো কবুল হয়েছে। আল্লাহপাক আমাদের কিছু মেহনত, একটু মেধা, একটু সম্পদ এ কাজে কবুল করেছেন, এটাই বড় কথা। এটা আল্লাহর মেহেরবানী, আমাদের কৃতিত্ব নয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের ঘটনা

দারুল উলূম দেওবন্দ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলমানগণ এতে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করেছেন। যার যার সামর্থ্য ও তৌফিক অনুসারে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। মিরাঠের এক ধনী লোক ছিলেন। এদেরকে শেঠ বলা হত। তিনি দারুল উলূমের কথা শুনেছেন এবং সেখানে কিছু দান করারও ইচ্ছা করেছেন। তার মনের ভাবটা এমন ছিল যে, আমি এমন অধিক পরিমাণে অর্থ নিয়ে যাব, যে পরিমাণ অর্থ হয়ত কেউ একাকী দান করেনি, তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে ভিন্ন ধরণের সম্মান ও তোয়াজ করবেন।

অনেকগুলো টাকা নিয়ে তিনি দারুল উলূমে গেলেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর সাথে কথাবার্তা বলছেন। এমনভাবে কথাবার্তা বলছেন যেন তিনি মাদরাসায় বিরাট কিছু করতে যাচ্ছেন, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। ভিতরে এমন অহমিকা নিয়ে কথা বলছেন আর টাকাগুলো পেশ করছেন। হযরত নানুতবী (রা.) লোকটির অহমিকাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন যে, তার ভিতর কিছু ভাবসাব আছে। আল্লাহওয়ালাগণ এসব ভাবসাব খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন। কে কী উদ্দেশ্যে আসে দুয়েকটি কথা শুনেই তাঁরা বুঝে ফেলেন।

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش

من انداز قدت را می شناسم

যে রঙেরই পোশাক তুমি করো পরিধান
বুঝতে পারি আমি তব দেহের পেহচান

কে কী ভাবসাব নিয়ে আসে সব তাঁরা বোঝেন। তাদের দিলের মধ্যে আল্লাহপাক এমন বসীরত বা আলো দান করেন যার দ্বারা সব ধরা পড়ে যায়।

একবারের ঘটনা। আপনারা জেনে থাকবেন যে, দেওবন্দের এসব বড় বড় আলেমদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছে। নানাভাবে অসম্মান ও হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে। বিদ'আতীরা দেওবন্দী আলেমদেরকে কাফের পর্যন্ত বলত।

একবার হযরত নানুতবীকে মানুষের সামনে লজ্জা দেয়ার একটি দুরভিসন্ধি করেছিল। কিভাবে করবে? একটা জীবিত লোককে লাশের মত কাফনের কাপড় পরিয়ে খাটে করে দেওবন্দ মাদরাসায় নিয়ে এসেছে জানাযা পড়ানোর জন্য। আর লোকও নির্বাচন করেছিল এমন যে ইচ্ছা না করলে হাসে না, একদম মরার মত পড়ে থাকতে পারে। তারা এ নিয়তে নিয়ে গেছে যে, হযরত কাসেম নানুতবীকে দিয়ে এর জানাযা পড়ানো হবে, জানাযার পর লোকটি নাড়াচাড়া দিয়ে কাফন থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তাহলে সবাই বলবে, দেখ দেখ একটি জীবিত মানুষকে কাসেম নানুতবী জানাযা দিচ্ছে। তো এমন একটি প্লান করে তারা এসে বলল, হযরত! জানাযা পড়িয়ে দিন। হযরত বললেন, আচ্ছা পড়িয়ে দিব।

সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। জানাযা পড়ানোর পূর্বে হযরত নানুতবী জিজ্ঞেস করলেন, জানাযা পড়িয়ে দিব? এমন প্রশ্ন তিনি অন্য সময় কখনো করেননি। কেবল আজ এ প্রশ্ন করে বসলেন। তারা বলল, হ্যাঁ, পড়িয়ে দিন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানাযা পড়িয়ে দিব? তারা বলল, হ্যাঁ পড়িয়ে দিন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানাযা পড়িয়ে দিব? তারা বলল, হ্যাঁ পড়িয়ে দিন। তিনি নামায পড়ালেন, নামায শেষ হওয়ার পর জীবিত লোকটি প্রকৃত জানাযায় পরিণত হয়ে গেল। অর্থাৎ মারা গেল।

তো এ কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর কাছে এসে ধনী লোকটি বলতে শুরু করেছে যে, হযরত! আরও আগে আসার উচিত ছিল। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি অনেকগুলো টাকা নিয়ে এসেছি।

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) সাফ জানিয়ে দিলেন- দারুল উলূমে টাকার প্রয়োজন নেই।

এ জবাব শুনে বেচারা ভেবাচেকা খেয়ে গেলেন। বললেন, এখন হয়ত প্রয়োজন নেই, ভবিষ্যতে তো প্রয়োজন হতে পারে।

হযরত বললেন, যখন প্রয়োজন হবে তখন দেখা যাবে।

তারপর লোকটি বললেন, তাহলে টাকাগুলো ছাত্রদেরকে দিয়ে দিবেন।

হযরত বললেন, ছাত্রদের মাঝে বণ্টন করার মতো সময় আমার নেই, আপনি পারলে দিয়ে যান।

মোটকথা, তার টাকা বিলকুল গ্রহণ করলেন না।

দাতাদের ইখলাস নষ্ট করবেন না

হযরত নানুতবী (রহ.) লোকটি টাকা কেন গ্রহণ করেননি? এ বিষয়টি বুঝতে হবে। আলেম-উলামাকে আল্লাহপাক বানিয়েছেন মানুষের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য। মানুষ তাঁদের সোহবতে এসে সংশোধন হবে। এখন যদি কেউ মাদরাসায় এসে টাকা দান করেন কিংবা কোনো আলেম সাহেব কারো কাছ থেকে চেয়ে আনেন তারও সংশোধন হওয়া উচিত। দান করার পর যদি লোকটির আত্মা সংশোধন না হয়ে আরও খারাপ হয় তাহলে লাভ কী হল। লোকটি এসেছিলেন অহংকার নিয়ে। আসার পর যদি আমাদের অপরিমিত আচরণে তার অহংকার আরো বৃদ্ধি পায়, তাহলে সমস্যা বাড়ল, না কমল? বাড়ল। অথচ আলেম-উলামার জামাত তো তৈরি হয়েছেন মানুষের অহংকার দূর করার জন্য। এ টাকা গ্রহণ না করার মাঝে তার সংশোধন নিহীত রয়েছে। আজ তার টাকা গ্রহণ না করা হলে তিনি জীবনের তরে সংশোধিত হয়ে যাবেন। টাকা-পয়সা মাদরাসায় দান করে জীবনে আর কখনো মনের ভিতরে অহংকার রাখবে না। আর যদি এভাবেই গ্রহণ করা হল তো অহংকারীর অহংকার তো রয়েই গেল। মাদরাসা কি মানুষের অহংকার বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, না কি কমানোর জন্য? কমানোর জন্য। তাই হযরত নানুতবী (রহ.) লোকটির টাকা গ্রহণ করলেন না। তারপর লোকটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। যাওয়ার সময় টাকাগুলো হযরতের জুতার উপর রেখে চলে গেলেন।

আসলেই ভাই আমরা দান-দক্ষিণা করে মসজিদ-মাদরাসার প্রতি দয়া করলাম বিষয়টি এমন নয়। বরং আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি দয়া করেছেন যে, আমাদের উপার্জনের কিছু অংশ, চেষ্টা-মেহনত ও মেধা-বুদ্ধির কিছু অংশ এখানে বিনিয়োগ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের টাকা-পয়সা অবৈধ পথে ব্যয় হয়নি- এটা আল্লাহ প্যাকের অনেক বড় এহসান ও দয়া। আমাদের টাকা মন্দিরে লাগাননি, গানের আসরে লাগাননি, খেলাধুলায় লাগাননি। আমাদের টাকা কোথায় লাগিয়েছেন? দুনিয়াতে আল্লাহপাকের সবচাইতে প্রিয় জায়গায় লাগিয়েছেন।

কেন এ মসজিদ

কেন এ মসজিদ? আল্লাহকে তালাশ করার জন্য এ মসজিদ, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এ মসজিদ।

گه معتکف دیرم وگه ساکنِ کعبه
یعنی که ترا می طلبم خانه بخانه

এখানে সেখানে, আল্লাহকে তালাশ করি। কখনো মসজিদে এসে এতেকাফ করি, নামাযে আসি, আগে পরে কিছু সময় বসে থাকি– উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে তালাশ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করা, আল্লাহকে পেয়ে যাওয়া।

মসজিদ দেখে খুশি হওয়া চাই

এ মসজিদটির অবকাঠামো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একেবারে নতুন হয়েছে। দেখে খুব ভালো লাগছে এবং মনের ভেতর আলাদা প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে। মাশাআল্লাহ খুব প্রশস্ত মসজিদ। মসজিদ দেখে খুশি হলে আল্লাহ পাক সওয়াব দিবেন, তাই মসজিদ দেখে খুশি হওয়া চাই।

আমার শায়খ (রহ.) একবার বাজারে যাচ্ছিলেন। সাথে আমি ছিলাম। হযরত তো সাধারণত বাজারে যান না। যাচ্ছিলেন মূলত আমার একটি কাজে। আমি হযরতের মতো একটি জামা বানানোর ইচ্ছা করেছি। হযরত একথা শোনার পর বললেন, আমি যে দর্জির কাছে জামা বানাই তোমাকে সে দর্জির কাছে নিয়ে যাব। হযরত দর্জিকে বললেন, উনি ঢাকা থেকে এসেছেন। আগামী দিন থাকবেন। তারপরের দিন চলে যাবেন। তুমি উনার জামাটা আগামী কাল বানিয়ে দিবে। পারবে তো?

হযরত বলার পর আর কোন কথা আছে! তখন দর্জিদের মজুরী কম ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, এর মজুরী কত আসবে? বললেন? এত। হযরত বললেন, আমি তোমাকে অতিরিক্ত দশ টাকা দিব এ জন্য যে, তুমি এটা ভালো করে সেলাই করবে আর টাইম মত দিয়ে দিবে।

সেখান থেকে ফেরার পথে রাস্তায় একটি মাজার ছিল। হযরতের নজর সেদিকে পড়ার সাথে সাথে তিনি পড়তে লাগলেন আস্তাগফিরুল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! আমাকেও বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়। কারণ যেগুলো গুনাহের উপকরণ, যেখানে গুনাহ হয় ঐসব বস্তু নজরে পড়লে এস্তেগফার পড়বে। কারণ দিলের মধ্যে এর একটা অন্ধকার আসে। এস্তেগফারের দ্বারা আল্লাহ পাক সে অন্ধকারটি দূর করে দেন।

মসজিদ আল্লাহর ঘর। সওয়াবের সামান বা উপকরণ। মসজিদ দেখে খুশি হলে দিলের মধ্যে নূর পয়দা হবে। মাজার-মন্দির দেখে যদি অন্ধকার পয়দা হয় তাহলে মসজিদ দেখলে নূর পয়দা হবে না? অবশ্যই হবে।

মসজিদকে মহব্বত করতে হবে

আমাদের যেসব বিষয় খুব মহব্বত করতে হয় তন্মধ্যে মসজিদও একটি। মসজিদকে মহব্বত করতে হয় এবং এর প্রতি দিলকে লাগিয়ে রাখতে হয়।

শিশুর মন সব সময় মায়ের প্রতি লেগে থাকে। কেউ কোলে তুলে কোথাও নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ পর সে তার মাকে খোঁজ করে। মুখে বলতে না পারলেও শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা বুঝিয়ে দেয় যে, সে তার মাকে তালাশ করছে।

দোস্ত আহবাব! যেখানেই যান, ঘরে যান, ব্যবসায় যান, চাকরীতে যান, মনটা যেন মসজিদের সাথে লেগে থাকে। মসজিদের সাথে মন কখন লেগে থাকবে? যখন মসজিদওয়ালা তথা আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত গভীর হবে। এ ঘরের নিসবত আল্লাহর সাথে। আল্লাহর সাথে মহব্বত গভীর হলে মসজিদের সাথেও মহব্বত গভীর হবে। মসজিদের প্রতিও মায়া-মমতা বেড়ে যাবে। তাই তো আল্লাহ পাকের ঘর মসজিদ থেকে কেউ একটু ময়লা সরিয়ে দিলে অনেক ফযিলত রয়েছে। সাথে

সাথে আল্লাহ পাক তাকে রুহানী তারাক্কী নসীব করেন। তার দিলের মধ্যে রুহানিয়্যত পয়দা করে দেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার ঘটনা

হযরত ওমর (রা.) যখন মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন তখন শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার জন্য সপ্তাহে একটি দিন ধার্য করেছিলেন। আচ্ছা বলুন তো, হযরত ওমর (রা.) মসজিদ ঝাড়ু না দিলে কি মসজিদ অপরিষ্কার থাকত? মসজিদে নববী ঝাড়ু দেয়ার মতো লোকের অভাব ছিল? সাহাবায়ে কেরাম তো সওয়াবের কাজগুলো করার জন্য পাগলপারা ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) এত ব্যস্ততার মাঝেও মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করেছেন। আর ব্যস্ততাটাও কেমন? ইসলামী খেলাফত পরিচালনার ব্যস্ততা। এসবের ভিতর দিয়ে একটি দিন মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার জন্য ধার্য করেছিলেন। সে দিন তিনি কোমরে কাপড় বেঁধে হাতে ঝাড়ু নিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করতেন। আচ্ছা বলুন তো, মসজিদের ঝাড়ুর প্রয়োজন ছিল, না কি ওমরের প্রয়োজন ছিল ঝাড়ুর? ওমরের দরকার ছিল। তাই আমরাও মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার চেষ্টা করব। আর সব সময় খেয়াল রাখব আমার দ্বারা যেন মসজিদ ময়লা না হয়। যে মসজিদ থেকে ময়লা পরিষ্কার করলে এত এত ফায়দা সে মসজিদ আমার দ্বারা ময়লা হবে– এটা কেমন কথা! আমারই তো কাজ হল মসজিদ পরিষ্কার রাখা। সেখানে আমি কিভাবে মসজিদ অপরিষ্কার করি। এ জন্য খুব সতর্ক থাকা চাই।

জান্নাত খরিদ করতে হলে মসজিদে আসুন

মসজিদ সম্পর্কে একটি হাদীস তেলাওয়াত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّ الْمَساجِدَ سُوْقٌ مِّنْ اَسْوَاقِ الْاٰخِرَةِ

মসজিদ জান্নাতের বাজার। এর অর্থ হল, জান্নাত যদি খরিদ করতে হয়, জান্নাত যদি পেতে হয়, তাহলে মসজিদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। মসজিদ বানাতে হবে, মসজিদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখতে হবে। মসজিদে আসতে হবে, বসতে হবে।

ইমাম-মুয়াজ্জিনকে মহব্বত করতে হবে

ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ মসজিদের খাদেম। যদিও তারা বেতন গ্রহণ করে থাকেন। অন্যান্য কর্মচারীর সাথে তাদের পার্থক্য রয়েছে। কারণ, এরা তো আমাদের চাকর নয়; বরং এরা মসজিদের সেবক। যেহেতু মসজিদের সেবকগণ আল্লাহর কাছে প্রিয়, তাই আমরাও তাকে মহব্বত করব। আমি তো পারছি না মসজিদের সেবা করতে, তারা সেবা করে যাচ্ছে। মুয়াজ্জিন সাহেব ঠিক মত আযান দেন, ইমাম সাহেব নামায পড়ান। মসজিদের খেদমত করেন।

তো জান্নাত খরিদ করতে হলে মসজিদে আসতেই হবে। বিয়ে–শাদীর সদাই খরিদ করতে হলে যে বাজারে তা পাওয়া যাবে সেখানে যেতে হয়। ধান-চালের বাজারে গেলে বিয়ের সদাই পাওয়া যাবে না। বেহেশতের সদাই ক্রয় করতে হলে মসজিদে আসতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এটাই বলেছেন।

আখেরাতের সুখই হল আসল সুখ

ملكِ دنيا تن پَر َستاں را حلال
ما غلامِ ملكِ مولی بے زوال

দেহপূজারীদেরই মানায় অর্থ-সম্পদ ভোগ-বিলাস
সত্যবাদী বিশ্বাসী মোরা খোদাকে পেয়েই মন-মাতাল

দুনিয়াতে দুই রকম মানুষ আছে। কারো সামনে আখেরাত আছে, কারো সামনে আখেরাত নেই। যাদের সামনে আখেরাত নেই, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আমোদ-ফূর্তি সবকিছু তাদের জন্য শোভনীয়। তাদের মজার শুরুও দুনিয়া, শেষও দুনিয়া। আর আমরা যারা ঈমানদার তাদের সামনে আখেরাত বড়, দুনিয়া ছোট। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার সুখ মূলতঃ সুখ নয়, আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। দুনিয়ার দুঃখ প্রকৃত দুঃখ নয়, আখেরাতের দুঃখই দুঃখ। দুনিয়ার সুখ-দুঃখ হল স্যাম্পল স্বরূপ। আসল দুঃখ রয়েছে জাহান্নামে।

সব সময় একথাটি মনে রাখবেন যে, আমরা ঈমানদার। আমাদের কাছে দুনিয়া ছোট, আখেরাত বড়। আখেরাত অনন্তকালের জীবন। সে জীবনের শেষ নেই। দুনিয়ায় আমার হায়াত হয়ত একশ বছরের। না হয় সর্বোচ্চ একশ তেত্রিশ বছর। অসীমের কাছে ১৩৩ বছর কোনো সময়ই নয়। আর সর্ব দিক থেকেই দুনিয়া ছোট, আখেরাত বড়। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখেরাত স্থায়ী। দুনিয়ার সুখ প্রকৃত সুখ নয়; এটা স্যাম্পল

স্বরূপ। দুনিয়াতে যাকে সবচেয়ে সুখী মনে করবেন তার চোখ দিয়েও কখনো দুঃখ ও কান্নার অশ্রু ঝরে। দুনিয়াতে নিরন্তর সুখ নেই। সুখ-দুঃখ মিলিয়ে দুনিয়া। এখানে কেউই সম্পূর্ণ সুখী নেই, কেউই নেই সম্পূর্ণ দুঃখী। একজন অসুস্থ ব্যক্তিও মাঝে মধ্যে হাসে। এত দুঃখেও তার কিছু সুখ আছে। অন্যথায় সে হাসার কথা ছিল না। দুনিয়া সুখ-দুঃখের সমন্বিত জগত। এখানকার সুখ এবং দুঃখ উভয়টি ক্ষণস্থায়ী। কেউ পূর্ণ সুখী নয়; কেউ পূর্ণ দুঃখীও নয়। আর প্রকৃত সুখ তো আল্লাহ পাক জান্নাতে রেখেছেন। কত সুখ রয়েছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন–

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ[28]

অর্থ : আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমনসব নাজ-নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কেউ কোনো দিন চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এমনকি অন্তর দিয়ে কল্পনাও করেনি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.[29]

আল্লাহ পাক বলেন, তোমাদের যেটা মন চাইবে সেটাই পাবে। তাও আবার কিভাবে? অপূর্ব সম্মানের সাথে।

সব পাওয়া এক রকম নয়। কিছু পাওয়া সম্মানের আর কিছু পাওয়া অসম্মানের। কোথাও যদি বিবাহের অনুষ্ঠান হয় এবং নিমন্ত্রণের খাবার রান্না করা হয়, সেখানে আহারকারীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকে। কেউ ইজ্জতের খাবার গ্রহণ করে, কেউ বেইজ্জতের খাবার খায়। একজন এসে বলল, আমাকে একটু খাবার দেন। তখন একজন তাকে বসিয়ে খাইয়ে দিল। এটা ইজ্জতের খাবার হল, না-কি যিল্লতির? যিল্লতির। যার ইজ্জত-সম্মানবোধ রয়েছে সে কি এভাবে খেতে পারবে? কস্মিনকালেও পারবে না। কিন্তু যাদের ইজ্জত-সম্মানবোধ নেই তারা দিব্যি খেয়ে ফেলে। আবার কেউ আছে কাছে অনুষ্ঠানের ধারে ঘোরাঘুরি করে। তার ইচ্ছা হল

২৮. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪৩২৮
২৯. সূরা হা-মীম সেজদাহ : ৩১

আয়োজকরা দেখে যদি খেতে বলে তো খাবে। এটাও কিন্তু ভালো নয়। খাওয়ার প্রকাশ করেনি কিন্তু ভিতরে তো রয়েছে। এটাও অসম্মানের খাবার। আবার কেউ দাওয়াতী মেহমানের ভাব নিয়ে সরাসরি টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে। অথচ সে দাওয়াতী মেহমান নয়। ছেলের পক্ষের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনি কে? সে বলে, আমি মেয়েপক্ষ। মেয়ের পক্ষের কেউ জিজ্ঞেস করেলে বলে, আমি ছেলেপক্ষ। এবার উভয় পক্ষ একত্রিত হয়েছে। ছেলের পক্ষ বলে এ লোক আপনাদের কী হয়? মেয়ের পক্ষ বলে কিছুই হয় না। মেয়ের পক্ষ বলে ও আমাদের কিছুই হয় না। এবার সে বলে উঠে- আমি ছেলের পক্ষও নই মেয়ের পক্ষও নই, আমি হলাম নিরপেক্ষ।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ

এখান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটাও বুঝে নিন। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো ধর্মহীনতা। নিরপেক্ষ কে? যে ছেলের পক্ষও নয়, মেয়ের পক্ষও নয়, সেই তো নিরপেক্ষ। এমনিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্ম পালন করলে করুক, না করলে না করুক। যেই ধর্ম মন চায় সেই ধর্ম পালন করবে অথবা কোনোটাই করবে না।

প্রথমতঃ যেই ধর্ম ইচ্ছা সেই ধর্ম পালন করবে। দ্বিতীয়তঃ কোনো ধর্ম পাল করলে করলে করল, না করলে না করল। বলুন তো, এতে থাকলটা কী? এ হল ধর্ম নিরপেক্ষতার হাকীকত ও স্বরূপ।

বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের ভেতর বড় ধরনের বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে। নাস্তিকতার বিষ রয়েছে। আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা অনেকে এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগতও রয়েছেন। আসলে এসব শব্দ তো বাইর থেকে এসেছে। বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে। আসলে স্বাধীনতার আড়ালে তারা ধর্মহীনতার পথ প্রশস্ত করতে চায়।

মনে করুন, একজন ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে মুরতাদ হয়ে গেল। এর দ্বারা সে ইসলামকে কলঙ্কিত করল। ইসলামের বিধান হল, যারা ভিন্ন ধর্মে আছে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের ভিত্তিতে তাদের ধর্মে থাকতে পারবে। তাদেরকে জবরদস্তি মুসলমান বানানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজন মুসলমানের অন্য ধর্ম অবলম্বন করার সুযোগ নেই। কেন সে ইসলাম বর্জন করবে? সে তো এর দ্বারা ইসলামকে অপমানিত করল।

ইসলামে কি এমন কিছু আছে, যা বর্জন করে যেতে হবে? অসম্ভব কথা। অন্য ধর্মে থাকতে পারে, ইসলামে এমন কিছু নেই। যেতে হলে জবাব দিয়ে যেতে হবে।

মুরতাদ হওয়া সাংঘাতিক বিষয়। হয় খাঁটি তওবা করবে অন্যথায় তার ব্যাপারে ঘোষণা হল–

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَه فَاقْتُلُوْه .[30]

যে মুরতাদ হবে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এটা ইসলামের আইন।

দোস্ত! এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো শুনতে ভালোই লাগে কিন্তু তার ভিতরে বড় ধরনের সমস্যা নিহিত থাকে। আর এ সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে অপরাধীরা সরে যায়। আল্লাহপাক সবাইকে বুঝ দান করুন।

দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত মসজিদকেন্দ্রিক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা আখেরাতের খরিদদার তারা তো আখেরাতের সম্বল খরিদ করতে চায়। আর আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করবে কোন জায়গায়? সংগ্রহের জায়গা হল মসজিদ। মসজিদে আসবে তো জান্নাতের সপ্তয় শুরু হয়ে যাবে। কেননা হাদীসে এসেছে–

اِنَّ الْمَسَاجِدَ سُوْقٌ مِّنْ اَسْوَاقِ الْاٰخِرَةِ

মসজিদ হল আখেরাতের বাজার

এ কারণেই দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতটা মসজিদকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এটা মানুষকে মসজিদমুখী করার মেহনত। তাদের সার্বক্ষণিক মেহনত থাকে মানুষ মসজিদমুখী হোক। আর মসজিদমুখী হওয়া মানে আল্লাহমুখী হওয়া, জান্নাতমুখী হওয়া।

আমাদের হক্কানী উলামা-মাশায়েখও অধিকাংশ প্রোগ্রাম মসজদিসমূহে করে থাকেন। যাতে মানুষ মসজিদমুখী হয়।

মসজিদে প্রবেশকারী আল্লাহর মেহমান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ دَخَلَهَا كَانَ ضَيْفًا لله

৩০. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৫৩৫

যে মসজিদে প্রবেশ করল সে আল্লাহ পাকের মেহমান হয়ে গেল।

আমাদের এ এলাকার কেউ যদি দাওয়াত পায় যে, প্রধানমন্ত্রী একটি সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তাকে আহ্বান করেছেন এবং সেখানে একটা উন্নতমানের খাবার প্রদান করা হবে, তাহলে বলুন তো, তার মানসিক অবস্থাটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে? আর সেখানে গিয়ে সাক্ষাত লাভ ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর ফিরে আসার পর তার ভাবসাবটা কেমন হবে? কমপক্ষে খাবারটা যতক্ষণ পেটে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তো অন্য রকম অবস্থা থাকবে। কেন এমন হবে? এ কারণে যে, সে প্রধানমন্ত্রীর মেহমান হয়েছে। এমনিভাবে মসজিদে যে প্রবেশ করে সে আল্লাহ পাকের মেহমান হয়ে যায়। এ কথা কে বলেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ دَخَلَهَا كَانَ ضَيْفًا لله

যে মসজিদে প্রবেশ করল সে আল্লাহ পাকের মেহমান হয়ে গেল।

আমরা সবাই এখন আল্লাহ পাকের মেহমান। কোনো সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যুও এসে যায়, এটাও বিশাল সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ পাক ঐ সময়ে আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে রেখেছেন। এটা সাধারণ বিষয় নয়।

আল্লাহপাকের মেহমানদারী

মসজিদে প্রবেশ করার পর আমরা আল্লাহপাকের মেহমান হয়ে গেছি। আল্লাহপাক আমাদের মেজবান। এবার মেজবানী কী দিয়ে হবে? এমন কী জিনিস দিয়ে মেজবানী হবে? বগুড়ার দই, টাঙ্গাইলের চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, মতলবের ঘি ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী বিশেষ খাবার দিয়ে? এগুলো তো দেশের যে কোনো দাওয়াতে খেয়ে থাকেন। আল্লাহ পাকও যদি এগুলো দিয়েই মেহমানদারী করেন, তাহলে তাঁর বিশেষত্ব কী রইল?

মনে করেন, প্রধানমন্ত্রীর নিমন্ত্রণে গেলেন। সেখানে যা খাওয়ানো হবে তা হয়ত খুব উন্নতমানের খাবার হবে কিন্তু প্রত্যেকটি খাবারই তো আপনার নাগালের ভিতর। আপনার নিজ বাড়িতেও ইচ্ছা করলে তৈরি

করতে পারেন। ফলি মাছের ভর্তা, উন্নতমানের কাবাব, চিংড়ি ভুনা, ইলিশ ভাজা–এই তো খাওয়াবেন। এর বাইরে আর কী খাওয়াবেন। কল্পনায় আসে এমন খাবারই পরিবেশন করা হবে। কল্পনাতীত কিছু নয়। আল্লাহপাকও যদি এসব দিয়েই মেহমানদারী করেন, তাহলে আল্লাহ পাকের শান থাকল কী? আল্লাহ পাক এমন এক জিনিস দিয়ে মেহমানদারী করাবেন যা কারো হাতে নেই। এমনকি কোনো নবীর হাতেও নেই। সে জিনিসটার নাম হল মাগফেরাত। মাগফেরাত অর্থ গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। আহ! এর চেয়ে বড় আর কোনো দান হতে পারে না।

ক্ষমা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহপাকের রয়েছে

ছোট একটি ঘটনা বললে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝবেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) অনেক ন্যায়পরায়ণ বাদশা ছিলেন। এক রাতে তিনি ছদ্মবেশে বের হয়ে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। এটা ন্যায়পরায়ণ শাসকের বৈশিষ্ট্য। হযরত ওমরও (রা.) এর অভ্যাসও এমনই ছিল।

"আজকে ওমরপন্থী পথিকের দিকে দিকে প্রয়োজন।
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দিবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ
ঊষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা
দিক-দিগন্তে তাদেরে খুঁজিয়া ফিরেছে সর্বহারা।"

গোটা দুনিয়া এখন হযরত ওমরের মত একজন শাসক তালাশ করে। দুনিয়াতে ইনসাফগার যত বড় বড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রয়েছে তারাও বলে আজকের এ উত্তপ্ত পৃথিবীর জন্য ওমরের মতো একজন রাষ্ট্রনায়কের বড় প্রয়োজন। ইতিহাস বলে, মুসলমান রাজা-বাদশাগণ এমনই ছিলেন।

তো সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) প্রজাদের হাল-অবস্থা জানার জন্য গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে বের হয়েছেন। দেশে ভালো কাজ হচ্ছে, না-কি মন্দ কাজ হচ্ছে–এসব দেখার জন্য।

এক জায়গায় গিয়ে দেখেন কয়েকজন লোক বসে শলাপরামর্শ করছে। তিনি বুঝতে পারেননি তারা ভালো কোনো পরামর্শ করে, নাকি মন্দ কোনো পরামর্শ করে। তারা জিজ্ঞেস করল, এত রাত্রে আপনি

এখানে কে? তিনি বললেন, আমি আপনাদেরই একজন। এটা কিন্তু তাঁর হেকমতী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব ছিল। অর্থাৎ আপনারা ভালো হলে আমিও ভালো, আর আপনারা খারাপ হলে আমিও খারাপ। তিনি বলেন, আমি আপনাদের মতোই একজন। মূলতঃ ওরা ছিল ডাকাত। তাই ওরা ভেবে নিয়েছে আগন্তুক একজন ডাকাত। যেহেতু সমপেশার লোক তাই বসার অনুমতি দিল। তাদের সংখ্যা ভারী হল। এবার তারা পরামর্শ করছে আজ কোন বাড়িতে হানা দেয়া হবে। একজন বলল, আমরা আগে জেনে নিই আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা কী রয়েছে। সে অনুপাতে হানা দিব। ঠিক আছে জানা যাক কার কী যোগ্যতা রয়েছে। যোগ্যতা তো সকলেরই রয়েছে। কিন্তু বিশেষ কী যোগ্যতা রয়েছে সেটি জানা যাক।

তাদের মধ্যে যে ছিল সরদার সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, বলো তোমার কী যোগ্যতা রয়েছে? সে বলল, আমার বিশেষ যোগ্যতা হল– আমি পশু-পাখির কথা বুঝতে পারি।

আরেকজনকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার কী যোগ্যতা রয়েছে? সে বলল, আমার যোগ্যতা হল, নাকে। আমি নাক দিয়ে কোনো জায়গার মাটি শুঁকে বলে দিতে পারি মাটির নীচে কী কী রয়েছে। আগের জমানায় টাকা-পয়সা সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক ছিল না। কাগজের নোটও ছিল না। তখন ছিল স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা। মানুষেরা এগুলো মাটির নীচে গর্ত করে পুঁতে সংরক্ষণ করত। অনেক সময় এসব গর্তের কথা মানুষ ভুলে যেত। অথবা কেউ জানত ঠিকই কিন্তু মারা গেলে আর কেউ সেটির খোঁজ পেত না। এজন্য তখন অনেক জমিতে হালচাষ করার সময় মুদ্রার কলস পাওয়া যেত এবং এগুলোর জন্য শরীয়তের ভিন্ন বিধি-বিধানও রয়েছে। কোনো জমিতে কোনো জিনিস পাওয়া গেছে তার মালিক জানা নেই, এর হুকুম কী? এসব মাসআলা কিতাবে আছে, উলামায়ে কেরাম জানেন।

যাই হোক, দ্বিতীয় লোকটির যোগ্যতা হল মাটির নীচে কোথায় স্বর্ণ-রূপার মুদ্রা রাখা আছে তা বলতে পারা।

তৃতীয়জনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী যোগ্যতা রয়েছে? সে বলল, আমার তেমন যোগ্যতা নেই, তবে আমার হাতে এমন শক্তি রয়েছে যা দিয়ে লোহার দরজা পর্যন্ত খুলে ফেলতে পারি।

চতুর্থজনকে জিজ্ঞেস করা হল তোমার কী যোগ্যতা রয়েছে? সে বলল, আমি রাতের অন্ধকারেও যদি কাউকে দেখি তাহলে দিনের বেলায় তাকে চিনতে পারি। দিনের বেলা তাকে দেখলে ভালোভাবে চিনে বলতে পারি যে, এ লোকটিকে আমি রাত্রে দেখেছি।

চারজনের চার গুণ জানা গেল। এখন নতুন যিনি এসেছেন তার পালা। তাকে জিজ্ঞেস করা হল আপনার কী যোগ্যতা? তিনি বললেন, আমার তেমন যোগ্যতা নেই, তবে আমার মধ্যে একটি যোগ্যতা এই রয়েছে যে, কারো যদি ফাঁসির রায় হয়ে যায়, তাহলে আমি যদি আমার মাথাটাকে এভাবে ঘুরাই, তাহলে তার ফাঁসির আদেশ মওকুফ হয়ে যায়। আসামী বেকসুর খালাস হয়ে যায়।

মোটকথা, সবাই অনেক বড় বড় গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী। আজকের মত এত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ অতীতে পাওয়া যায়নি। তাই আজ এমন জায়গায় হানা দেয়া হবে যেখানে গেলে বেশি লাভ হবে। আজ সরকারী কোষাগারে হামলা করা হবে। সকলের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

ডাকাত দল রওনা হয়েছে। কোষাগার ভবনের গেইটে পৌঁছার পর কুকুর কী যেন বলতে শুরু করেছে। তখন যে ব্যক্তি পশু-পাখির কথা বোঝে সে বলে উঠল, কুকুর বলছে, তোমাদের সাথে রাজা রয়েছেন। আমাদের মধ্যে আবার রাজা কে?

তখন গোমর ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকায় রাজা বলে উঠলেন, হয় তোর মাথা ঠিক নেই, না হয় কুকুরের মাথা ঠিক নেই। আমরা হলাম ডাকাত দল। ডাকাতি করে খাই। রাজা হলে কি আর ডাকাতি করতে আসতাম!

সকলে সামনে অগ্রসর হল। কোষাগার গেইটে শক্ত লৌহকপাট। এটা ভাঙতে হবে। সমস্যা নেই। ভাঙার মত লোক তো সাথেই আছে। সে তার হাতের শক্তি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলল। সবাই ভিতরে প্রবেশ করল। এখন কোথায় কী রাখা আছে তা জানা দরকার। যিনি নাকে ঘ্রাণ শুঁকে বলে দিতে পারে কোথায় কী আছে, তিনি শুঁকে শুঁকে বলে দিলেন এখানে এটা আছে, ওখানে ওটা আছে। তার তথ্যমতে খুঁজে খুঁজে সব বের করা হল। সব কিছু বস্তায় ভরে সবাই ফিরে এলো।

সেই পূর্বের জায়গায় এসে ভাগ-বাটারা করলেন। সুলতান মাহমুদ গজনবীও এক ভাগ পেয়েছেন। যার যার ভাগ নিয়ে সবাই চলে গেছে।

পর দিন সকাল বেলা খবর হয়ে গেছে যে, সরকারী কোষাগারে ডাকাতি হয়েছে। সুলতান মাহমুদকেও জানানো হল। তিনি বললেন, আচ্ছা এর ব্যবস্থা নিচ্ছি। তখন তিনি ঐ চারজনকে ধরে আনার জন্য পুলিশ পাঠালেন। পুলিশ তাদেরকে ধরে রাজ দরবারে হাজির করল। বাদশা জিজ্ঞেস করার পর তারা স্বীকার করল। বাদশা বললেন, তোমাদের ফাঁসির হুকুম দেয়া হল। জল্লাদ এসে তাদেরকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ঐ ব্যক্তি যে রাতের বেলায় কাউকে দেখলে দিনের বেলায় চিনতে পারে সে বলে উঠল, জাহাঁপনা! আমরা চারজন চার রকমের যোগ্যতার অধিকারী। আমাদের যোগ্যতা আমাদেরকে আসামী বানিয়ে দিয়েছে। আপনার যোগ্যতাটি রয়ে গেছে। আপনি বলেছিলেন, আপনার এমন একটা গুণ আছে, আপনি মাথাটা একটু নাড়া দিলে ফাঁসির আসামী খালাস হয়ে যায়।

এতো হল দুনিয়ার আদালতের কথা। আল্লাহর আদালতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কাউকে ক্ষমা করতে পারে না। কোনো নবীকেও এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তবে নবীদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

بآں کو رحمة للعلمین است
بدرگاهت شفیع المذنبین است

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি গুনাহগার উম্মতকে সুপারিশ করবেন।

তিনি হাশরের ময়দানেও সুপারিশ করবেন, এখনও করবেন। কেউ যদি রওজার সামনে গিয়ে বলে হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমার গুনাহ মাফ করে দেন। এটা বলা ভালো। রাসূলের সুপারিশ রদ হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে গুনাহ ক্ষমা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট।

ঘটনার শিক্ষা

এবার এ ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষামূলক আলোচনা শুনুন। চারজন লোক আসামী হয়ে গেল। সকলকে ফাঁসির দণ্ড দেয়া হল। কিন্তু এদের মধ্য থেকে একজন লোক নিজেও বাঁচল, অন্যদেরকেও বাঁচাল। সে কে? যার চক্ষুর মাঝে যোগ্যতা রয়েছে। দোস্ত! এমন মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন যাদেরকে আল্লাহপাক ঐ রকম চোখ দিয়েছেন। আল্লাহপাক যাদেরকে মারেফতের চোখ দিয়েছেন। সবকিছুতেই তারা আল্লাহ দেখতে পায়।

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ.[31]

যে দিকেই তুমি তাকাবে সেখানেই আল্লাহকে দেখতে পাবে।

এর কী অর্থ? আল্লাহর কুদরত সব জায়গায় বিরাজমান। আমাদের সে চোখ নেই বিধায় আমরা দেখি না।

شجر میں حجر میں تیری رنگ وبو ھے
جدھردیکھتا ھوں ادھر تو ھی تو ھے
اِدھر تو ھي تو ھے اُدھر تو ھی تو ھے
جدھر دیکھتا ھوں اُدھر تو ھی تو ھے
تجلّی تیری ذات کی سو بسو ھے
جدھر دیکھتا ھوں اُدھر تو ھی تو ھے

আমাদের সে চোখ নেই বিধায় দেখি না। যাদের সে চোখ রয়েছে তারা সব কিছুতেই আল্লাহকে দেখে।

بُجز تیرے نہ آئے کچھ نظر میں
میرے مولی مجھے حسنِ نظر دے
جو دیکھے تیرے جلوہ دے وہ آنکھیں
جُھکے جو تیرے ھی در پر وہ سر دے

আল্লাহর আরেফগণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, হে আল্লাহ! আপনাকে ছাড়া যেন কিছু না দেখি। চোখের তারায় যা কিছু দেখি তার মধ্যে যেন আপনাকেই দেখি।

একবার আমার আব্বাজান (রহ.)-এর সামনে একটি আনার পেশ করা হল। আনারে যদি কোন দাগ না থাকে, এমন তরতাজা আনার খুব আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। আব্বাজান আনার দেখে এ বলে এক চিৎকার

---

৩১. সূরা বাকারাহ : ১১৫

দিয়েছেন যে, হে আল্লাহ! তোমার কুদরত দেখছি। অথচ আমরা দেখি না। দেখনেওয়ালারা ঠিকই দেখেন এবং বোঝেন।

তো বিপদের মুহূর্তে একজনের যোগ্যতা কাজে এসেছে। তিনি হলেন পরিচয়লাভকারী চোখের অধিকারী। সে বলেছে জাহাঁপনা! আমাদের যোগ্যতা কাজে লেগেছে। সবার যোগ্যতা আমাদেরকে ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ যোগ্যতা আমাদেরকে ফাঁসির আসামী বানিয়েছে। এবার শুধু আপনার যোগ্যতাটা বাকী রয়েছে।

দোস্ত আহবাব! আমরাও যদি দুনিয়ায় বসে আল্লাহপাকের পরিচয় হাসিল করতে পারি হাশরের ময়দানে বলা যাবে, মাওলা গো! আমাদের নাফরমানি তো আমাদেরকে অপরাধী বানিয়ে দিয়েছে। এখন আপনার মাগফিরাতের অপেক্ষায় আছি। এ জন্য আল্লাহকে চিনতে হবে। আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করি। যারা চিনে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, ওঠাবসা করি, তাদের মজলিসে আসা-যাওয়া করি।

হাদীস পড়েছিলাম যারা মসজিদে আসে তারা আল্লাহপাকের মেহমান হয়ে যান। আল্লাহপাক এমন জিনিস দিয়ে মেহমানদারী করেন যা কারো হাতে নেই। قِرَاهُ الْمَغْفِرَةُ তাদেরকে মাগফিরাত নসীব করেন।

অতিরিক্ত উপহার

সম্ভ্রান্ত মানুষের দাওয়াতে গেলে ভোজন শেষে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ কিছু একটা উপহার দিয়ে থাকেন। যেমন একটা করে মেসওয়াক কিংবা কলম দিল। প্রত্যেকে যার যার অবস্থা অনুযায়ী দিয়ে থাকেন। সৌদি আরবের বাদশা কাউকে রাজকীয় অতিথি হিসেব দাওয়াত করলে খানাপিনার পর তাকে খানায়ে কাবার পুরাতন গিলাফের একটি টুকরা উপহার হিসেবে প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর মেহমানদেরকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এমন একটি উপহার দেন যেটা কারো হাতে নেই। সেটা হল সমাজের মানুষের দিলের ভিতর তাদের সম্মান সৃষ্টি করে দেন। এ জন্য যারা বাস্তব নামাযী তাদেরকে সমাজের সব লোকই সম্মানের চোখে দেখে। এটা আসলে মসজিদের বরকত। যেহেতু তারা আল্লাহপাকের দরবারে এসেছেন, তাই আল্লাহপাক তাদেরকে সম্মানিত হিসেবে কবুল করেছেন।

মসজিদকেন্দ্রিক আমল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক যেসব দায়িত্ব ছিল তা সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ – (سورة البقرة : 129)

রাসূলের কাজ হল উম্মতকে কুরআন তিলাওয়াত শেখানো। কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আমলের নমুনা ও বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া। মানুষের তাজকিয়া তথা দিলের রোগের চিকিৎসা করা। আর এসব কাজের কেন্দ্র ছিল মসজিদে নববী।

নবীযুগে মসজিদে নববীর আয়তন

বর্তমান মসজিদে নববী তো বিশাল বড়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায়ও মসজিদে নববী একেবারে ছোট ছিল না। মূল মসজিদের পরিমাপ এখনও সেখানে রয়েছে। একবার আমরা সেটি পরিমাপ করেছিলাম। কেবলার দিক থেকে ১১৮ ফুট আর পিছনের দিকে হল ১৩৫ ফুট। অনেক বড়! প্রায় সোয়া বিঘা জায়গার উপর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও মসজিদে নববী এত বড় ছিল। এ থেকে আমাদের বোঝার বিষয় হল সে যামানায় মানুষ ছিল কতজন আর নামাযী ছিল কতজন।

আজকাল তো কেবল জুমার দিনে মুসল্লির ঢল নামে। মুসল্লিদের ভিড়ে মসজিদ উপচে পড়ে। অন্য ওয়াক্তে কোনো ভিড় থাকে না। আসলে এটা তো কাম্য নয়। রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগের চিত্র এমন ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদ ভরা মুসল্লি থাকত। জুমা-গায়রে জুমা সব ওয়াক্তে পর্যাপ্ত মানুষ থাকতেন।

অবশ্য কোনো কোনো পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমা হত না, বিধায় সেখানকার মুসল্লিরা আশেপাশের জামে মসজিদে জুমার নামায পড়ার জন্য যেতেন। একশ ভাগের একশ ভাগ মুসলমান নামাজী ছিলেন।

বর্তমানে আমরা আমাদের সমাজের মানুষ অনুপাতে যে মাপের মসজিদ বানাই সেই হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদটি আরো ছোট আকারে বানাতে পারতেন। কিন্তু বিশাল মসজিদ

নির্মাণ করলেন। এ থেকে বোঝা যায় সেই যমানায় মুসলমান মাত্রই নামাজী ছিল।

মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববীর নির্মাণ

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পূর্বে কুবা নগরীতে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ১৪ দিন ছিলেন। ওখানে থাকাবস্থায় তিনি বিশ্রাম ও আরামের চিন্তা করেননি। চিন্তা করেছেন ওখানকার মুসলমানরা কিভাবে আল্লাহর সাথে যুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে। তারা আল্লাহর সাথে কী দিয়ে যুক্ত হবে? এজন্য তিনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাথর কুড়িয়েছেন। নিজেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ১৪ দিন অবস্থান করার পর সেখান থেকে চলে এসেছেন।

মদীনার দিকে রওনা হয়েছেন। সেখানে তার মিশন বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে। কোন জায়গায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করবেন, কার ঘরে অবস্থান করবেন– এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। সকলেই তো নবীর জন্য জানপ্রাণ। সবাই তো চায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে অবস্থান গ্রহণ করুন। দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় ভাগ্যবান আর কে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন– هٰذِه مَأْمُوْرَة مِن رَّبِّى আমার উটকে চলতে দাও। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত। এটা যে ঘরের সামনে বসবে সেখানেই আমি অবতরণ করব।

চলতে চলতে উটটি বর্তমানে যেখানে বাবুস সালাম রয়েছে সেখানে গিয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ বসার পর আবার উঠে চলতে শুরু করে এবং হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘরের সামনে গিয়ে বসে পড়ে। বর্তমান মসজিদে নববীর দক্ষিণ দিকে। এখন সেখানে মার্কেট হয়েছে। এ ঘরটি আল্লাহপাক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পূর্ব থেকেই বানিয়ে রেখেছিলেন। আগের যমানায় শাহে তুব্বা নামক এক বাদশা ছিল। তিনি তাওরাতের আলেমদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন আখেরী যমানার নবী মক্কা থেকে হিজরত করে এখানে আসবেন। তাই তার মনের অভিলাষ ছিল আমি এখানে সে

নবীর জন্য একটি ঘর বানিয়ে যাই। বংশ পরম্পরায় সে ঘরের মালিক ছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)। শাহে তুব্বার পক্ষ থেকে একটি চিঠিও সে ঘরে রাখা ছিল, যা একেরপর এক যে এ ঘরের মালিক হবে তার হাতে হস্তান্তরিত হতে হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে পৌঁছবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চিঠিও পেয়েছেন। ঐ চিঠির মধ্যে শাহে তুব্বা লিখেছেন–

شَهِدْتُ عَلٰى اَحْمَدَ اَ نَّهٗ ... رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ بَارِئِ النَّسَمِ
فَلَو مُدَّ عُمْرِىْ اِلٰى عُمْرِه ... لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَّهٗ وَابْنَ عَم
وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ اَعْدَائَهٗ ... وَ فَرَّجْتُ عَنْ نَفْسِهٖ كُلَّ غَم

কবিতার প্রথম লাইনে তুব্বার বাদশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আগাম ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারপর তিনি বলেন– আমার হায়াত যদি দীর্ঘ হয় এবং আমি সেই নবীর সাক্ষাত পাই তাহলে আমি তার সাহায্যকারী ও আপনজন হব। আমি তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে তার দুশমন নিধন করে তার মনের সকল দুঃখ-বেদনা দূর করব।

মোটকথা, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান গ্রহণ করলেন।

مبارك منزلے كاں خانه را ماهے چنيں باشد
همايوں كشورے كاں عرصه را شاهے چنيں باشد

বরকতময় সে বাড়িটি–কক্ষে যার চন্দ্র পূর্ণিমার,
ভাগ্যবান সে রাজ্যটি–বাদশা যার করেন সুবিচার।

মক্কা থেকে শত শত মাইল সফর করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছলেন। বর্তমানের মত রাস্তাঘাট ও যানবাহন ছিল না। শুধু পাহাড়ী পথ ছিল। সেই পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে আসা ক্লান্ত-শ্রান্ত নবী মদীনায় আবু আইউব আনসারীর বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করে বিশ্রাম করার চিন্তা করেননি। পৌঁছা মাত্রই তাঁর মনে অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে এখানকার মানুষদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে। ফিকির শুরু করলেন তাদের জন্য মসজিদ নির্মাণের। মসজিদ নির্মাণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। উটটি প্রথমে যেখানে বসেছিল সেখানে গেলেন। জায়গাটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে সেটি খরিদ করলেন। তার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোনো

অর্ডার না দিয়ে নিজেই মসজিদ নির্মাণের জন্য পাথর সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হুজুর! আপনার কাজ করার প্রয়োজন নেই, আমরাই যথেষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরত থাকলেন না; বরং কাজ চালিয়ে যান। সাহাবায়ে কেরাম তার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। কোনো কোনো পাথর খুব বড় ছিল। হাতে তুলে আনা সম্ভব ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেট মুবারকের সাথে জড়িয়ে তা কুড়িয়ে এনেছেন। সাহাবায়ে কেরাম আনন্দের সাথে পাথর কুড়াচ্ছিলেন আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন–

هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالَ خَيْبَرَ ... هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَ أَطْـهَرُ

“খায়বারের সুস্বাদু খেজুরের বোঝা বহন করা অপেক্ষা এই ইটের বোঝা বহন করা অধিকতর প্রীতিকর। হে আমাদের প্রভু, এটাই তোমার নিকট পুণ্যতম ও পবিত্রতম।”

মদীনাবাসির অর্থনীতি নির্ভর ছিল খেজুরের উপর। আর খেজুরের প্রধান উৎপাদনক্ষেত্র ছিল খায়বর। খেজুরের মৌসুমে সেখানে মানুষের অনেক ব্যস্ততা থাকত। খেজুর বহন করে তাঁরা এখানে সেখানে নিয়ে যেতেন। তো সাহাবায়ে কেরাম পাথরের বোঝা বহন করছেন আর বলছেন- এটা খায়বারের খেজুরের বোঝা বহন করছি না; বরং এটা হল পৃথিবীর সর্বোত্তম বোঝা। এটা নেকীর বোঝা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তখন আল্লাহর কাছে সাহাবায়ে কেরামের জন্য প্রার্থনা করছিলেন–

اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْاٰخِرَة ... فَاغْفِرْ الانْصارَ وَالمُهاجِرَ

–হে আল্লাহ! পরকালীন সুখই হলো প্রকৃত সুখ। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন।

এভাবে মসজিদে নববী নির্মিত হয়। *

* ৬/০২/২০০৯ঈ. ফুঁলছোয়ার বার্ষিক মাহফিলের প্রথম দিন আসরের পর ও ১৬/১২/১২ঈ. নারায়ণগঞ্জ দেওভোগ মাদরাসা পশ্চিমনগর বাগে জান্নাত জামে মসজিদে বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ানের সমষ্টি।

তাযকিয়ায়ে নফস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلَّى.[32]

صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ . سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

কে সফলকাম

আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন- ঐ ব্যক্তি কামিয়াব, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং তার রব-এর নামের যিকির করেছে। তারপর নামায পড়েছে। এ তিন কাজ যে করবে সে কামিয়াব। আল্লাহ পাকের নামের যিকির করা এবং নামায পড়া উভয়টি আপন আপন জায়গায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পূর্বে বলা হয়েছে নফসের এসলাহ করবে। নফসের এসলাহ কী? এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে।

প্রতিটি মানুষের ভেতর নফস রয়েছে। কুরআন শরীফের মধ্যে নফসের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। নফসে আম্মারার কথা এসেছে, নফসে লাওয়ামার কথা এসেছে, নফসে মুতমাইন্নার কথা এসেছে। এগুলো কুরআন শরীফের শব্দ। এগুলো নফসের বিভিন্ন অবস্থা। জিনিস একটাই। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেমন একটি মানুষ এককালে মেম্বার ছিল, পরবর্তীকালে চেয়ারম্যান হয়েছে। এক

৩২. সূরা ‘আলা : ১৪-১৫

সময় এম.পি হয়েছে। লোক একজনই কিন্তু তার উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করেছে।

তাযকিয়া অর্থ পরিশুদ্ধ করা। নফসকে পরিশুদ্ধকরণ। আমরা অনেকে নফস কী জিনিস ওটা তালাশ করে পাই না, তাই নফস পরিশুদ্ধ করার অর্থও বুঝি না। একটি ঘটনার আলোকে বললে বিষয়টি সহজে বুঝবেন। কারণ ঘটনা দ্বারা কোনো জিনিস বুঝতে সহজ হয়।

ঘটনা

হযরত গাংগুহী (রহ.) একবার তাঁর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখেছেন। আর চিঠিটি লিখেছেন মূলতঃ হাজী সাহেবের এক চিঠির জবাবে। হাজী সাহেব গাঙ্গুহী (রহ.)কে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তোমার নিজের হালত আমাকে জানাও। বস্তুত: এসব আকাবিরদের মাঝে লোক তৈরি করার ফিকির ছিল। পূর্ববর্তীগণ যদি লোক তৈরি না করেন তাহলে পরবর্তীগণ লোক পাবে কোত্থেকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তৈরি করেছেন। সাহাবীগণ তাবেঈদেরকে তৈরি করেছেন। এরকম প্রত্যেক আগেরওয়ালারা পরের লোকদেরকে তৈরি করতে হয়। এরকম তৈরি করার লোক আল্লাহ পাক প্রতিটি যুগেই রেখেছেন এবং রাখবেন। যেহেতু আল্লাহর দীন কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর দীন থাকার মাধ্যম হল রিজালুল্লাহ। যেমন কুরআনের সূরা ফাতিহায় রয়েছে– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আমাদেরকে সীরাতুল মোস্তাকীমের হেদায়াত দান করুন। তারপর সীরাতুল মোস্তাকীমের পরিচয়ে বলা হয়েছে– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ঐ সকল লোকদের রাস্তা হল সীরাতে মোস্তাকীম, যারা আল্লাহ পাকের পুরস্কার দ্বারা ধন্য হয়েছেন।

আল্লাহপাক সীরাতুল মোস্তাকীমের পথ পাওয়ার দু'আ শিখিয়েছেন। আর সীরাতুল মোস্তাকীমের পরিচয় দিয়েছেন ঐ সকল লোকের রাস্তা যারা আল্লাহপাকের কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেছেন। আর বান্দা আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করবে কিন্তু এই ধরনের লোক থাকবে না বা আল্লাহ এ সকল লোকদের উপস্থিতি ঘটাবেন না–এটা অসম্ভব। এজন্য রাস্তা অবশ্যই থাকবে। এটা আল্লাহপাকের নেজাম। তিনি প্রতিটি যুগেই লোক রাখবেন। এজন্য প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু লোক পাওয়া

যায় যারা পরবর্তী যুগের জন্য লোক তৈরি করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ফিকির ও মন-মানসিকতা দান করেন যার ফলে তারা লোক তৈরির কাজে মগ্ন থাকেন।

তো হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) ছিলেন এমন একজন মানুষ, তিনি লোক তৈরি করতেন। তিনি যাদেরকে তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবী (রহ.), হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.), হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), মাও. রহমতুল্লাহ কিরানভী (রহ.)। মাওলানা কিরানভী (রহ.) 'ইজহারুল হক' নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় যার অনুবাদ হয়েছে। সে কিতাবে তিনি একথা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। যে সময় তিনি এ কিতাব লিখেন তখন গোটা পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের দাপট বেশি ছিল। দেশের অধিকাংশ জায়গায় খ্রিস্টানদের ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতার দাপটে তারা গোটা পৃথিবীকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। ওদের ঐ ধর্মের হাকীকত কী, খ্রিস্টধর্মের বাস্তবতা কী ছিল, আসল কী ছিল, পরবর্তীতে নকল ও বিকৃত করে তারা কেমন জগাখিচুড়ি বানিয়েছে এ বিষয়গুলো তিনি তাদের বই-পুস্তকের রেফারেন্স দিয়েই খুব মজবুতভাবে লিখেছেন। হেরেম শরীফের সীমানায় এখনও একটি মাদরাসা রয়েছে। ওটা হানাফী মাযহাবের মাদরাসা। ঐ দেশে হাম্বলী মাযহাবের লোক বেশি। চারটি মাযহাবই আপন আপন জায়গায় হক। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) খুব বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইবনে কায়্যিম (রহ.) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। হাম্বলী মাযহাবের বড় বড় আলেম ঐ এলাকায় তৈরি হয়েছেন। তাই ঐসব এলাকায় হাম্বলী মাযহাবের প্রচলন বেশি। হেরেমের সীমানায় মাদরাসায়ে সাওলতিয়া নামে একটি হানাফী মাযহাবের মাদরাসা রয়েছে। মাদরাসাটি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত। সে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী (রহ.)। আমাদের কারী ইবরাহীম সাহেব সম্পর্কে আপনারা জানেন যে, তিনি মক্কা শরীফে পড়িয়েছেন। মক্কায় তিনি এ সওলতিয়া মাদরাসায় পড়িয়েছেন।

আমার বলার উদ্দেশ্য হল হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এ লোকগুলো তৈরি করেছেন। হাজী সাহেব (রহ.) হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখেছেন, তুমি তোমার অবস্থা তো কিছু জানালে না। হযরতের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক তো আরো পূর্ব থেকেই ছিল। হযরত গাংগুহী নিজের হালত জানিয়ে লিখেন–

شریعت طبیعت بن چکی - نصوص شریعت میں کہیں تعارض محسوس نہیں ہوتا - میرے پاس مادح اور ذام برابر ہے

প্রথম হালত : শরীয়ত তবীয়তে পরিণত হয়ে গেছে।

একটা হল শরীয়ত, আরেকটি হল তবীয়ত। তবীয়ত মানে মানুষের স্বভাব। মনের চাহিদা। তিনি লিখেছেন, শরীয়ত তবীয়তে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ শরীয়তের যে হুকুমটা যেভাবে আছে সে কাজটা তাঁর থেকে এভাবেই হতে থাকে। যেমন মনে করুন, আমরা মসজিদ থেকে বের হই। নিয়ম তো হল মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া। কিন্তু অনেক সময় আমাদের থেকে এর ব্যতিক্রম হয়ে যায়। ভুলে ডান পা বের হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু আমাদের থেকে কখনো উল্টোটা হয়ে যায়। বাম পা আগে চলে আসে। হযরত গাংগুহী (রহ.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন এভাবে যে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বেখেয়ালীতেও কখনো তাঁর ডান পা আগে যায় না। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বাম পা বের হয়। এরূপভাবে মসজিদে প্রবেশকালে বেখেয়ালীতেও বাম পা আগে দেন না, ডান পা আগে দেন। অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে যে, শরীয়তের খেলাফ কিছু হয় না। এটাই হল শরীয়ত স্বভাবে পরিণত হয়ে যাওয়ার মর্ম।

মানুষের কিছু বিষয় রয়েছে স্বভাবজাত। যেগুলোর ব্যতিক্রম মানুষ করে না। একজন পাগলও এর ব্যতিক্রম করে না। যেমন মুখ দিয়ে খাবার খাওয়া একটি স্বভাবজাত বিষয়। একজন পাগলকেও দেখা যাবে না যে, সে নাক দিয়ে বা কান দিয়ে খাবার গ্রহণ করছে; বরং পাগলও খাবার গ্রহণের সময় মুখ দিয়ে গ্রহণ করে। এটা হল স্বভাবজাত বিষয়। স্বভাবজাত বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটে না। তো শরীয়তের উপর চলা হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর কাছে এমন স্বভাবজাত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় হালত : তিনি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে,

نصوص شریعت میں کہیں تعارض محسوس نہیں ہوتا

এটা উলামায়ে কেরামের ব্যাপার। অন্যরা তেমন বুঝবেন না। তারপরও বোঝানোর চেষ্টা করছি। কুরআন ও হাদীসে মাঝে মধ্যে এমন বিষয় পাওয়া যায় যেন একটা আরেকটার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। যেমন- কোনো কোনো হাদীসে রুকু থেকে ওঠার সময় হাত উঠানোর কথা এসেছে, আবার কোনো হাদীসে এটাকে নিষেধও করা হয়েছে। কোনো হাদীসে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা পাওয়া যায় আবার কোনো হাদীসে নাভীর উপর হাত বাঁধার কথা পাওয়া যায়। এ বিষয়গুলো পরস্পর বিরোধী মনে হয়। এমন আরও উদাহরণ রয়েছে। এটাকে পারস্পরিক বিরোধ বলা হয়েছে। যার ইলম যত কম হবে তার কাছে বিরোধ বেশি মনে হবে। আর যার ইলম যত বেশি হবে তার কাছে বিরোধ তত কম মনে হবে। একেকটি বর্ণনার ক্ষেত্র একেকটি অবস্থা। ইলম বেশি হলেই তো ক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যাপক ইলম থাকবে। তো ক্ষেত্রবিশেষ একেকটা বর্ণনা প্রয়োগ করলে তার কাছে বিরোধ থাকবে না।

ইলম যত কম হবে বিরোধ তত বেশি মনে হবে। আর ইলম যত বেশি হবে বিরোধ তত কম মনে হবে। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইলম বেশি ছিল বিধায় তাদের কাছে এ বিরোধ-মীমাংসা খুব সহজ ছিল। এ বিরোধ মীমাংসা করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক রকম করেছেন। কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকেই করেছেন। আবার ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মূলনীতি অনুসরণ করেই অন্য রকমভাবে মীমাংসা করেছেন। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকে অন্য রকমভাবে সমাধান করেছেন। আপন আপন জায়গায় সবগুলোই ঠিক। তাঁদের কারো কাছেই বর্ণনার পরস্পরিক বিরোধ অবশিষ্ট থাকেনি। তো যাই হোক, হযরত গাংগুহী (রহ.) বলেছেন,

نصوص شریعت میں کہیں تعارض محسوس نہیں ہوتا

কুরআন-হাদীসের কোথাও আমার কাছে বিরোধ মনে হয় না।

তৃতীয় হালত : তৃতীয় নম্বরে লিখেছেন–

میرے پاس مادح اور ذام برابر ہے

আমার প্রশংসাকারী এবং নিন্দাকারী উভয়ে আমার কাছে সমান। একজনে প্রশংসা করলে আমার মনের যে অবস্থা, অন্য জনে গালি দিলেও ঠিক একই অবস্থা। অবস্থাটা কিসের? অবস্থাটা হল মনের। আমাদেরকে কেউ গালি দিলে চেহারা লাল হয়ে যায়। আসলে চেহারা লাল হয়নি। লাল হয়েছে নফস। নফস লাল হওয়ার প্রভাব চেহারায় ফুটে ওঠেছে। আসলে সবকিছুর চোট লাগে নফসে। তো হযরত গাংগুহী (রহ.) বলেছেন, প্রশংসাকারী ও দুর্নামকারী উভয়ই আমার কাছে সামান। কী অর্থ? কেউ আমার প্রশংসা করলে আমি খুশি হই না। আমার দিলের মধ্যে আনন্দ আসে না। কেউ আমাকে গালি দিলে বা আমার কুৎসা রটনা করলেও আমার মনে কোনো কষ্ট আসে না।

উর্দূতে একটি প্রবাদ আছে–

نہ ساون سوکھے نہ بھادو ہرے

একটা গাছ এমন আছে যা কোনো ঋতুতে পরিবর্তিত হয় না। শ্রাবণ মাসে শুকিয়ে যায় না এবং ভাদ্র মাসে সতেজও হয় না। অর্থাৎ সব সময় এক রকমই থাকে। ফার্সীতে এ গাছটির নাম হল 'সারভ'। উর্দুতে বলে 'সানোবর'। (আমাদের দেশে এর নাম কী জানা নেই।) এটা কোনো ঋতুর প্রভাব গ্রহণ করে না। এটা ছাড়া অন্যান্য গাছে ঋতুর প্রভাব পড়ে। কোনো কোনো গাছে তো পাতা একেবারেই ঝরে পড়ে। আবার বসন্তকাল এলে নতুনভাবে পাতাগুলো গজায়। যেগুলোর পাতা পড়ে না সেগুলোর মাঝেও সজীবতা কমে যায়। শেখ সাদী (রহ.) বলেন- সারভ বৃক্ষের ফলও নেই, ফুলও নেই।

ফল নেই, ফুল নেই বলতে গিয়ে একটি কিসসা মনে পড়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে তখন তাকে দেখার জন্য শুভানুধ্যায়ীরা যেতেন। শিক্ষিতা মেয়েরাও যেতো। একবার তিনি মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বলেন-

"এই যে শূন্যলতা
ফল নেই, মূল নেই
শুধু রঙের বিহবলতা।"

শূন্যলতার গোড়া নেই, তাতে ফল হয় না। ফুলও হয় না। অন্য একটি গাছের উপর জন্মায়। কিন্তু দেখতে অন্য গাছের চেয়ে খুব চমৎকার দেখা যায়। এর ফল, ফুল ও মূল কিছুই নেই। বস্তুতঃ তিনি এ

কবিতায় দুনিয়ার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। গোটা দুনিয়ার হাকীকতই হল কেবল রঙের বিহবলতা। এ ছাড়া আর কী আছে?

یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو
تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے

মনোহর এ ফুলবাগান একদিন হবে মরূদ্যান
বুলবুলিকে বলো যেন জীবন না দেয় অসাবধান

رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل
یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے

রূপরাঙাদের প্রেমের ফাঁদে পড়িসনে অবুঝ মন,
এটা হেমন্ত যদিও সুকান্ত, বাসন্তী আচ্ছাদন

এ দুনিয়ার পুরোটাই হেমন্তের মত জরাজীর্ণ, কিন্তু দেখতে বসন্তের মত তরতাজা সুজল-সুফলা মনে হয়। এর উপরের অবস্থাটা হল বসন্ত কিন্তু ভিতরের পুরোটা হল হেমন্ত। হেমন্তকালে মাটির উর্বরতা থাকে না, গাছে সজীবতা থাকে না। দুনিয়ার অবস্থাও এমনই।

যাই হোক, হযরত শেখ সা'দী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 'সারভ' বৃক্ষ ফল ফুল কিছুই দেয় না, তারপরও তাকে গাছের রাজা বলা হয় কেন? তিনি জবাব দিয়েছেন, সকল বৃক্ষ ঋতু দ্বারা প্রভাবিত হয়। হেমন্তকালে সেগুলোর মাঝে মন্দাভাব আসে আবার বসন্তকালে সেগুলোতে সজীবতা আসে। সারভ বৃক্ষ এর ব্যতিক্রম। এর মধ্যে কোনো ঋতুর প্রভাব পড়ে না। এটা সব সময় একই রকম থাকে। ঈমানদারের অবস্থাও এরূপ। দুনিয়ার মধ্যে সুখের অবস্থা হবে, দুঃখের অবস্থা হবে, কেউ মারা যাবে বা অসুস্থ হবে বা নিজে অসুস্থ হবে, বিপদের খবর আসবে, খুশির সংবাদ আসবে। কিন্তু আমি যদি মুসলমান হয়ে থাকি তাহলে আমার অবস্থা হতে হবে এ সারভ বৃক্ষের মত। এ গাছ যেমন ঋতুর পরিবর্তন গ্রহণ করে না তাই সে শ্রেষ্ঠ, তেমনিভাবে মুসলমানও সুখে-দুঃখের কোনো প্রভাব গ্রহণ করবে না। সব সময় তার দিল মাওলায়ে পাকের সাথে লেগে থাকবে। কোনো পরিস্থিতিতে তার মন মাওলায়ে পাক থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

یہ نغمہ فصل وگل ولا لہ کے نہیں پابند
بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এমন একটি সুমধুর ধ্বনি যা সকল ঋতুতেই শুনতে ভালো লাগে। এটা কোনো ঋতুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা, ভালো অবস্থা, খারাপ অবস্থা, সুখের অবস্থা, দুঃখের অবস্থা কোনো কিছু দ্বারা এটা প্রভাবিত হবে না। মুমিনের দিল সবসময় এক রকম থাকবে। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটার ঘটুক। তুফান আসুক। ঝড় এলেও মুমিন গোড়ার সাথে লেগে থাকবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ চোখে দেখছেন যে, তার জন্য আগুন জ্বালানো হচ্ছে। তাকে সে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। বিরাট আয়োজন চলছে। হযরত জিবরীল (আ.) গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন যে, আপনি বলুন, কী করতে হবে। তিনি জবাব দিলেন, আজ আমি আমি এ অবস্থার সম্মুখীন কেন? আল্লাহকে ডাকার কারণেই তো! আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিই, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করি- এজন্যই তো! যে আল্লাহপাকের নাম জপি, যার দিকে মানুষকে আহ্বান করি সে আল্লাহ কি আমার অবস্থা জানেন না? তুমি কেন এসেছ? জিবরীল (আ.) তো আল্লাহ নন, তিনিও গাইরুল্লাহ। ইবরাহীম (আ.) যদি এ আগুনে জ্বলেও যেতেন তবুও তিনি নারাজ হতেন না। কারণ, সফলতা তো এর মধ্যেই নিহীত। আল্লাহ পাক যেটা চান ওটা হওয়ার মধ্যেই সফলতা।

সাহাবায়ে কেরাম জিহাদে গেছেন। শহীদ হয়েছেন। বাড়ী ফিরে আসতে পারেননি। আল্লাহপাক বিবরণ দিয়েছেন–

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ .[33]

অর্থাৎ যারা শহীদ হয়েছে তারা তো তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়ে গেছে। ঈমানদারের জীবনের উদ্দেশ্যই হল পূর্ণ জীবন আল্লাহ পাকের জন্য নিবেদিত করতে পারা। তিনি যদি আমার জীবন বাঁচার মধ্যে খুশি থাকেন তাহলেও আমি রাজি। আর যদি শহীদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে খুশি থাকেন তাহলেও আমি রাজি। তিনি যেটা করবেন সেটাই আমার প্রিয়, তিনি যা করবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

زندہ کنی عطائے تو ... و ربکشی فدائے تو
دل شدہ مبتلائے تو ... ھر چہ کنی رضائے تو

৩৩. সূরা আহযাব : ২৩

মাওলা গো! জীবন আপনি দান করেছেন। যদি আপনি আমার প্রাণ নিয়ে নেন তাহলে এটা আপনার তরে উৎসর্গিত। আমার হৃদয় আপনার স্মরণে লিপ্ত। আপনি যা ইচ্ছা তাই করুন, আমি এতেই সন্তুষ্ট।

এখনকার বিষয় হল আত্মাকে শুদ্ধকরণ। শুদ্ধকরণের উদাহরণ দিতে দিতে এত দূর চলে এসেছি।

তো হযরত গাংগুহী (রহ.) বলেন–

میرے پاس مادح اور ذام برابر ھے

আমার নিকট আমার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী উভয়ে সমান। যে আমার প্রশংসা করে সে আমার প্রিয় হয়ে যায় না, আর যে আমার কুৎসা রটায় সে আমার অপ্রিয় হয়ে যায় না।

আমাদের হাটহাজারী মাদরাসার মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেবকে বিদআতীরা গালি-গালাজ করত, বদনাম করত। তিনি তো সুন্নতের খুব পাবন্দ ছিলেন, তাই তিনি কোনো বিদআতী কর্মকাণ্ড করতেন না। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকায় যেটা নেই, অথচ দেখতে ভালো দেখায়, মানুষের কাছে ভালো লাগে–এমন কাজ তিনি করতেন না। এজন্য বিদআতীরা তাঁর ব্যাপারে নানা কুৎসা রটাত। একদিন তাঁর এক ভক্ত এসে বললেন, হুজুর, ওরা যেসব গালি-গালাজ করে তা সহ্য করার মতো নয়। হযরত তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একটি ফার্সি ছন্দ পাঠ করলেন–

ما شاخِ در ختیم پُر از میوۂ تو حید
گر رھگزار ہ سنگ زند عار نداریم

অর্থাৎ আমরা তো হলাম তাওহীদ তথা আল্লাহপাকের একত্ববাদের ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষশাখা। পথচারীরা যাওয়ার সময় ঢিল ছোঁড়ে, এতে আমরা লজ্জাবোধ করি না। আমরা তাওহীদে খালেসে বিশ্বাসী। যার মাঝে শিরকের কোনো গন্ধ নেই।

অনেকে মুসলমান হওয়ার পরও পীরের কাছে সন্তান কামনা করে। এটা শিরক। সন্তান একমাত্র আল্লাহপাক দিতে পারেন। কোনো পীর-ফকীর সন্তান দিতে পারে না। হ্যাঁ, পীর সাহেব দু'আ করতে পারেন। সন্তান দিতে পারেন না। অনেক মানুষ এমনও রয়েছে যারা পীরকে মুশকিল কোশাঁ বা সাহায্যকারী মনে করে। এটাও শিরক।

তো হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেবকে যখন বলা হল বিদআতী ও মাজারপন্থীরা তো আপনাকে এমন এমন গালমন্দ করে যা শুনলে সহ্য হয় না। হযরত মুফতী সাহেব বলেন, সহ্য না হওয়ার কী আছে। খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই। কারণ, পথের ধারে যদি এমন একটি গাছ থাকে যার ডালে কোনো ফল নেই, তাহলে কেউ তাতে ঢিল ছোঁড়বে না। আর যদি সে গাছের ডালগুলো মিষ্টি আমে পরিপূর্ণ থাকে তাহলে পথিকগণ তাতে অবশ্যই ঢিল ছোঁড়বে। আল্লাহ পাক অনুরুপভাবে আমাদেরকে তাওহীদ নামক ফলে পরিপূর্ণ একটি গাছ বানিয়েছেন। তাই কিছু মানুষ তাতে দু'চারটা ঢিল ছোঁড়বেই। ঢিল ছোঁড়লে আমরা কষ্ট পাই না। খোদা না করুন, আমরাও যদি মুশরিক হয়ে যাই, তাদের মতো শিরকী কর্মকাণ্ড শুরু করে দেই তাহলে কেউ আর আমাদেরকে ঢিল ছোঁড়বে না, কষ্ট দিবে না। কিন্তু ঐ গালিহীন অবস্থায় থাকা ভালো নয়, বরং তাওহীদের কাজ করতে গিয়ে গালি খাওয়া ভালো। যে আমগাছে মানুষ ঢিল ছোঁড়ে না সে আম গাছ ভালো নয়। আর যে আম গাছে মানুষ ঢিল ছোঁড়ে সেটা ভালো। কারণ তাতে ফল আছে। আর ফল আছে বলেই ঢিল মারে, ফল না থাকলে কেউ ঢিল মারত না।

এ জন্য বলি, কেউ গালি দিলে খারাপ লাগার কিছু নেই। আবার কেউ প্রশংসা করলেও খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ সমস্ত প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ পাক। আমি শুকরিয়া আদায় করতে পারি। প্রশংসাকারী তো আপনার কোনো একটি গুণের উপর প্রশংসা করেছে যে গুণটা অন্যের মাঝে নেই, আপনার মাঝে আছে। এ গুণটি কে দিয়েছেন? আল্লাহ পাক দিয়েছেন। তাই প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার হবে।

যেহেতু আল্লাহ পাক আমাকে একটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন তাই আমি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করতে পারি। কেউ প্রশংসা করলে আমার ভালো লাগে—দিলের হালত যেন এমন না হয়।

প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী উভয়ে সমান হলে বোঝা যাবে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়েছে। এবার প্রত্যেকে নিজের মনের অবস্থা যাচাই করে দেখুন আপনার মনের অবস্থা কোন পর্যায়ের। প্রশংসা করলে আপনার মন কী বলে, না করলে কী বলে।

ওয়াজ-মাহফিলের আসল উদ্দেশ্য হল মানুষের ইসলাহ বা সংশোধন। এখন যদি ওয়াজ-মাহফিলে কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে এনে তার প্রশংসা করা হয় তাহলে কি তার ইসলাহ করা হল, না তাকে নষ্ট করা হল? সে লোকটি হয়ত দশহাজার বা দশলক্ষ বা দশকোটি টাকা দান করেছেন। এ দানের কারণে যদি তার প্রশংসা করা হয় তাহলে আমি মনে করি তার সাথে গাদ্দারী করা হবে। যেহেতু সবার ভিতরেই নফস রয়েছে তাই দাতাও প্রশংসাই কামনা করে। আল্লাহর শোকর আমাদের ফুলছোঁয়ায় এমন রেওয়াজ নেই। ঐ মন-মানসিকতার কেউ এখানে আসেনও না। এমন মানসিকতার অধিকারীদের দানের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

মাদরাসা ও ওয়াজ-মাহফিলের উদ্দেশ্য হল, মানুষের ইসলাহ হওয়া। কিন্তু যদি বিপরীত কাজ হয় তাহলে সেটা দুঃখজনক বিষয়। আমরা সবাই তো হেদায়াতের মুহতাজ। এম. পি, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, মেম্বার সবাই হেদায়াতের মুহতাজ। কোনো দীনি মাহফিলে এলে তারাও চুপচাপ ওয়াজ শুনে চলে যাবেন। তার নাম ঘোষণা দিতে হবে কেন? তাকে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দিতে হবে কেন? এসব করা হলে হেদায়াতের বদলে গোমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ পূর্বে তার নফস যদি থাকে এক আঙ্গুলের মতো মোটা এখন তা ফুলে কলা গাছের মত মোটা হয়ে গেছে। কয়দিন পর হবে তাল গাছের মতো মোটা। সে যদি জাহান্নামে যায়, তাহলে আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। বলবে, তোমরা জানা সত্ত্বেও কেন আমাদের প্রশংসা করেছিলে? তোমাদের তো উচিত ছিল আমাদেরকে বুঝিয়ে-সামঝিয়ে আমাদের নফসকে দমন করে রাখা। তোমরা তা না করে আমাদেরকে আরো উস্কে দিয়েছ। আমাদেরকে খুশি করার জন্য বড় বড় প্রশংসা করেছ, স্টেজে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছ, ফলে আমাদের নফস কলা গাছ ও তাল গাছের মতো ফুলে উঠেছে। যার কারণে আমরা আজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

দোস্ত! আমাদের নফসের অবস্থা তো এই যে, কেউ প্রশংসা করলে তাকে আপন মনে করি, আর কেউ বদনাম করলে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। এমন হলে বুঝতে হবে আমার দিল এখনও পরিষ্কার হয়নি। আর মনে রাখবেন, এ দিলকে পরিশুদ্ধ করেই আপনাকে কবরে যেতে হবে। কলব পরিশুদ্ধ না হলে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

আর কলব পরিশুদ্ধ হলে সবখানে কামিয়াবী আর কামিয়াবী। এ কথাটিই আল্লাহপাক বলেছেন এভাবে–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى .[34]

যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সে কামিয়াব।

অন্যত্রে বলেছেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .[35]

কেয়ামতের দিন সম্পদ ও সন্তানাদি কাজে আসবে না, সেদিন কাজে আসবে একমাত্র কলবে সালীম (পরিশুদ্ধ অন্তর)।

একটা দিন এমন রয়েছে যেদিন আমাদের সকলকে আল্লাহপাকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। উপস্থিত হতেই হবে। উপস্থিত না হওয়ার কোনো পথ নেই। বন্ধু হলেও উপস্থিত হতে হবে, দুশমন হলেও উপস্থিত হতে হবে। ঐ দিনের ফায়সালা কিসের উপর হবে? এর জবাব পবিত্র কুরআনে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ .[36]

আল্লাহ পাক বলেন, মানুষ কি জানে না যখন তাকে কবর থেকে উঠানো হবে, এরপর ফায়সালা হবে তার দিলের অবস্থার উপর।

আমরা চিনাবাদাম খাওয়ার সময় প্রথমে হাতে তুলেই একটি টিপ দিয়ে সেটি ভাঙি। ভাঙার পর যদি পছন্দসই শাঁস বের হয় তাহলে আগ্রহসহ মুখে দিয়ে খেতে থাকি। আর যদি শ্বাসটা ভালো না হয় তাহলে ওখানেই ফেলে দিই। ঠিক অনুরূপভাবে বিচারের সময় আমাদের অবস্থাটাও এমন হবে, আল্লাহ পাক মানুষের দিলটা দেখবেন, আর দিলের অবস্থার উপর ফায়সালা করবেন। ইরশাদ করেছেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .[37]

ঐ দিন আল্লাহ পাকের সামনে কিছুই কাজে আসবে না। কাজে আসবে পরিশুদ্ধ আত্মা। এটি নিজের জন্য কাজে আসবে, অন্যের জন্যও কাজে আসবে। ঐ দিন যে নিস্তার পাবে সে জান্নাতী হবে। দুনিয়াতে

৩৪. সূরা 'আলা : ১৪
৩৫. সূরা শুআরাহ : ৮৮-৮৯
৩৬. সূরা আদিয়াত : ৯-১১
৩৭. সূরা শুআরাহ : ৮৮-৮৯

যেমন কারো ধন-সম্পদ থাকলে তা দিয়ে সে নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকে উপকার করতে সক্ষম হয়, গরীব-অসহায়কে সাহায্য করতে পারে তেমনিভাবে কেয়ামতের ময়দানে যারা মুক্তি পাবে তারাও অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্য অস্থির ও পেরেশান থাকবেন। যার আত্মা পরিশুদ্ধ হবে সে নিজেও বাঁচবে অন্যদেরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

কালবে সালীম কী

এ পরিশুদ্ধ আত্মা সেটা হবে যার মধ্যে কুফর নেই, নেফাক নেই, শিরক নেই, হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, পরশ্রীকাতরতা নেই, অহংকার নেই; বরং এসবের বিপরীতে যে ভালো গুণগুলো রয়েছে সেগুলো রয়েছে। পরিশুদ্ধ ঈমান আছে, আমল আছে, আমলের মধ্যে মজবুতী আছে, আল্লাহর মহব্বত রয়েছে, সর্ববস্থায় দিলের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ রয়েছে, সব সময়ই দিল আল্লাহর সাথে লাগা আছে—এ হল পরিশুদ্ধ অন্তরের পরিচয়।

হযরত ওমর (রা.)-এর আত্মশুদ্ধির ফিকির

একবার হযরত ওমর (রা.) মশক তথা পানির পাত্র কোমরে নিয়ে জনসাধারণকে পানি পান করাতে লাগলেন। অবসর হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হুজুর আপনি আজ এ কাজটি কেন করলেন? আপনি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কোমরে মশক নিয়ে সাধারণ মানুষকে পানি পান করালেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আজ আমার কাছে বিদেশী একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। তারা আমার কিছু প্রশংসা করেছিল। তাদের প্রশংসা শুনে আমার দিলটা ফুলে উঠেছিল। অর্থাৎ তাদের প্রশংসা আমার কাছে ভালো লেগেছে। তাই আমার আংশকা হচ্ছিল যে, এতে আমার দিলে কোনো অহংকার চলে আসে কি-না। আমার অন্তরে যে খারাপ অবস্থা বা রোগ সৃষ্টি হয়েছে তার চিকিৎসার জন্য আমি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.)-এর আত্মশুদ্ধির ফিকির

হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.) নামে একজন বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

বংশধর। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধর। মদীনা থেকে অনেক দূরে বাস করতেন। মদীনায় এসে যেয়ারত করার সুযোগ পান না বিধায় আসতে পারেন না। অনেক দিন পর সুযোগ পেয়ে এসেছেন। এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করছেন এ ভাষায়–

اَلصَّلاَةُ و السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا جَدِّيْ

হে আমার নানা জান! আপার প্রতি আমার সালাত ও সালাম। নানাজান বলার কারণ হল তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশের ছিলেন। রওজায়ে পাক থেকে আওয়াজ এসেছে–

وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ يا وَلَدِيْ!

হে আমার সন্তান! তোমার প্রতিও আমার সালাম।

এরপর তিনি কাসীদা পাঠ করতে শুরু করেছেন–

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِيْ كُنْتُ أرْسِلُهَا ... تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَ هِيَ نَائِبَتِيْ
وَ هٰذِه دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ... فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظَىَ بِهَا شَفَتِيْ

নানাজান! আমি অনেক দূরে বসবাসরত ছিলাম। মদীনায় আসার সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু মাঝে মধ্যে আমার রুহটাকে প্রেরণ করতাম। আমার রুহ আপনার রওজা শরীফ জেয়ারত করে আপনার কবরের উপর বিচরণ করে চলে যেত। আজ আল্লাহপাক সুযোগ দিয়েছেন তো স্বশরীরে আপনার রওজার সামনে এসে হাজির হয়েছি। নানা জান! আপনি যদি আপনার পবিত্র ডান হাতটি বের করে দিতেন আমি চুম খেয়ে ধন্য হতাম।

এ কথা বলার সাথে সাথে রওজা শরীফ ফাঁক হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ডান হাত কবর থেকে বের হয়ে গেল। আর আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.) সে পবিত্র হাতে চুমু খেলেন। উপস্থিত হাজার হাজার লোকজন সকলেই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এ ঘটনা বললাম। আমার বলার মূল উদ্দেশ্য হল এ ঘটনার পর আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.) কী করলেন? তিনি লক্ষ্য করলেন, তার অন্তরে একটি বড়ত্বের ভাব সৃষ্টি হয়েছে। অন্তরের এ ভাব দূর করার জন্য তিনি মসজিদে নববীর দরজায় শুয়ে পড়লেন আর সবাইকে বলতে থাকলেন তোমরা আমার গায়ের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া কর।

বস্তুতঃ ঐ ঘটনার পর তাঁর মাঝে চিন্তা এসেছে মানুষের মাঝে আমি বড় কিছু হয়ে গেলাম কি-না। এটা তো আমাকে শেষ করে দিবে। এ জন্য সেই ভাবখানা দূর করার জন্য তিনি মসজিদে নববীর দরজায় সোজা হয়ে শুয়ে পড়েছেন আর মানুষ তার গায়ের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করেছেন।

দোস্ত! এর নাম হল তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা।

আমরা জানি, দিলের অনেকগুলো রোগ রয়েছে। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেকটি রোগ ধরে ধরে চিকিৎসা দিয়ে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার দিলের মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। অহংকারটা মূলত দিলে থাকে। অনেকে অহংকার দেখায়। আসলে সে দেখায় না, বরং অহংকার দিল থেকে বের হয়। তো হাদীসের ভাষ্যমতে যার দিলে অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। যতক্ষণ না জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে সে অংশটা শেষ না করা হবে। এরকম অনেক বিষয়ের কথা হাদীসে এসেছে। দিলের যেসব রোগ আছে সবগুলোর ব্যাপারেই হাদীসে আলোচনা এসেছে।

ঘটনা

আরেকটি ঘটনা শুনুন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও মির্জা মাজহার জানেজানাসহ তিনজন আলেমকে এক লোক দাওয়াত করেছেন। খাবারের দাওয়াত ছিল। দাওয়াত দেয়ার পর দাওয়াত প্রদানকারীর বাড়িতে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। যার ফলে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতে তিনি অপারগ ছিলেন। এ দিকে মেহমান যথাসময়ে বাড়িতে হাজির হয়ে গেছেন। কারণ পূর্ব থেকে প্রোগ্রাম বাতিল হওয়ার কথা জানাননি। মেহমানদের আগমনে লোকটি বড় পেরেশান। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ ভাবলেন, একজন লোক এক বেলা হোটেলে উন্নতমানের খাবার খেতে যে পরিমাণ টাকা লাগবে তা দিয়ে দেই। কিছুক্ষণ বসার পর মেহমানদের কাছে সবিনয় আরজী পেশ করলেন যে, আমি তো আপনাদেরকে দাওয়াত করেছিলাম। বাড়িতে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় আমি আপনাদের মেহমানদারীর আয়োজন করতে সময় পাইনি। আমি প্রত্যেককে একবেলা খাওয়ার টাকা দিতে চাই, আপনারা কষ্ট করে হোটেলে খেয়ে নিবেন।

এখন তিন জন আলেম থেকে তিন রকমের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। মির্জা মাজহার জানেজান (রহ.)-এর কাছে এ কথা বলার পর তিনি খুব রাগ প্রকাশ করে কিছু কথা বলেছেন। আর বলাটাও স্বাভাবিক। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁদের এক মিনিট সময়ের অনেক মূল্য। আরেকজন একটু নরম সুরে বলেছেন এ রকম না করলে ভালো হত। কিন্তু শাহ সাহেব মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি। আচরণটি ভালো হয়নি বা টাকা লাগবে না এমন কিছুই বলেননি। চুপচাপ টাকা গ্রহণ করেছেন।

এবার বুঝুন, কার আচরণটা ভালো ছিল।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এ ঘটনার বিশ্লেষণ করে বলেন, সকলের আচরণই আপন আপন জায়গায় ভালো এবং সঠিক আছে। তবে এর মধ্যে প্রথম স্তরে হলেন শাহ সাহেব। যেহেতু এ ঘটনায় তাঁর মাঝে কোনো প্রভাবই পড়েনি। টাকা নিতেও অস্বীকৃতি জানাননি এবং ঘটনার উপর মুখে কোনো প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেননি। টাকা দেয়ার প্রয়োজন নেই এমনটিও বলেননি।

কালবে সালীম

এটা হল তাযকিয়ায়ে নফসের প্রকৃত রূপ। কোনো অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। এটাকেই বলা হয়েছে কালবে সালীম। পরিশুদ্ধ অন্তর। আমাদের অন্তরের অবস্থা এমন বানাতে হবে। আর যত গোলমাল রয়েছে সব কিছু দিল থেকে সৃষ্টি হয়। নফসের ইসলাহ না হওয়ার কারণে হাজার রকমের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য প্রত্যেকের উচিত নিজের দিলের আয়নায় নজর দেয়া। হযরত শেখ সা'দী (রহ.) বলেন–

تأمل در آئینۂ دل کنی
صفائی بتدریج حاصل کنی

তুমি তোমার দিলের আয়নায় কিছুক্ষণ পরপর নজর দাও। নজর দিয়ে সেখান থেকে কিছু কালিমা মুছে ফেল। এভাবে একটু একটু করে মুছতে মুছতে তুমি পরিশুদ্ধ হবে।

এক দিনেই পরিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। অল্প অল্প করে হবে। আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিলের দিকে লক্ষ করি তাহলে অনেক কিছু

দেখতে পাব। আর যে ঘটনাগুলো বলা হল এগুলোর আলোকে আমরা আমাদের দিলের অবস্থা যাচাই করে দেখব। এ যাচাইটা এখন করতে পারবেন না। সমাজের মানুষের সাথে যখন মিশবেন এবং বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হবেন তখন বুঝবেন আপনার দিলের অবস্থা কোন পর্যায়ে রয়েছে। তখন আয়নায় ধরা পড়বে যে, আমার দিলে কী কী সমস্যা রয়ে গেছে।

আমার শায়খ হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) বলতেন, কেউ কেউ নামের সামনে আহকারুল ওয়ারা, নাচীজ, খাকছার ইত্যাদি বিনয়সূচক শব্দ লিখে থাকে। এগুলো লিখা খারাপ নয়। আহকারুল ওয়ারা অর্থ হচ্ছে জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, তুচ্ছ। হযরত বললেন, যারা এসব লিখে তাদেরকে একটু এ শব্দটি বলে সম্বোধন করে দেখবে তার মধ্যে এর কী প্রতিক্রিয়া হয়। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। লেখা তো সহজ। বাস্তবে কেউ যখন এটা দিয়ে গালি দিবে তখন ধরা যাবে কার হৃদয়ের অবস্থা কেমন।

কেউ মন্দ বললে করণীয়

আমি আপনাদেরকে একটি সরল হিসাব দেই। কেউ আপনাকে গালি দিলে এর দুই অবস্থা। একটি অবস্থা হল সে যা বলেছে সেটাই বাস্তব। যদি বাস্তব কথা বলে থাকে তাহলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন কেন? খারাপ মানুষকে সে খারাপ বলেছে- তাতে রাগ করার কী আছে? খারাপকে খারাপ বলবে না তো ভালো বলবে? খারাপকে খারাপ বলেছে। ঠিক কাজটিই করেছে। তাই রাগ না হয়ে তার শুকরিয়া আদায় করবেন। কারণ তার বলার দ্বারা আপনার সংশোধনের সুযোগ এসেছে। আর যদি আপনি সে কথার উপযুক্ত না হন, সে আপনাকে যা বলেছে আপনি তেমন না হন তখনও তো শুকরিয়া আদায় করবেন এভাবে যে, সে অন্যায়ভাবে আমাকে একথা বলার দ্বারা আমার লাভ হয়েছে। কারণ, এতে সে আমার গুনাহগুলো তার কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। অথবা ভাববেন, আসলে তো আমি খারাপই। সে এখন যে দোষটির কথা বলেছে সেটা হয়ত আমার মাঝে নেই, কিন্তু সেটা ব্যতীত আরো কত দোষ আমার মধ্যে আছে তার কোনো হিসাব নেই। নিজের দোষ নিজের কাছে ধরা পড়ে না। প্রত্যেকের বগলের নীচেই গন্ধ রয়েছে। কিন্তু নিজেরটা নিজের নাকে ধরা পড়ে না। অন্যের নাকে ধরা পড়ে। দুনিয়াতে কি এমন কোনো

মানুষ আছে যে বলতে পারবে আমার মাঝে কোনো দোষ নেই। কেউ বলতে পারবে না। সুতরাং আমি তো কোনো না কোনো দিক থেকে খারাপই। তাই কেউ খারাপ বললে মনে করব খারাপকে খারাপ বলেছে। তাই পেরেশান হব কেন?

বিদআতী ইমামের পিছে নানুতবী (রহ.)-এর নামায আদায়

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-কে বিদআতী সম্প্রদায় গালিগালাজ করত। কাফের পর্যন্ত বলেছে। এক দিন তিনি দিল্লি সফরে যান। সফরসঙ্গী ছিলেন শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসানসহ আরো কয়েকজন। এশার নামাযের পর তাঁরা সকলে শুয়ে পড়েছেন। ঘুমানোর পূর্বে একজন বললেন, আগামীকাল ফজর নামায আমরা দিল্লির অমুক মসজিদে পড়ব। সেখানকার ইমাম সাহেবের কুরআন তিলাওয়াত খুব সুন্দর। আরেকজন বলে উঠলেন, ঐ মসজিদের ইমাম সাহেব বিদআতী। তিনি আমাদের মুরুব্বীদেরকে কাফের বলেন। তার পিছনে নামায পড়তে যাব–এটা কেমন প্রস্তাব! হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) তাদের এ কথাবার্তা শুনেছেনে। কোনো জবাব দেননি। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের আযান হওয়ার পর হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) কামরা থেকে বের হলেন। সঙ্গীরাও হযরতের পিছে পিছে রওনা হলেন। চলতে চলতে হযরত নানুতবী (রহ.) সেই মসজিদে গিয়ে পৌঁছালেন যে মসজিদের ইমাম হযরতকে কাফের বলে ফতুয়া দেয়।

লক্ষ্য করুন, হযরত তার শিষ্যদেরকে কেমন সংশোধনী দিচ্ছেন। মুখে কিছু না বলে বাস্তব সংশোধনী দিচ্ছেন। আগে আগে যাওয়ার কারণে সবাই মসজিদের প্রথম কাতারে জায়গা পেয়েছেন। তখন তো বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। মসজিদের ভিতর তেমন আলো ছিল না। অনেকটা আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। একজন আরেকজনকে ভালোভাবে চেনা যায় না। জামাত শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব যখন মুসল্লিদের দিকে ফিরেছেন তখন কেমন যেন একটা অবস্থা অনুভব করলেন। কতগুলো হক্কানী বুযুর্গ আলেম যদি কোনো অপরিচিত জায়গায় বসে থাকেন তাদেরকে কেউ না চিনলেও তাদের ইলম-আমলের নূর ও দিলের হালতের ভিন্ন একটা প্রভাব সেখানে কাজ করে।

ইমাম সাহেব ভালো করে নজর করে যখন দেখলেন যে, হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) বসে আছেন তখন তাড়াতাড়ি উঠে হযরতের সামনে গেলেন আর কড়জোর করে বারবার বলতে লাগলেন, হযরত আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। হযরত বললেন, তুমি কী অন্যায় করেছ? ইমাম সাহেব বললেন, আমরা আপনাদের সম্পর্কে নানারকম ভুল কথা শুনি। এর প্রেক্ষিতে আপনাদের সম্পর্কে বেয়াদবীমূলক অনেক কথা বলে থাকি। হযরত জবাব দিলেন, এটা তো বেয়াদবীর কথা নয়; বরং আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি আপনার দায়িত্ব পালনের শুকরিয়া আদায় করি। কারণ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আমাদেরও। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি-গালাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া আপনাদের আমাদের সবার ঈমানী দায়িত্ব। আর আপনারা তো আমাদের বিরোধিতা করে সে ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি আমার কাছে কেন ক্ষমা চাচ্ছেন।

ইমাম সাহেবে আবারও বললেন, না, হুজুর আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত বললেন, আপনারা যা করছেন তা ভালো কাজ। তবে আপনাদেরকে এতটুকু কথা বলতে চাই যে, আমাদের নামে যেসব কথা রটানো হচ্ছে তা সঠিক কিনা। আমাদের সম্পর্কে প্রচার করা হচ্ছে যে, আমরা নবীর দুশমন, নবীকে মহব্বত করি না, নবীর শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলি—আপনাদের দায়িত্ব ছিল এগুলো একটু বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখা। আসলে এগুলো সঠিক কি-না, যাচাই করে দেখার দরকার ছিল। অন্যথায় নবীর দুশমনদের বিরোধিতা তো আমাদের সবাইকেই করতে হবে।

এবার চিন্তা করুন, দিল কেমন পরিষ্কার হলে এমন ব্যবহার দেখানো সম্ভব। আজ তো দীনের কাজেও আমাদের পরিশুদ্ধতা নেই। নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও কোন্দল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক দল হলে তো কথাই নেই। একদল অন্য দলকে সহ্য করতে পারে না। আর অরাজনৈতিক দল হলেও এ গ্রুপ ঐ গ্রুপকে দেখতে পারে না। অথচ সকলে দীন নিয়ে মেহনত করে। সব গণ্ডগোল দিলের

মধ্যে। যদি বাস্তবেই দিল পরিশুদ্ধ হত তাহলে চিত্র অন্যরকম হত। তখন এসব দলাদলি ও বিষোদগারের নাম-গন্ধও থাকত না।

দিল সংশোধনে সিরিয়াস হতে হবে

এজন্য দোস্ত! দুনিয়া থেকে যাওয়ার পূর্বে দিলের ইসলাহ ও সংশোধন করে যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আর আল্লাহ পাকের ফায়সালা দিলের অবস্থার উপর হবে। আল্লাহ পাক বলেন– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى যে দিলের সংশোধন করেছে সে সফলকাম। সফলকাম হওয়ার জন্য নিজের দিল নিয়ে ফিকির করতে হবে। আমরা তো অনেক কিছু নিয়ে ফিকির করি। দোকানদার দোকান নিয়ে ফিকির করে, জমিনওয়ালা জমিন নিয়ে ফিকির করে। ফিকির ছাড়া জমিন থেকে ফসল আসবে না, দোকান থেকে মুনাফা আসবে না। কিন্তু বড় আফসোসের বিষয় হল, আমরা এসব বিষয়কে ফিকিরের বস্তু মনে করি এবং এ ব্যাপারে ফিকির করা জরুরী মনে করি; কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিকিরের বিষয় রয়েছে, যেটা নিয়ে আসলেই আমার খুব চিন্তিত হওয়া দরকার।

সেটা কী?

সেটা হল আমার নফসের ইসলাহ হল কি-না, আমি আসলে বাস্তব মানুষ হলাম কি-না। নফসের ইসলাহ হলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। অন্যথায় কুকুরের মতো অবস্থা হবে। আমাদের সমাজেও কিন্তু আত্মশুদ্ধিহীন এসব মানুষকে কুকুর বলা হয়। কেউ যদি হঠাৎ রাগ হয়ে গালাগালি করে তখন অন্যজন বলে, তুই কুকুরের মতো এমন হৈচৈ শুরু করলি কেন? অথচ সে মানুষ। মানুষ হওয়ার পরও কুকুরের মতো বলা হয়েছে। অনেককে বলদের মতো, গরুর মতো, হাতির মতো ইত্যাদিও বলতে শোনা যায়।

কেন বলে?

বলে এ জন্য যে, তার মাঝে ইনসানিয়ত ও মানবতার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। উভয়ের মাঝেই মানবতার অভাব। যে বলছে তার মাঝেও অভাব, যাকে বলা হচ্ছে তার মাঝেও অভাব। যে বলছে সে বলতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করছে, অন্যকে তুচ্ছ করছে। আর যাকে বলা হচ্ছে তার

মাঝে মানুষের গুণের অভাব দেখা দিয়েছে বলেই অপরজন এমনটি বলতে বাধ্য হয়েছে।

তাই বলি, যতক্ষণ পর্যন্ত নফস পরিশুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মাঝে বাস্তব মনুষত্ব আসবে না। মানবতা তো আসবে নফসের যথাযথ সংশোধনের দ্বারা। নফসের ইসলাহ দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। *

---

* ২২/২/২০০৮ ঈ. তারিখে ফুলছোঁয়ার মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান।

আত্মশুদ্ধির ফিকির

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فقد قال النبى ﷺ : مَنْ بَطَّاَبِه عَمَلُه لَمْ يُسْرِعْ بِه نَسَبُه.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

বংশগৌরব ছেড়ে আমলের ময়দানে সাধনা কর

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার আমল তাকে পিছিয়ে রেখেছে তার বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, আমল ভালো হলে বংশও কাজে আসবে। আমল খারাপ হলে বংশের ফুটানিতে কোনো কাজ হবে না। হযরত শেখ সা'দী রহ. বলেন,

چوں کنعان را طبیعت بے هنر بود
پیمبر زادگی قدرش نیفزود

হযরত নূহ (আ.) কত জলীলুল কদর নবী ছিলেন। তাঁর সন্তান কেনআন ছিল পথহারা বেঈমান। নিজের ভিতরে যোগ্যতা ভালো ছিল না।

পয়গাম্বর তথা নূহ (আ.)-এর ছেলে হওয়াটা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি। কারণ কী? কারণ হাদীসে বলা হয়েছে-

مَنْ بَطَّاَبِه عَمَلُه لَمْ يُسْرِعْ بِه نَسَبُه

যার আমল তাকে পিঁছিয়ে দেয় বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

তাই আমাদেরকে বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। বংশগৌরব ছেড়ে আমলের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহর আরেফ আল্লামা আবদুর রহমান জামী রহ. নিজেকে সম্বোধন বলেন–

بندۂ عشق شدی ترك نسب كن جامي
که دریں راه فلاں ابن فلاں چیزے نیست

হে জামী! যদি তুমি আল্লাহপাকের ইশক ও মহব্বত পেতে চাও, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও, তাহলে বংশের ফুটানি ছাড়ো। আমি অমুক বংশের, আমার বাবা অমুক, আমার দাদা অমুক–এসব বিবৃতি ছাড়। আল্লাহকে পেতে হলে সব ধরনের ফুটানি ছাড়তে হবে। তুমি নিজেকে কতটুকু তৈরি করেছো এটাই দেখার বিষয়।

খাজা আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর, আপন চাচা। কত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য কত চেষ্টা করেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ফলাফল কী? হেদায়েত নসীব হয়েছে? হয়নি। কারণ ভিতরটা ভালো ছিল না। নবীকে অবশ্যই মহব্বত করেছেন। কিন্তু নবী হিসেবে নয়; ভাতিজা

হিসেবে, বংশের গৌরব হিসেবে। এজন্য মহব্বত করেননি যে, তিনি আল্লাহ পাকের রাসূল। আমি আল্লাহপাকের প্রিয় হতে হলে, পরকালে মুক্তি পেতে হলে তাঁকে রাসূল হিসেবে বরণ করতে হবে—এ বিষয়টি জরুরী মনে করেননি।

মানুষ কাকে বলে

দোস্ত! মানুষ হতে হলে মেহনত করতে হবে। পীর সাহেব হওয়া সহজ, মুফতী হওয়া সহজ, মুহাদ্দিস হওয়া সহজ, শাইখুল হাদীস হওয়া সহজ, মাওলানা হওয়া সহজ, সব হওয়া সহজ। শুধু কঠিন, কঠিন নয় মহা কঠিন হল মানুষ হওয়া।

মানুষ তো সে যার দ্বারা খালেক ও মাখলুক সবার হক আদায় হয়। মানুষ তো সে, যে আল্লাহপাকের হুকুমগুলো যথাযথভাবে আদায় করছে, নবীজির হক যথাযথ আদায় করছে। মা-বাবার হক যথাযথ আদায় করছে, বড়দের আদায় করছে, ছোটদের হক যথাযথভাবে আদায় করছে, প্রতিবেশির হক যথাযথ আদায় করছে, স্ত্রীর হক আদায় করছে, সন্তানের হক আদায় করছে। সকলের হক আদায় করতে পারা সহজ বিষয় নয়। অনেক কঠিন। এ সবগুলো হক যথাযথভাবে যে পালন করতে পারে সে মানুষ। অনেক মানুষ এমন আছে যারা বাইরে খুব ভালো কিন্তু ঘরের মধ্যে অনেক খারাপ। ঘরের বিবি-বাচ্চার সাথে দুর্ব্যবহার করে আর বাইরে খুব বুযুর্গী জাহির করে। অনেকে আছে ভিতরে খুব ভালো কিন্তু বাইরে ভালো নয়। অনেকে এমন আছে যার সবদিক মোটামুটি ভালো কিন্তু মাওলায়েপাকের সাথে সম্পর্ক খুব খারাপ, নবীজির সাথে সম্পর্ক খারাপ। নবীর ওয়ারিশদের সাথে সম্পর্ক খারাপ। এরা কেউ প্রকৃত মানুষ নয়।

তাই বলি, মানুষ হওয়া খুব কঠিন। আর এর জন্য মেহনতের প্রয়োজন। মেহনত ছাড়া মানুষ হওয়া যায় না।

بے مربی کئے توا ند طفل دانشور شدن
قطره را ممکن نبا شد بے صدف گوهر شدن

শিশু কি মুরব্বী ছাড়া হতে পারে জ্ঞানী/
বৃষ্টির ফোঁটা ঝিনুক ছাড়া হয় না কভু মণি

শাহ আবু সাঈদ গাংগুহী (রহ.)-এর আত্মশুদ্ধির ঘটনা

আমাদের এ তরীকার বুযুর্গদের মধ্যে একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন আবু সাঈদ গাংগুহী (রহ.)। ভারতের গাংগুহতে তাঁর মাজার রয়েছে। তিনি হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)-এর নাতি ছিলেন। নাতি আবু সাঈদের হৃদয়ে দাদা আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহীর রুহানী সম্পদ অর্জন করার প্রেরণা জাগল। দাদা তো ছিলেন বড় মাপের পীর। কিন্তু নাতি হয়ত তখন অল্প বয়সী ছিলেন। তাই দাদার কাছ থেকে সে সম্পদটি অর্জন করতে পারেননি। বড় হওয়ার পর যখন বুঝতে পেরেছেন তখন ঠিকই তা অর্জন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছেন। এজন্য খুঁজতে লাগলেন দাদার এ সম্পদ কার কাছে রাখা আছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, আফগানিস্তানের বলখ অঞ্চলে দাদার এক বিশিষ্ট খলীফা আছেন, যার নাম শাহ নিজামুদ্দীন বলখী। মনস্থ করলেন তার দরবারে যাবেন। কাল বিলম্ব না করে রওয়ানা হয়ে গেলেন বলখের উদ্দেশ্যে। শাহ নিজামুদ্দীন বলখী আপন পীরের নাতির আগমনের সংবাদ শুনে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে এলেন। অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাকে বরণ করলেন।

পীরের নাতিকে কুরছীতে বসালেন এবং নিজে খাদেমদের সঙ্গে নিচে বসে পড়লেন। কুশল-বিনিময় করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত কষ্ট করে সফর করে এখানে এলেন, আমাদেরকে বললেই তো আমরা আপনার দরবারে হাজির হতাম। তো মেহেরবানী করে বলবেন কি, কেন আপনি এখানে এলেন? আবু সাঈদ গাংগুহী জবাব দিলেন-

میراث پدر خواهم

আমি এখানে এসেছি আমার দাদার মিরাস নেয়ার জন্য।

অর্থাৎ আমার দাদা শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.) আপনাকে যে সম্পদ দিয়ে গেছেন তা নেয়ার জন্য এসেছি।

দোস্ত! সেটা কী সম্পদ ছিল? সেটা ছিল রুহের সম্পদ। আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বতের সম্পদ। এটা সীনা থেকে সীনায় স্থানান্তরিত হয়।

একথা শোনা মাত্রই শাহ নিজামুদ্দীন (রহ.) চেহারার ভাব পরিবর্তন করে ধমকের সুরে বললেন, তাহলে জলদী আসন থেকে নাম এবং নিচে

বস। আবু সাঈদ নেমে পড়লেন এবং শায়খ বলখী স্বীয় আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, দাদার মীরাছ নিতে হলে মেহনত করতে হবে। যাও, মসজিদের মুসল্লীদের ওযুর পানি গরম কর।

সেসব অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে। তাই শীতের সময় মসজিদের মধ্যে অযুর পানি গরম করতে হয়। না হয় ওযু করা সম্ভব নয়। এখন তো বিদ্যুতের সাহায্যে মেশিনের মাধ্যমে পানি গরম করা হয়। তখন লাকড়ি জ্বালিয়ে গরম করতে হত। লক্ষ করুন, কত ইজ্জত দিয়ে পীরের নাতিকে বরণ করলেন এবং নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে তাকে সেখানে বসালেন। কিন্তু যখন বলেছেন দাদার মীরাছ চাই সাথে সাথে আচরণ পরিবর্তন করে ফেলেছেন। এখন নির্দেশ হল মসজিদের মুসল্লীদের ওযুর পানি গরম করা। কী খাচ্ছে, কোথায় থাকছে–এসবের কোনো খবর নেই। পীর সাহেব কিন্তু সঠিক কাজ করছেন। তিনি তাকে প্রকৃত মানুষ বানাচ্ছেন। সে মানুষ হতে এসেছে তো তাকে মানুষ বানাতে হবে। আপনারা তো মনে করবেন পীর সাহেব অমানবিক কাজ করছেন। না, না, সে যে উদ্দেশ্যে এসেছে পীর সাহেব তাকে সে উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার পথেই নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আগমনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে তিনি মূল্যায়ন করছেন। সে তো এসেছে তাঁর দাদার মতো মানুষ হতে, তাই তাকে মানুষ বানাতে হবে। আর মানুষ বানানোর জন্য যা যা করণীয় তা তাকে করতেই হবে।

প্রথমে মনে করেছিলেন তিনি বেড়াতে এসেছেন তাই তাকে মেহমানের মতো ইজ্জত করেছেন। পরে যখন জানতে পেলেন তার আগমনের উদ্দেশ্য ভিন্ন রকম, সে তো এসেছে মানবমণ্ডলীর গলার হার হতে তাই তাকে আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। আগুনে পুড়িয়ে খাদ দূর করতে হবে। তার মধ্যে খাদ অনেক রয়েছে। আমি অমুকের নাতি- এটা সাধারণ খাদ নয়। এ খাদ দূর করার জন্য প্রথমে পানি গরম করার কাজে নিযুক্ত করেন। এভাবে ছয় মাস পর্যন্ত পানি গরমের কাজে লাগিয়ে রাখেন। কী খাচ্ছে, কী পরছে, কোথায় থাকছে –এসবের কোনো খবর নেই। ডিউটি ঠিক মত পালিত হচ্ছে কি-না কেবল এতটুকু খবর রাখেন। এখন আবু সাঈদ মজলিসে হাজির হলে শায়েখ তার দিকে একটুও চোখ তুলে তাকান না। কে এল আর কোথায় বসল এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

এবার একটু পরীক্ষা করে দেখবেন যে, খাদ কী পরিমাণ কমেছে।

শায়েখ মেথরকে বলে দিলেন, আজ ময়লা নিয়ে যাওয়ার সময় আবু সাঈদের কাছ দিয়ে এমনভাবে যাবে যে তার গায়ে ময়লার একটু বাতাস লাগে। ঠিকই মেথর শায়খের নির্দেশ মত ময়লা নিয়ে গেল। এতে আবু সাঈদের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। আর মুখ দিয়ে বললেন- اگر هوتا گنگوہ
গাঙ্গুহ হলে দেখিয়ে দিতাম!

মেথর কাজ শেষ করে শায়খের কাছে এসে ঘটনার বিবরণ পেশ করল। শায়খ বললেন, এখনও খাইট রয়ে গেছে। অহংকার ও গর্বের জীবাণু রয়ে গেছে। এখনও মানুষ হয়ে সারেনি।

এরপর ঐ কাজেই নিয়োজিত রাখলেন। কয়েক মাস পর মেথরকে নির্দেশ দিলেন আজ তেমনই করবে; বরং ইচ্ছা করে কিছু ময়লা তার গায়ে ফেলে দিয়ে লক্ষ করবে সে কী বলে? মেথর তাই করল। এবার আবু সাঈদ মুখে কিছু বললেন না। তবে বাঁকা চোখে তার দিকে একটু তাকালেন। তারপর মাথা নিচু করে নীরবে বসে রইলেন। মেথর শায়খের কাছে এসে বললেন, আজ তো আবু সাঈদ কিছু বলেনি, তবে বাঁকা চোখে একটু তাকিয়ে ফের নীরব হয়ে গেছে। শায়খ বললেন, এখনও কিছু জীবাণু রয়ে গেছে।

কয়েক মাস এভাবেই চলল। এবার মেথরকে নির্দেশ দিলেন, আজ ময়লার পাত্রটি নিয়ে তার পাশ দিয়ে এমনভাবে যাবে যে, তার শরীরের সাথে ধাক্কা লেগে ময়লার পাত্রটি তার গায়ের উপর পড়ে যায়। মেথর তাই করল। কিন্তু তত দিনে আবু সাঈদ যা হাছিল করার তা হাছিল করে ফেলেছেন। তাই ঘাবড়ে গিয়ে হাত জোর করে বলতে লাগলেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আপনি পড়ে গেলেন। আমি এখানে না থাকলে হয়ত এমনটি হত না। কোথাও আঘাত পাননি তো! একথা বলতে বলতে পড়ে যাওয়া ময়লাগুলো তাড়াতাড়ি পাত্রে উঠিয়ে দিলেন। এবার মেথর শায়খের কাছে এসে বলল, আজ তো ঘটনা অন্য রকম ঘটেছে। রাগ হওয়ার বদলে উল্টো আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে এবং পতিত ময়লাগুলো নিজেই পাত্রে উঠিয়ে দিয়েছে। শায়খ বললেন, এবার কাজ হয়েছে। দাদার মীরাছ পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। তবে দেওয়ার পর তা ধরে রাখতে পারবে কি

না এটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সম্পদ হাছিল করা সহজ কিন্তু ধরে রাখা কঠিন। তাই আরও পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

শায়েখে বলখী শিকার করতেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে হরিণ শিকার করতেন। কালবে মুয়াল্লাম তথা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিলে সে হরিণ ইত্যাদি শিকার করে আনলে এটা খাওয়া যায়। এমনিতেই কুকুর খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। আর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। শায়েখ বলখী (রহ.) আবু সাঈদকে ডেকে বললেন, আজ শিকারে যেতে হবে। শিকারের কুকুরগুলো প্রস্তুত রাখবে। আর শিকারে বের হওয়ার পর কুকুরগুলোকে শক্তভাবে ধরে রাখবে। তোমার হাত থেকে যেন ছুটে না যায়। শায়খ আরো কিছু খাদেমসহ ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন। আবু সাঈদ শিকারী কুকুরগুলোর শিকল হাতে ধারণ করে চলতে লাগলেন। কুকুরগুলো ছিল তুখোড় শিকারী। খেয়ে দেয়ে শক্তিশালী আর আবু সাঈদ বেচারা ছিলেন দীর্ঘ সাধনার ফলে দুর্বল। তাই তিনি কুকুরগুলো সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি শিকলটি তার কোমরে বেঁধে নিলেন। শিকার নজর পড়তেই কুকুরগুলো সেদিকে দ্রুত বেগে ছুটে চলল। আবু সাঈদ মাটিতে পড়ে গেলেন। কুকুরগুলো তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। ইট, পাথর, কাঁটা ইত্যাদির আঘাতে গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি উহ্ শব্দটুকু করেননি। অপর একজন খাদেম এসে কুকুরগুলোকে থামালেন এবং আবু সাঈদকে মাটি থেকে উঠিয়ে আনলেন। আবু সাঈদ ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। কারণ, হযরত যদি রাগ হয়ে বলেন, হুকুম পালনে অবহেলা হল কেন? কুকুরগুলোকে সামলাতে পারলে না কেন? শায়খের তো উদ্দেশ্য ছিল তার পরীক্ষা নেয়া।

সে রাতেই শায়খ নেজামুদ্দীন বলখী স্বীয় মুরর্শিদ শায়খ আব্দুল কুদ্দুস (রহ.)কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি দুঃখ করে বলছেন- নেজামুদ্দীন! আমি কি তোমার দ্বারা এত কঠিন পরীক্ষা নিয়েছিলাম, যে পরিমাণ পরীক্ষা তুমি আমার নাতিকে করছ? সকাল হওয়া মাত্রই শাহ নেজামুদ্দীন (রহ.) আবু সাঈদকে ডেকে এনে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি হিন্দুস্তান থেকে খান্দানে চিশতিয়ার যে ফয়েজ বরকত নিয়ে এসেছিলাম, তুমি এখন সে ফয়েজ আবার হিন্দুস্তানে নিয়ে যাও।

আবু সাঈদ শায়খের তাওয়াজ্জুহ পেয়ে গেলেন। দাদার মীরাছ হাসিল করলেন। মানুষের মতো মানুষ হলেন তো এক মানুষের মাধ্যমে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ 'মানুষ' হয়েছেন।

মানুষ হতে পারলে আল্লাহর হক আদায় হয় এবং সমস্ত মাখলুকের হক আদায় হয়। মায়ের হক আদায় হয়, বাবার হক আদায় হয়, ভাই-বোনের হক আদায় হয়। বড়-ছোটর হক আদায় হয়। প্রত্যেকটি মানুষের হক আদায় হয়। অন্যান্য মুসলমানের হক আদায় হয়, পশু-পাখির হক আদায় হয়। সদা-সর্বদা সে এ চিন্তায় বিভোর থাকে যে, কারো কোনো হকের কারণে আমাকে পাকড়াও করা হবে কি না।

আত্মশুদ্ধির জন্য রিকসা চালানো

এক লোক ঢাকা শহরে রিকসা চালায়। মুখে দাড়ি। তার রিকসায় উঠেছেন ঢাকার দুইজন আলেম। তারা রিকসায় বসে ইলমী আলোচনা করছেন। তাদের আলোচনা শুনে রিকসার চালক মাঝে মধ্যে মাথা নাড়ে। মনে হয় সে খুব মজা পাচ্ছে। যাত্রীদের সন্দেহ জাগল। জিজ্ঞেস করলেন,

: আপনার বাড়ী কোথায়?

: আমার বাড়ী মোমেনশাহী।

: আপনি কী করেন?

: এই তো রিকশা চালাই।

: আপনি আর কিছু করেন কি-না? আপনার অন্য কোনো পরিচয় আছে কী?

: আমার অন্য কোনো পরিচয় নেই।

: আপনি কি আলেম, মাদরাসায় পড়েছেন?

এখন তো না বলে পারেন না। তাই স্বীকার করে বললেন, হ্যাঁ, আমি মাদরাসায় পড়েছি।

: রিকসা চালাচ্ছেন কেন?

বললেন : আমার শায়খ হলেন সিলেটের মাওলানা নুরুদ্দীন গাওহারপুরী (রহ.)। আমার একটা বদ স্বভাব হল আমি অল্পতেই রাগান্বিত হয়ে যাই। আর মানুষ রাগান্বিত হয়ে গেলে যা ইচ্ছা তাই

বলে। এ রোগের চিকিৎসা বিভিন্নভাবে হয়েছে। কিন্তু আমার রোগ সারে না। এজন্য হুজুর বলেছেন ঢাকা শহরে গিয়ে রিকসা চালাও।

আর রিকসা চালাতে হলে তো রিকসা চালানো শিখতে হবে। তাই লোকটি রিকসা চালানো শিখেছেন। তারপর রিকসা চালাচ্ছেন।

পীর সাহেব এ নির্দেশ দেয়ার কারণ কী? এর কারণ হল তিনি জানেন ঢাকা শহরে রিকসা চালাতে হলে মানুষের কত গালি যে শুনতে হয়। এ মুজাহাদার মাধ্যমে পীর সাহেব তাকে সবর ও সহনশীলতার সবক দিচ্ছেন। এসব কেন? মানুষ হওয়ার জন্য। মানুষ হতে হলে মেহনত লাগবেই। মেহনত ছাড়া হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করুন। *

---

* ১৩/৩/২০১০ ঈ. ফুলছোঁয়া বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত আখেরী বয়ান

আল্লাহ আমার রব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .[38]

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .[39]

صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ার দিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন। শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ, দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হল দীন। এ দীনের নিসবতে এবং এ দীনের মহব্বতে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।

আল্লাহপাক যা চান তাই হয়

দুই দিন ব্যাপী এই মজলিস প্রায় সমাপ্তির পথে। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আমাদের এই মজলিস শেষ হয়ে যাবে। আবার যদি আল্লাহপাক তৌফিক দেন, সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে হয়তবা এক বছর পর আবার জমায়েত হতে পারব। আমাদের তো আসার ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু আল্লাহপাকের যা ইচ্ছা তাই হবে। আমাদের চাওয়ায় কিছু আসে যায় না।

আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহ.) 'মহব্বতনামা' নামক একটি কিতাব লিখেছেন। সেখানে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একটি অধ্যায় রয়েছে তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ বিষয়ক। ছেলেকে ভালো হওয়ার জন্য দীনদার বাবা হিসেবে যা বলার তা বলেছেন। সব কিছু বলার পর শেষে একটি কথা লিখেছেন–

৩৮. সূরা আনকাবুত : ৬৪
৩৯. সূরা আলে-ইমরান : ১০৩

چوں دریائے قِدَم جنبش نماید
زبانگِ غوكِ بے ساماں چه زاید

অর্থাৎ ব্যাঙের ডাকে যেমন মেঘ আসে না, তেমনি আমার এ উপদেশ-নসীহতসমগ্রও ব্যাঙের ডাকাডাকির মত। আমার উপদেশেও কিছু হবে না। ব্যাঙের ডাকাডাকিতে মেঘ আসে না; বরং আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় যখন ঢেউ খেলে তখন মেঘ আসে। বৃষ্টিপাত হয়। তো হবে ততটুকু যতটুকু আল্লাহপাক চাইবেন। তিনি তো সীমাহীন বেনিয়াজ সত্তা, فَعَّالٌ لِّمَايُرِيْدُ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

نتواں وصفِ تو گفتن که تو در وصف نه گنجي
نتواں شرح تو کردن که تو در شرح نیائی
اَحَدٌ لیس کمثلی صَمَدٌ لَیْسَ کَفضلی
لمن الملك تو گوئی که سزاور خدائی

"হে মাওলা! তোমার গুণ বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা তুমি বর্ণনার ঊর্ধ্বে। তোমার ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা তুমি ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। তুমি একক ও বেনিয়াজ, তোমার মত কেউ নেই। তুমি রাজাধিরাজ। কেয়ামতের ময়দানে তুমি প্রশ্ন করবে আজকের রাজত্ব কার? তুমি নিজেই জবাব দিবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর।"

দোস্ত! আল্লাহপাক খুবই বেনিয়াজ। তিনি আমাদের কান্নাকাটিরও এতটুকু মুহতাজ নন। আমাদের কান্নাকাটি দ্বারা তাঁর খোদায়িত্বের একটুও বাড়বে না। তবে আমাদের তো আল্লাহর দরবার ছাড়া আর কোনো দরবার নেই। আমাদের দরবার তো কেবল একটি।

আমার কাজ ক্ষমা চাওয়া

کھولے یا نه کھولے در اس پر تیری کیوں نظر
تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। দরজা খুলবে কি খুলবে না—এটা ভিতরওয়ালার ব্যাপার। আমার কাজ তো কেবল 'মাফ করো' 'মাফ করো' শব্দ দিয়ে তা খটখট করা।

যদি আরেকটা দরজা থাকত তাহলে সেখানে কড়া নাড়তাম, ওটা নক করতাম, ওটা খোলার চেষ্টা চালাতাম। আমাদের তো আর কোনো দরজা নেই। দরজা তো একটাই।

وحده لاشريك له * وحده لاشريك له

দরবার মাত্রই একটা। এটা খুললেও ঠিক আছে, না খুললেও ঠিক আছে। কোনো এক বুযুর্গ বলেন–

اگر بخشے زهے قسمت نه بخشے تو شکایت کیا
سر تسلیم خم هے جو مزا ج یار میں آئے

যদি আল্লাহ ক্ষমা করেন তো কিসমত ভালো। আর যদি ক্ষমা নাও করেন তাহলে কিছু করার নেই।

হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন–

اگر بخشے زهے یاری نه بخشے تو کروں زاری
که اس بنده کی خواری کیوں مزاج یار میں آئی

ওগো মাওলা! আপনি যদি মাফ না করেন তাহলে আমি কান্নাকাটি আরো বাড়িয়ে দিব। কান্না বাড়িয়ে দিব এ কারণে যে, আপনি কেন আমাকে মাফ করবেন না। আমাকে কেন আপনার পছন্দ হয় না।

পটিয়ার মুফতী সাহেব (রহ.) যখন জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছেন তখন কেঁদে কেঁদে বলতেন–

زندگی گذری تیری دیدار کی امیدوں میں
اب تو پیری آگئی هے رحم فرما ائے خدا
جسم سے طاقت گئی هے قلب سے همت گئی
هے دماغ آفت رسیده رحم فرما ائے خدا

হে খোদা! সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলাম আপনাকে দেখার আশায়। এখন তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, তাই আমার উপর রহম করো। দেহ থেকে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, হৃদয় থেকে সাহস বিদায় নিয়েছে। মস্তিষ্কে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। তোমার দীদারের আশায় সব কিছু ক্ষয় করেছি। আমাকে মাহরুম করো না। আমার প্রতি তোমার খাস রহমত বর্ষণ করো।

হাফেয শিরাজী (রহ.) বলেন–

عزمِ دیدارِ تو دارد جانِ برلب آمده

باز گردد یا بر آید چیست فرمانِ شما
گرچه دو ریم از بساط قرب، همت دور نیست
بندۂ شاهِ شمائیم و ثنا خوانِ شما

মাওলা! আপনার দীদারের আকাঙ্খায় আমার জান একবার ঠোঁটে চলে এসেছে। বেরিয়ে যাবে নাকি ভিতরে যাবে—এ ব্যাপারে আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

যদিও তোমার নিকটবর্তী হতে পারিনি কিন্তু সাহসহারা হইনি। 'আমি তোমার বান্দা' এ কথা বলে গুণগুণ করতে থাকব।

দোস্ত! বান্দার এ আশাটি অবশ্যই পূরণ হবে। এ আশা পূরণের জন্য আল্লাহপাক জান্নাত বানিয়েছেন। উপযুক্ত জায়গা বানিয়েছেন। উপযুক্ত চোখ বানিয়েছেন। চোখের উপযুক্ত পাওয়ার দিয়েছেন। উপযুক্ত শক্তি দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হল উপযুক্ত শক্তি অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা-মেহনত করা।

দোস্ত! দোয়া করুন, আল্লাহপাক যেন আমাদের এ দু'দিনের প্রোগ্রামকে ভরপুর কামিয়াবী দান করেন, আমাদের সকলের নাজাতের সামান বানিয়ে দেন। মাওলার রহমতের সাগর থেকে যদি দুয়েকটি ফোঁটাও পেয়ে যাই তাহলে আমাদের মজলিস সফল। মাওলার এশক-মহব্বতের দরিয়া থেকে এক দুই ফোঁটা পেলেও আমরা ধন্য।

আমাদেরকে এ পর্যন্ত তো মাওলাপাকই এনে পৌঁছিয়েছেন। সামনে কী হবে, কিছুই জানি না। মরব কি বাঁচব, মাদরাসা-মসজিদের উন্নতি হবে কি অবনতি হবে–কিছুই জানি না। আমাদের হালতের অবনতি হবে, নাকি উন্নতি হবে–কিছুই জানি না। সব মাওলায়েপাক জানেন। কারণ তিনি হলেন আমাদের রব।

রব কাকে বলে

রব শব্দের বাংলা হল প্রতিপালক। শব্দটি ক্ষুদ্র হলেও এর মর্ম অনেক ব্যাপক। রব ও প্রতিপালক বলা হয় যিনি কোনো বস্তুকে ধীরে ধীরে তার পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। যেমন একটি গাছকে তার অঙ্কুর থেকে মহীরুহে পরিণত করা এবং একজন মানুষকে তার মায়ের গর্ভ থেকে পরিপূর্ণ মানবে পরিণত করার পথে যাবতীয় আয়োজন ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করা। যিনি এ ব্যবস্থা করেন তিনিই রব। অর্থাৎ যার যখন

যেটা দরকার তখন সেটা দিয়ে যিনি লালন-পালন করেন তিনিই হলেন রব। আগামীকাল আমার কী লাগবে, আমি বলতে পারি না। শুধুই মাওলায়েপাক জানেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন। কেননা তিনি হলেন আমাদের রব।

এ মুহূর্তে আল্লাহপাক আমাকে আপনাকে কত রকমের বিপদাপদ থেকে হেফাজত করে রেখেছেন। এটা শুধু মাওলায়েপাক জানেন আর কেউ জানেন না। রাতে আমরা ঘুমিয়ে যাই। ঘুম আর মরণ সমান। ঘুমের মধ্যে সাপে কাটতে পারে, বিচ্ছু কামড় দিতে পারে, মাথার উপর যে বৈদ্যুতিক পাখাটি ঘুরছে সেটা খুলে পড়তে পারে। আরো অনেক রকমের বিপদ ঘটতে পারে। মাওলায়ে পাক আমাদেরকে সব কিছু থেকে হেফাজত করেন।

کار ساز ِ ما بساز ِ کار ما
فکر ِ ما در کار ِ ما آزار ِ ما
আল্লাহ সদা লিপ্ত থাকেন মোদের মঙ্গল কামনায়
আমরা মানুষ আছি বিভোর অকল্যাণ সব ভাবনায়।

দোস্ত! আমরা কাউকে যত আদর করি তা কিছুতেই আল্লাহপাকের আদরের সমান হবে না। মনে করুন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে এত বেশি আদর করে যে, দুনিয়ার কেউ তাকে এত আদর করে না। ঐ স্বামী তার স্ত্রীর সর্বপ্রকার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে। সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তাই বলে কি সব সময় স্ত্রীকে চোখের সামনে রাখতে পারে? পারে না। মায়ের কাছে সন্তান অনেক আদরের। সব সময় সন্তানকে চোখের সমানে রাখতে চায়। তাই বলে কি সবসময় সন্তানকে চোখের সামনে রাখতে পারে? পারে না। কোনো না কোনো প্রয়োজনে চোখের আড়াল হতেই হয়।

পক্ষান্তরে মাওলায়েপাকের দৃষ্টি প্রতিটি মুহূর্তে আমার দিকে নিবদ্ধ। মাওলায়েপাক প্রতিটি সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেই মুহূর্তে আমরা মাওলায়েপাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যাই ওই মুহূর্তেও মাওলায়েপাক রহমতের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এক সেকেন্ডের জন্য তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নেন না।

এমন মেহেরবান মাওলাকে চিনলাম না। মাকে চিনলাম, বাবাকে চিনলাম, সন্তানকে চিনলাম, বন্ধুকে চিনলাম, কিন্তু যাকে সবচেয়ে বেশি চেনা দরকার তাকে চিনলাম না।

وفا آموختی از من و کار دیگراں کردی
ربودی جو ھر ازمن نثار دیگراں کردی
ভালোবাসা মায়া-মমতা দিলেন তোমায় খোদ প্রভু
ভালোবাসছো কাকে একটিবারও ভেবেছো কি কভু

দুনিয়াতে কত মানুষের জন্য চোখের পানি ফেললাম। কিন্তু মাওলার জন্য কয় ফোঁটা পানি ফেলেছি।

চোখ কে দিয়েছেন? যেই মহব্বতের টানে চোখের পানি ফেলি সে মহব্বতের অনুভূতিটা কে দিয়েছেন? যে অন্তর দিয়ে মহব্বত করি ওই অন্তরটা কে দিয়েছেন? মাওলা দিয়েছেন। ঐ মাওলার জন্য কেন আমার দিল কাঁদে না? ঐ মাওলার জন্য কেন চোখের পানি আসে না? ঐ মাওলার জন্য কেন ঘুম নষ্ট করি না?

পৃথিবীতে যদি কারো জন্য চোখের পানি ফেলতেই হয়, তাহলে আমার মাওলাই তার জন্য উপযুক্ত সত্তা। তাঁর জন্যই চোখের পানি ফেলা উচিত। আমার যদি কারো জন্য ঘুম নষ্ট করে রাত কাটাতে হয় তাহলে আমার মাওলাই তার জন্য একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। তাঁর জন্যই ঘুম নষ্ট করা উচিত। তাঁর জন্যই চোখের পানি ফেলা উচিত।

ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় রাখুন

দোস্ত! আল্লাহপাক আমাদেরকে ঈমানের সূত্রে একত্রিত করেছেন। এটা অনেক মূল্যবান সম্পদ। আমাদের উচিৎ হলো এ ঈমানী সম্পদের কদর করা এবং ঈমানের মেহনত করা। আল্লাহপাক মেহেরবানী করে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর শোকরগুজার হই। কিভাবে শোকরগুজার হওয়া চাই? ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.[40]

৪০. সূরা আলে-ইমরান : ১০৩

''আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পার।''

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈমানের দাওয়াত শুরু করেন তখন ঈমানদার ছিলেন মাত্র একজন। আর সে একজন ঈমানদার হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে। তারপর এ সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। কোনো দিন কমেনি। কেবল বেড়েছে। মক্কার কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়েছে। আগে কাফেররাও হজ করত। তবে তাদের নিয়ম মতো করত। উলঙ্গ হয়ে হজ করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সময় তাদের মাঝে দীনের দাওয়াত দিতেন।

একবার মদীনার বনু কুরায়জার লোকজন হজ করতে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিলেন। তাদের মধ্য থেকে মাশাআল্লাহ বারোজন দাওয়াত কবুল করে ফেলেছেন। এরা মদীনায় যেয়ে দীনের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অল্প কয়জন মানুষ। এরা মদীনার আদি-বাসিন্দা নন। এরা মূলতঃ কওমে সাবার লোক। সেখানে মহামারি দেখা দেয়ার কারণে লোকজন এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। কিছু লোক মদীনায়ও চলে আসে। অনেক লম্বা ইতিহাস। সেটা বলা এখানে দরকার নেই। এরা কয়েকজন মুসলমান হয়ে অন্যদেরকেও দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের দাওয়াতে আরও কিছু লোক মুসলমান হয়েছেন। পরের বছর আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। এবার আরো মানুষ মুসলমান হয়েছেন। অনেক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তারা মদীনায় গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কাজ করেছেন।

এমনকি নবীজিকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছেন। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে যান।

মদীনার আদিবাসী আউস-খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে শতাব্দীকাল ধরে লড়াই-যুদ্ধ চলে আসছিল। কোনো সময় নিষ্পত্তি হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেছেন। আউস-খাযরাজ উভয় বংশের মানুষকেই দীনের দাওয়াত দিলেন। যারা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত। অনেকটা আমাদের দেশের আওয়ামীলীগ আর বি এন পির মত। সব সময় সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে চায়। আল্লাহ সবাইকে ভালো করুন। নবীজির দাওয়াত পেয়ে আউস-খাযরাজের লোকজন মুসলমান হয়ে যান। এ দুই বংশের লোকজন এখন মসজিদে নববীতে আসে। এক সাথে নামায পড়ে। আগে তো একজন আরেকজনকে মারার চক্রান্ত করত। এখন একত্রে নামায পড়ে। একত্রে বসে খানা খায়। একজন অপরজনের সামনে খাবার ঠেলে দেয়। ঈমান গ্রহণের আগে ছিল কাড়াকাড়ি অবস্থা। আর ঈমান গ্রহণের পর হয়েছে ঠেলাঠেলি অবস্থা। এখন দিল বদলে গেছে। এক সময় উভয় গোত্রের সকল মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। এখন তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ নেই। একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এক প্লেটে বসে খাবার খায়। শুধু কি তাই! নিজে কম খায় অপরকে বেশি খেতে দেয়। গোটা সমাজে এমন একটা জান্নাতী পরিবেশ বিরাজ করছে। শয়তানের কাছে এমন জান্নাতী পরিবেশ ভালো লাগে না। শয়তান ওত পেতে রয়েছে আবার কিভাবে তাদেরকে গোমরাহ করে দেয়া যায়। একবার একজন আউস ও একজন খাযরাজীর সাথে কোনো বিষয়ে কথাকাটাকাটি শুরু হয়েছে। এবার শয়তান সুযোগ পেয়েছে। ঝগড়া ভালো জিনিস নয়। এটা শয়তানের হাতিয়ার। শয়তান ঝগড়া বাধিয়ে অনেক কিছু ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এজন্য হাদীসে ঝগড়া না করার অনেক অনেক ফযীলত এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ .[41]

–যে ব্যক্তি ঝগড়া ছেড়ে দিল অথচ সে সত্যপন্থী। এ কারণে ঝগড়া ছেড়ে দিল যে, ঝগড়া করা ভালো নয়। আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর বানিয়ে দেন।

৪১. শরহুস সুন্নাহ লিলবাহায়ি, হাদীস নং-৩৫০২

শয়তানের কাছে শান্তি ভালো লাগে না। সে সর্বদা সুযোগ খোঁজে অশান্তি সৃষ্টি করার। তাই দুই ব্যক্তির ঝগড়াকে কেন্দ্র করে আবার দুই দল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। থমথমে অবস্থা। আবার বুঝি যুদ্ধ লেগে যাবে। এ দৃশ্যটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কত কষ্টদায়ক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কেউ গিয়ে খবর দিলো, হুজুর! জান্নাতী পরিবেশ আবার জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত সেখানে পৌঁছলেন। পৌঁছে এ অবস্থা দেখছেন। কী বলে শান্ত করবেন চিন্তা করছেন। তখন আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করে দিলেন–

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.[42]

আল্লাহপাক বলেন, হে মুসলমান! আমি তোমাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি, ঐ নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং কদর কর। পূর্বের অবস্থা ভুলে যেওনা। ঐ নেয়ামত পেয়ে তোমরা দুশমনি ভুলে একে অপরের ভাই হয়ে গিয়েছিলে। ঐ নেয়ামতটা হল ঈমান। তোমরা তো জাহান্নামের গর্তের কিনারে অবস্থান করছিলে। আল্লাহপাক মেহেরবানী করে তোমাদেরকে সে গর্ত থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঐ অবস্থাটি স্মরণ করো।

বিশাল ঝগড়া ও তুমুল লড়াই ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়ার জন্য এ একটি আয়াতই যথেষ্ট। এ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সম্বোধন করে তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। এ আয়াত শুনে প্রত্যেকে যার যার হাতের লাঠি ও অস্ত্র ফেলে দিল। এ পক্ষও ফেলে দিল, ঐ পক্ষও ফেলে দিল। সকলের চোখ লজ্জায় অবনত হয়ে গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে সকলে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে গেল।

দোস্ত! আল্লাহপাক আমাদেরকে সে ঈমানের সূত্রে এখানে একত্রিত করেছেন। আমরা যেন সে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আল্লাহপাক তৌফিক দান করুন।

৪২. সূরা আলে-ইমরান : ১০৩

ঈমানী সম্পর্কের সুফল

এর ফলাফল কী হবে? তা আল্লাহপাক ভালো জানেন। হাদীসে আছে-

اَلْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْها اخْتَلَفَ .[43]

আমরা তিনটা জগত সম্পর্কে জানি। নাস্তিকরা শুধু একটা সম্পর্কে জানে। বাকিটা জানে না। আমরা জানি দুনিয়াতে আসার আগে আমরা আলমে আরওয়াহে বা রুহের জগতে দীর্ঘকাল ছিলাম। আমরা এটাও জানি এবং বিশ্বাস করি যে, দুনিয়ার হায়াত শেষ হলে আমাদের মৃত্যু হবে। এ মৃত্যু মানে দেহ থেকে রুহ বের হয়ে যাবে। মাটির দেহ তো মাটি হয়ে যাবে কিন্তু রুহটা কখনো মাটি হবে না। এটা আগেও ছিল, মৃত্যুর পরও থাকবে। এটা অনন্তকাল থাকবে। কিসমত ভালো হলে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে যাবে। জান্নাতী হলে আবার আল্লাহপাক দেহ সৃষ্টি করে সেই দেহ ও রুহকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি কিসমত খারাপ হয় (নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর পানাহ, আল্লাহর পানাহ) তাহলে সেই দেহ ও রুহকে জাহান্নামে দিবেন। জাহান্নামী কিংবা জান্নাতী কারোরই আর মৃত্যু হবে না।

যে হাদীসটি তেলাওয়াত করা হল তার মর্ম হল-

রূহের জগতে যাদের সাথে যাদের মিল মহব্বত ভালো ছিল, সেখানে যারা একত্রে জড়ো হয়ে থাকত, দুনিয়াতে এসেও তারা একত্রে থাকে, পরকালেও এমনই হবে। দুয়া করি, আল্লাহপাক যেন আমাদের সাথেও এমন আচরণ করেন। আমীন!

পেছনে তাকাবেন না

বুদ্ধিমান পেছনের দিকে কম তাকায়। সে শুধু সামনের দিকে তাকায়। সামনে অগ্রসর হয়। একজন তার গন্তব্যে যাবে। মনে করুন, ফুলছোঁয়া থেকে বাকিলা বাজারে যাবে। পেছন থেকে কেউ ঢিল মেরেছে। এখন যদি বাজারগামী লোকটি পেছন ফিরে তাকায় এবং যে ঢিল ছুঁড়েছে তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে কি সে বাজারে পৌঁছাতে পারবে? পারবে না। কেননা সে শুধু পেছন নিয়ে ব্যস্ত।

৪৪. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-৭৯৩৫

হাটহাজারীর মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেবকে বিদআতীসম্প্রদায় কাফের বলত। আরো অনেক রকমের ফতুয়া দিত। এতে তিনি বেজার হতেন না। মনে করতেন ওরা বোঝে না, তাই এমন কথা বলে। তাদের জবাবে তিনি একটি সুন্দর কবিতা বলতেন–

ما شاخ درختیم پُر از میوۂ توحید
گر رھگزارہ سنگ زند عار نداریم

অর্থাৎ আমরা হলাম তৌহিদের ফলে ভরপুর একটি বৃক্ষশাখা। রাস্তা দিয়ে চলন্ত মানুষেরা এতে ঢিল ছোঁড়ে। এতে আমাদের শরম লাগে না। গাছের মধ্যে যদি আম পেকে থাকে আর গাছটি যদি কারো মালিকানায় না থাকে তাহলে সারা দিনই মানুষ ঢিল ছোঁড়ে।

তেমনিভাবে দীনের কাজ করতে গেলেও বহু ঝড়-ঝাপটা আসবে। সবকিছু হাসিমুখে বরণ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তো পাথর মারা হয়েছিল। পাথরের আঘাতে তাঁর দেহ মুবারক বেয়ে রক্ত ঝরেছে। তিনি নিজ হাতে সেই রক্ত মুছেছেন আর মুখ দিয়ে বলেছেন–

اَللّٰھُمَّ اھْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّھُمْ لَایَعْلَمُوْنَ

ওগো মাওলা! আমার কওমকে হেদায়েত দান করুন। এরা জানে না। তাই এমন করে। এদেরকে বুঝ দিয়ে দিন, জ্ঞান দিয়ে দিন।

দোস্ত! দুনিয়ার এ হায়াত ক্ষণস্থায়ী। অতীতে যা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা না করে সামনে অগ্রসর হোন।

اس طرح سے طئے کئے ھم منزلیں
گر پڑے پھر اٹھے اٹھکر چلے

একজন লোক বাড়ি যাবে। বৃষ্টিতে পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। হাঁটতে গিয়ে সে পড়ে গেছে। এখন যদি সে বলে যেহেতু পড়ে গেছি তাই আর যাব না। সে কোনো দিন যেতে পারবে না। আরেকজন বলে হোঁচট খেয়েছি তাতে কী হয়েছে। এভাবেই সামনে এগিয়ে যাব। এ লোকটি এক সময় গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। একজন হোঁচট খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে অপরজন যেতে পারেনি।

اس طرح سے طئے کئے ھم منزلیں
گر پڑے پھر اٹھے اٹھکر چلے

অর্থাৎ আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা এভাবে অতিক্রম করেছি যে, চলতে থেকেছি। আবার হোঁচট খেয়ে ভূপাতিত হয়েছি। গুনাহ হয়েছে। তওবা করেছি। আবার চলা শুরু করেছি। আবার গুনাহ হয়েছে। আমল ছুটে গেছে। তবুও নিরাশ হইনি। তওবা করে আবার চলতে শুরু করেছি। আবার গুনাহ হয়েছে। আবার তওবা করেছি। এভাবে একদিন গন্তব্যে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং পেছনের দিকে না তাকিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। পিছনে তাকানো মঙ্গলজনক নয়। অর্থাৎ জীবনের পেছনে যাবেন না, সামনে অগ্রসর হোন।

আল্লাহপাক আমাদেরকে একটি দিল দিয়েছেন। মেহনত করলে এটাকে অনেক দামি বানাতে পারব। একজন সাহাবীর দিল এক সময় কুফরীতে লিপ্ত ছিল। ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে সেটাকে সংশোধন করার পর অনেক দামি হয়েছে। এমনিভাবে আমরাও যদি মেহনত করি তাহলে আমাদের দিলও দামি হয়ে যাবে।

হযরত থানভী (রহ.) নিম্নোক্ত কবিতাটি বেশি বেশি পড়তেন-

ھنوز آں ابر رحمت در فشان است
خُم و خُمخانه با مھر و نشان است

আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ার পানি কি কমে গেছে? সাহাবীদের উপর যেমন রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে আল্লাহপাকের রহমতের বৃষ্টি এখনও আছে। যদি আমার দিলটাকে 'দিল' বানাতে পারি এবং ঐ দিলে যদি তা গ্রহণ করতে পারি।

সাহাবায়ে কেরামের বুঝতে দেরি হয়েছে কিন্তু কবুল করতে দেরি হয়নি। আমাদের দিলের হালত এমন নয়। আমরা সব কিছু বুঝি, তারপরও গ্রহণ করি না। মানি না। এজন্য আগে দিল বানাতে হবে। দিল বদলাতে হবে। দিলকে 'দিল' বানাতে হবে।

পেছনে তাকানোর সুযোগ নেই। অনেকে এসে বলে, হুজুর! এই এই গুনাহ হয়ে গেছে। আমি বলি, রাখুন এসব কথা। সামনে অগ্রসর হোন, তাওবা করুন।

ایں درگاہ ما درگاہ نہ امید نیست
گر صد بار توبہ شکستی بازآ بازآ

আল্লাহর দরবার থেকে একটি ডাক সবসময় ভেসে আসে– আরে তুমি কাফের, মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান, নাস্তিক যাই হওনা কেন নিরাশ হয়ো না। আমার দরবার সর্বদা খোলা। তুমি এসো। তুমি তওবা করে শতবার ভঙ্গ করেছো। ভয় পেও না। আমার দরবারে ফিরে এসো। এত কিছুর পরও আমার দরবার তোমার জন্য সদা খোলা।

শেষ রাতে মাওলা এসে ডাকেন–

هم تو مائل به کرم هیں کوئی سائل هی نهیں
راه دیکھلائے کِسے رَهْرَوِ منزل هی نهیں

দান-ভাণ্ডার খোলাইত মোর; সে দান নেবার সায়েল কৈ?
কারে আমি পথ দেখাইব, পথচলা সেই পথিক কৈ?

দোস্ত! এজন্য পেছনে না তাকাই। পিছনের সব যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। দুই রাকাত নামায পড়ে কাঁদবেন। হিম্মত রাখবেন এখন থেকে সামনে যেন আর অন্যায় না হয় ।

উহুদের যুদ্ধে যে ওয়াহশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হামযা (রা.)-কে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলেন সেই ওয়াহশী যদি তওবা করে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেন, আমরা সাহাবী হতে না পারি, ওলী তো হতে পারব। তাই চলুন, আমরাও সামনে অগ্রসর হই। হিম্মতহারা না হই।

بر خود نظر کشاں زتهی دامنی مرنج
که در سینهٔ تو ماهی تمامی نهاده اند

তুমি তোমার নিজের দিকে তাকাও। তাকানোর পর যদি দেখ তাতে তো কিছু নেই। খালি। নিরাশ হয়ো না। সামনের জন্য চেষ্টা করো। তোমার মাঝে পূর্ণিমার চাঁদ লুকিয়ে আছে। চেষ্টা করো। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তুমিও চেষ্টা করে করে এমন উজ্জ্বল হবে যে, তোমার দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনা তোমার ভিতর আছে। দিলকে দিল বানাও। পেছনে তাকাব না। সামনে তাকাব। সামনে অগ্রসর হতে হতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছব। তারপর দুনিয়া থেকে এমনভাবে যাব যে, আল্লাহ আমাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকবেন।

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ

যে মাওলার কাছে যেতে চায়, মাওলাও তাকে তাঁর কাছে নিতে চান। মাওলাও তার জন্য অপেক্ষা করেন। এভাবে জান্নাতে গিয়ে মাওলার দীদার নসীব হয়ে যাবে। জান্নাতে মাওলায়েপাকের রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। আমরা তো জান্নাত এজন্য চাই যে, জান্নাতে মাওলার দীদার লাভ হবে। জান্নাত ছাড়া মাওলার দীদার লাভ হবে না।

یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

এবার আমল করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চাই। আমাদের দিলের হালত বদলে দেয়ার জন্য দু'আ চাই। আমাদের কত কী জরুরত তা আমরা কিছু জানি না। কেবল আল্লাহ তা'আলা জানেন। যেহেতু তিনি আমাদের রব। আজ কী প্রয়োজন, আগামীকাল কী প্রয়োজন, মৃত্যুর সময় কী প্রয়োজন, বৃদ্ধ অবস্থায় কী প্রয়োজন, মুমূর্ষু অবস্থায় কী প্রয়োজন, কবরে কী প্রয়োজন, হাশরে-মীযানে কী প্রয়োজন তা আমরা বলতে পারব না। একমাত্র আল্লাহপাক জানেন। যেহেতু তিনি রব। আর আমরা যদি ঠিকই রবকে রব হিসেবে মানি তাহলে তিনি অবশ্যই আমার জরুরত পূরণ করবেন।

দুনিয়াতে একটি ছেলে যদি তার বাবাকে বাবা না বলে, বাবার কথা না শোনে তার পরও বাবা তার লালন-পালন ছেড়ে দেন না। আর যদি ছেলেটা বাস্তবেই বাবার পাগল হয় তাহলে বাবা তার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে দেয়। দুনিয়ার আব্বার অবস্থা যদি এই হয় তাহলে রাব্বার (রবের) অবস্থা কী হবে? এজন্য আসুন, রবের পরিচয় জানি এবং নিজেরও পরিচয় জানি। নিজের সব প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাই। *

* ১৪/০২/১৪ ঈ. তারিখে ফুলছোঁয়ার বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত আখেরী বয়ান

ওযু ও নামায প্রশিক্ষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.[44]

قال النبى ﷺ : اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ اَو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ -

صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

৪৫. সূরা ত্ব-হা : ১৪

বন্দেগী ও বন্দেগীর পদ্ধতি

আমরা আল্লাহপাকের বান্দা। আমাদের কাজ হলো তাঁর বন্দেগী করা। আর আমাদের এ মজলিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহপাকের বন্দেগীর তরীকা শিখা। আল্লাহ পাকের বড় এহসান ও দয়া এই যে, তিনি 'আমার বন্দেগী কর' শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত করেননি; বরং বন্দেগী কিভাবে করতে হয় এর তরীকা ও পদ্ধতি বাতলানোর জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়্যতী জিন্দেগীতে উম্মতকে শিখিয়েছেন বন্দেগী কিভাবে করতে হয়।

নামায স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইবাদত

আল্লাহপাকের বন্দেগীর মধ্যে নামাযের মতো আর কোনো বন্দেগী নেই। নামাযের মধ্যে একই সময়ে মন লাগবে, মুখ লাগবে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাগবে। শুধু তাই নয়–শরীর, কাপড়, জায়গা ইত্যাদিও পবিত্র হতে হবে। সেই সাথে ওযুও লাগবে। গোসল ফরজ হলে গোসল লাগবে। ওযু-গোসল নামাজের পূর্বশর্ত। এগুলো ছাড়া তো নামায হবেই না। কোনো কারণে যদি ওযু-গোসল করতে না পারি তাহলে এই ওযু-গোসলের জন্য আল্লাহপাক বিকল্প ব্যবস্থা বের করে দিয়েছেন তথা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করার সুযোগ রেখেছেন।

নামাজের গুরুত্ব

ওযু-গোসলের বিকল্প রয়েছে কিন্তু নামাযের কোনো বিকল্প নেই। নামায পড়তেই হবে। দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। এবার বুঝুন, নামাযের কত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হওয়ার পর মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের প্রধানদের কাছে পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল–

সংখ্যক লোক আছে যারা ঈদের নামাযগুলো পড়ে, জুমুআর নামায পড়ে না। কিছু আছে জুমুআর নামায পড়ে কিন্তু পাঞ্জেগানা নামায পড়ে না। অথচ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ জামাতের সাথে আদায় করা উম্মতের সর্বপ্রথম করণীয়। এর চেয়ে বড় আর কোনো আমল নেই। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে ভালোভাবে আদায় করে এমন মুসলমানের সংখ্যা খুব কম।

প্রতিষ্ঠালগ্নে মসজিদে নববীর আয়তন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল কত? ঐ সময় মসজিদে নববীটা অনেক বড় ছিল। ১৩৫/১১৮ ফিট প্রশস্ত ছিল। বিশাল বড় মসজিদ! এবার বোঝুন ঐ সময়ের জন্য সেটা কত বড় মসজিদ ছিল। আর এখনকার মসজিদে নববীর আয়তন তো অনেক বেশি। এ রকম ডজনে ডজনে মসজিদ তাতে ঢুকে যাবে। তো সে সময়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ এত বড় করে বানিয়েছেন। মসজিদে নববীর পাশেই ছিল তাঁর বিবিদের হুজরা। একেবারে মসজিদের সাথে লাগানো। হুজরার দরজা খুললেই মসজিদ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার কিছু দিন পূর্বে অসুস্থ ছিলেন। মসজিদে নববীতে এসে জামাতে শরীক হওয়ার সক্ষমতা পাচ্ছিলেন না। একবার তাঁর মনে সাধ জাগল আমি যদি একটু দেখতে পেতাম আমার সাহাবীরা কিভাবে মসজিদে নামায পড়ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসনা পূরণ করার জন্য কারো কাঁধে ভর করে দরজা পর্যন্ত এসেছেন। পর্দা সরিয়ে দেয়ার পর তিনি দেখতে পেলেন মসজিদে নববী কানায় কানায় ভর্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইমামতি করার সময় যেমন ভর্তি থাকত এখনও তেমনই ভর্তি। একটি সময় এমন ছিল যখন মদীনার কোনো বালেগ মানুষ নামাযের সময় বাইরে থাকতেন না। সবাই মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা সরানো পর দেখলেন পুরো মসজিদ ভরপুর। হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়াচ্ছেন আর সবাই তাঁর পিছনে নামায পড়ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা দেখে খুব

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ, مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ, وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ .[45]

হে আমার রাজ্যের গভর্নরবৃন্দ! আমি মনে করি তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায।

আল্লাহপাক যেমন কুরআন শরীফের মাঝে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নামাযের, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীসে, গোটা জীবনে নামাযের খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন হয়েও সেটার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাই তো তিনি বলেন, اِنّ اَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ আমি মনে করি তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায।

مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ

যে এই নামাযের প্রতি যত্নবান হয় অর্থাৎ যথাযথ নামায আদায় করে, যেভাবে নামায আদায় করা দরকার সেভাবে আদায় করে, নামাজের আগে যেসব শর্ত রয়েছে সে শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করে, যে নিজেও পালন করে এবং অন্যকেও পালন করতে বলে, আমি মনে করি সে তার দীনের হেফাজত করল। তার জীবনের আরো যত কাজ রয়েছে, ইবাদত-বন্দেগী হোক, দুনিয়ার জরুরতের বিষয় হোক, একটি মানুষের জীবনে যত বিষয় রয়েছে সকল বিষয়ে সে অধিক যত্নবান হবে। নামাজে যে যত্নবান, সে অন্য সকল বিষয়ে যত্নবান।

وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. আর যে এ নামাযকে ধ্বংস ও বরবাদ করে সে অন্যান্য ব্যাপারেও এমনই। যার নামায ঠিক নেই তার আর কিছু ঠিক আছে বলে মনে করি না।

মুসলমান মাত্রই নামাযী হতে হবে

মুসলমানদের মধ্যে দুয়েকজনের কথা এমনও শোনা যায় যারা জীবনে এক ওয়াক্ত নামাযও পড়ে না, ঈদের নামাজও পড়ে না। অনেকে এমনও রয়েছে যারা মাঝে মাঝে রোযা রাখে কিন্তু নামায পড়ে না। জুমা এবং ঈদ কোনো নামাযই পড়ে না। এদের সংখ্যা খুবই কম। কিছু

৪৬. আসসুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : হাদীস নং-২০৯৬

খুশি হয়েছেন। এমনকি তার মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এটাই ছিল সর্বশেষ হাসি। এরপর তিনি আর হাসেননি। হাসার সুযোগ হয়নি বা এমন আনন্দের মুহূর্ত তাঁর জীবনে আর আসেনি।

দোস্ত! বুঝতে পারলেন তো জামাতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব নবীজির কাছে কেমন ছিল? দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতে সারা দেশের মসজিদগুলোতে কিছু মুসল্লি পাওয়া যায়। আর কিছু হক্কানী-রব্বানী আলেমদেরও মেহনত রয়েছে।

এজন্য দোস্ত! আসল কাজ কী তা বোঝা দরকার। নিজেদের নামাযই কেবল ইসলাহ করব না। বরং ঘরের বিবি ও মেয়েদের নামায ঠিকমত হচ্ছে কি না- সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকব। নামাযের গুরুত্ব বোঝানোর পাশাপাশি তাদেরকে নামাযের প্রশিক্ষণ দিব। মহিলাদের নামাযের কী কী ব্যবধান রয়েছে তা বলে দিব। আর মনে রাখবেন, এগুলো সুন্নত বা নফল পর্যায়ের ব্যবধান। ফরজ, ওয়াজিব পর্যায়ের কোনো ব্যবধান নেই। আর নিজের ঘরের বেলায়ই যত্নবান হব না বরং আমি যে মসজিদের মুসল্লি সেই মসজিদের অবস্থা কী? সেই মসজিদের আশপাশের সকল বালেগ পুরুষ জামাতে আসে কি না। শুক্রবারে যেমন মহল্লার সকলে হাজির হওয়ার কারণে মসজিদ ভরে যায়, অন্য ওয়াক্তে ভরে কি না? না ভরলে কেন ভরে না? শুধু কি জুমার নামাযই ফরজ, না অন্যগুলোও ফরজ। সবই ফরজ। জুমার নামাযের জামাত যেমন সুন্নতে মুয়াক্কাদা অন্য নামাযের জামাতও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। জুমার নামাজের জন্য জামাত হওয়া শর্ত। এটা ভিন্ন কথা। তবে অন্য নামাযের জামাআতও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এমনকি কোনো কোনো ইমামের মতে ওয়াজিব। এজন্য জামাতের ব্যাপারে আমাদের ফিকিরমান্দ হতে হবে।

জামে মসজিদের অর্থ

এ প্রসঙ্গটি যেহেতু এসেই গেছে তাই বলে ফেলি। এ বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় থাকলে ভালো, শরীয়তের মানশা বা উদ্দেশ্য হল, জুমার দিনে জুমার নামাযে মহল্লায় যত পাঞ্জেগানা ছোট ছোট মসজিদ আছে সেখানকার মুসল্লিরা এখানে একত্রিত হয়ে বড় জামাতে নামায

পড়বে। এজন্য এর নাম দেয়া হয়েছে জামে মসজিদ। এটা এজন্য নয় যে, জুমার দিনে তো সবাই নামায পড়বে অন্য দিন পড়বে না, এজন্য মসজিদটা বড় করে বানানো হয়েছে। এটা জুমুআর মসজিদের ব্যাখ্যা নয়; বরং মুসলমান তো জুমার দিনে যেমন নামায পড়ে অন্য দিনেও পড়বে। তবে অন্য নামাযের জন্য জুমার মসজিদে আসার প্রয়োজন নেই, মহল্লার পাঞ্জেগানা মসজিদে পড়লেই হবে। এ হলো জামে মসজিদের অর্থ। আমরা এর অর্থ অনেকে এমন বুঝে নিয়েছি যে, জুমার নামায পড়তে হয়, অন্যগুলো না পড়লেও চলে। বিষয়টি আদৌ এমন নয়।

জুমার নামাযের হেকমত

আসলে শরীয়তের মানশা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব মসজিদের মুসল্লীরা শুক্রবারে জুমার নামাযের জন্য একত্রিত হবে। এর মাঝে আল্লাহপাক অনেক হেকমত ও তাৎপর্য রেখেছেন। মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি, মায়া-মমতা এ বিষয়গুলো এর উপর নির্ভর করে। আশপাশের সব মহল্লার মুসল্লীগণ এক সাথে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে তো আল্লাহ সকলের দিল সোজা করে দিবেন। কাতার সোজা হবে তো দিল সোজা হয়ে যাবে। ধনী-গরীব, মালিক, শ্রমিক একত্রে দাঁড়াবে এটা অনেক বড় বিষয়। এটা মানুষের দিলের মধ্যে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। এমনিভাবে শরীয়তের মানশা হলো ঈদের নামাযের জামাতগুলো আরো বড় হবে। অনেকগুলো জামে মসজিদের মুসল্লী একত্রিত হয়ে কোনো ময়দানে এক জামাতে নামায পড়বে। এর মাঝেও উদ্দেশ্য হল আশপাশের মুসলমানগণ একে অপরকে দেখল, কুশল বিনিময় করল, এক জামাতে নামায পড়ল তো আল্লাহপাক এ উসিলায় তাদেরকে দীনের যে কোনো কোরবানীর জন্য একত্রিত করে দিবেন। এরপরে পুরো পৃথিবীর মুসলমান (যাদেরকে আল্লাহপাক সঙ্গতি দেন) বছরে একবার আরাফার ময়দানে সমবেত হবে।

মুসলমানদের জমায়েতটা শুরু হয়েছে মহল্লার মসজিদ দিয়ে। মহল্লার ছোট মসজিদ অল্প কিছু মানুষ নামাজ আদায় করে। এরপর হল জুমার মসজিদ। পনের বিশটা মহল্লার মানুষ সপ্তাহে একবার শুক্রবারে সমবেত হয়ে নামায আদায় করবে। ঐ রকম পনের বিশটি জুমার মসজিদের সকল

মুসল্লি বছরে দুই ঈদে একত্রিত হবে। আর পুরো দুনিয়ার যত ঈদগাহ আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে সঙ্গতি দিয়েছেন তাদের সবার জন্য আহ্বান হয়েছে সকলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তোমরা চলে এসো আরাফার ময়দানে, চলে এসো খানায়ে কাবায়। খানায়ে কাবার তওয়াফ ছাড়া যেমন হজ হয় না, তেমনি আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়া ছাড়াও হজ হয় না। পুরো দুনিয়ার নির্বাচিত মুসল্লী, বিভিন্ন বর্ণের গোত্রের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন সংস্কৃতির মুসলমান এক ময়দানে একত্রিত হয়। উদ্দেশ্য একটাই। এক তো হল এর দ্বারা আল্লাহপাকের উলুহিয়্যত, রবুবিয়্যত এবং তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাথে সাথে এক দেশের মুসলমানদের সাথে আরেক দেশের মুসলমানদের সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়। একে অপরের সুখের কথা শোনে, দুঃখের কথা শোনে। এ হল আল্লাহ পাকের নেজাম।

এজন্য দোস্ত! নামাযকে গুরুত্ব দেই। নামায ঠিক তো সব ঠিক। আমার ব্যক্তি জীবনে যদি আমি যথাযথ নামাযী হই, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে সুন্নত মোতাবেক জামাতের সাথে আদায় করি। যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার সেভাবে অর্জন করি। নামাযের প্রতিটি কাজ তথা দাঁড়ানো, হাত বাঁধা, রুকু, সেজদা, সালাম ফিরানো ইত্যাদি সব কিছু যদি পরিপূর্ণ হয় তাহলে আমার পুরো জিন্দেগী সঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহপাক আমার দীনের চাহাত ও কামনা-বাসনাকে সুন্দর করে দিবেন। আমার চোখের দেখাকে সুন্দর করে দিবেন। হাতের ধরাকে সুন্দর করে দিবেন। পায়ের চলাকে সুন্দর করে দিবেন।

এ জন্য দোস্ত! নামাযের ব্যাপারে গুরুত্ব দেই। প্রত্যেকেই এখন থেকে এ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করে যাব যে, আমি যে মসজিদের মুসল্লী এই মহল্লার কতজন মানুষ নামায পড়ে আর কতজন পড়ে না। (অর্থাৎ জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না।) এ ফিকির ও চিন্তা যেন আমাদের ভিতর থাকে।

আমার কী করা উচিত! আমি কি কিছু করতে পারি না। এটা একদম পরীক্ষিত বিষয় যে, যার নামায সুন্দর তার সব সুন্দর। যার পরিবারের সকলের নামায সুন্দর তার মতো আদর্শ পরিবার আর কোথাও হবে না। যার ছেলে-মেয়ে বিবি বাচ্চা সকলের নামায সুন্দর তার সব সুন্দর।

দুনিয়াতেও সুন্দর, আখরাতেও সুন্দর। যেই মহল্লার সব মানুষ নামাযী সে মহল্লার অবস্থা অন্য মহল্লার চেয়ে ভিন্ন রকম হবে।

ওযু প্রশিক্ষণ

এবার আমরা প্রশিক্ষণের দিকে চলে যাই। আসুন, প্রথমে আমরা ওযু সুন্দর করি। কারণ ওযু ফরয। ওযুর মধ্যে সাধারণত ভুল কমই হয়। শুধু কয়েকটা সুন্নত বা মুস্তাহাবে ত্রুটি হয়। সবগুলো বিষয় আলোচনা করব না। কারণ ওযু আমাদের মোটামুটি হয়ে যায়। যেখানে যেখানে সংশোধন করা দরকার তা আলোচনা করব।

মিসওয়াক

আমরা ওযুর মধ্যে মিসওয়াক করব। যেভাবেই মিসওয়াক করবেন সুন্নত তো আদায় হয়ে যাবে। তবে মিসওয়াকের কিছু আদব রয়েছে। সে আদবগুলো আমার দাঁতের জন্য উপকারী। সেই সাথে তা পালনে সাওয়াবও রয়েছে। দাঁতের মাড়ির উপরে-নীচে মেসওয়াক করব না। ডানে-বামে মেসওয়াক করব। প্রথম ডান দিকের মাড়িতে ঘষা দিব। উপর-নীচে করলে মেসওয়াক হবে, কিন্তু এটা মাড়ির জন্য ক্ষতিকর। মেসওয়াকের তারতীব কিতাবে যেভাবে পাওয়া যায় অর্থাৎ যেভাবে মেসওয়াকের পদ্ধতি বর্ণিত হয়ে এসেছে সেটা হল- ডান থেকে বামে। মেসওয়াক জিহ্বার মধ্যেও করা চাই। আবু দাউদ নাসায়ী শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেসওয়াকের বিবরণ এসেছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহ্বার মধ্যেও মেসওয়াক করতেন। অনেক সময় মেসওয়াকটা ভিতরে কিছু দূর চলে যেত, ফলে ভিতর থেকেও শব্দ বের হত। জিহ্বার মেসওয়াকটা আড়াআড়ি না করে খাড়াভাবে করব। সামনের অংশ থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাব।

নারী-পুরুষের মিসওয়াকে পার্থক্য

এখানে একটি বিষয় মনে রাখবেন, মহিলা আর পুরুষের দাঁতের মাড়ি এক রকম নয়। কিন্তু দাঁত পরিষ্কার তাদেরও করতে হবে। মেসওয়াক সুন্নত হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন নামাযে সওয়াব

বেশি হওয়া, মুখের দুর্গন্ধ দূর হওয়া, দাঁতের মাড়ি সতেজ ও শক্ত রাখা ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরও বহু উপকারিতা রয়েছে। এসব ফায়দা মহিলাদেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাদের দাঁতের মাড়ি পুরুষদের তুলনায় দুর্বল। এ জন্য ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে লেখা আছে– মহিলারা মেসওয়াক না করে 'ইল্‌ক' নামক একটা বস্তু আছে, সেটা যদি তারা চাবায় তাহলে এর দ্বারা তাদের মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে এবং দাঁতও পরিষ্কার হবে। এ জিনিসটা আমাদের দেশে সহজে পাওয়া যায় না। এ জন্য বলার বিষয় হলো মহিলাগণ মেসওয়াক তো করবে ঠিকই তবে পুরুষদের মতো বেশিক্ষণ করবে না। পুরুষদের তুলনায় কিছুটা কমিয়ে করবে।

এ বিষয়টি বুঝবেন। সবাইকে বুঝতে হবে। অন্যথা যদি ডাক্তারগণ বলেন যে, মহিলাদের মাড়ি নরম বিধায় তাদের জন্য দীর্ঘ সময় মিসওয়াক ক্ষতিকর; তখন তো আপনি আপত্তি জানাবেন, ডাক্তারগণ নবীর সুন্নতের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করল। বিষয়টা কেমন মনে হচ্ছে। এখানে বোঝার বিষয় রয়েছে। ইসলাম অনেক বিজ্ঞানসম্মত জিনিস। শুধু বিজ্ঞানসম্মতই নয়; বরং বিজ্ঞানেরও ঊর্ধ্বের বিষয়। সাইন্স বা বিজ্ঞান তো সেটা বোঝারও ক্ষমতা রাখে না, কোনো বিষয়েই নয়। এ জন্য সব কিছুই বোঝা উচিত।

আরেকটা বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে চাই। সেটা হল কোনো বিষয়ে আধা আধা জেনেই বলা শুরু করবেন না বা তর্ক করতে যাবেন না; বরং কোনো বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে উলামায়ে কেরামের হাওলা বা রেফারেন্স দিবেন। বলবেন, বিষয়টি আমি আগে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে নিশ্চিত হই তারপর আপনাকে বলব, না হয় বলবেন, চলুন আপনিসহ তাদের কাছে যাই। অযথা তর্কে জড়িত হবেন না। অধিকাংশ তর্কের কারণ হল না জানা বা আধা আধা জানা।

তো আমরা ওযুর পূর্বে মেসওয়াক করব। অনেক সময় ওযুর সময় মেসওয়াক করা হয়নি, কিংবা ওযুর সময় তো মেসওয়াক করা হয়েছে কিন্তু এক ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তে চান, তখন আপনি চেষ্টা করবেন আবার মেসওয়াক করে নিতে। ওযু না করে শুধু মেসওয়াক করে নিবেন। এটা জরুরী নয়, তবে অনেক ফায়দাজনক।

ওযুর পূর্বে যেমন মেসওয়াকের কথা রয়েছে। তেমনিভাবে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে নামাযের পূর্বেও মেসওয়াকের কথা রয়েছে। আমরা তো মনে করি ওযুর আগেই কেবল মেসওয়াক করতে হবে। কেননা ওযু নামাযের জন্যই করা হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে কারো ওযু আছে। জোহরের সময় মেসওয়াকসহ ওযু করেছে, এখন এ ওযু দিয়ে আসর নামাযও পড়তে চায় তাহলে বেশি সওয়াবের জন্য মেসওযাক করা চাই।

দাড়ি খিলাল করার পদ্ধতি

এরপর দাড়ি খিলাল করব। এরও পদ্ধতি জানা দরকার। দাড়ি খিলাল করাও সুন্নত। কখন দাড়ি খিলাল করতে হবে? ওযুর মধ্যে একটি ফরয হল মুখমণ্ডল ধৌত করা। একবার ধোয়া ফরয। তিনবার ধোয়া সুন্নত। এর বেশি করা নিষিদ্ধ। কারণ এটি এসরাফ ও অপচয় বলে গন্য হয়। তিনবার চেহারা ধোয়ার পর দাড়ি খিলাল করতে হবে। এটা সুন্নত। ঘন দাড়ি হোক, পাতলা দাড়ি হোক। উভয় প্রকারের দাড়ি খিলাল করতে হয়। একটি কথা প্রচলিত আছে, ঘন দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। এ কথাটা ঠিক নয়। দাড়ি খিলাল করা সুন্নত– এটা ঠিক কথা। ঘন শব্দটি কেউ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। দাড়ি ঘন হোক কিংবা পাতলা হোক খিলাল করা সুন্নত। দাড়ি খিলালের নিয়ম হল–

ডান হাতের কোষে পানি নিয়ে থুতনির নীচের অংশকে ভিজিয়ে দিব। পূর্ব থেকে ভিজা থাকলেও তখন আবার ভিজাব। এরপর যাদের চাপ দাড়ি। অর্থাৎ, যাদের ডানে, মাঝে এবং বামে সব দিকে দাড়ি রয়েছে তারা প্রথমে ডান দিকে খিলাল করবে। কিভাবে করবে? হাতের তালু সামনের দিকে রেখে পিঠ নিচের দিকে রেখে। আঙ্গুল দিয়ে গলার দিক থেকে উপরের দিকে খিলাল করবে। আর যাদের শুধু মাঝখানে দাড়ি রয়েছে তারা শুধু একবার খিলাল করবে। খিলাল আসলে একবারই। তবে জায়গা তিনটা হওয়াতে তিনবার করা হয়। এক জায়গায় দুইবার খিলাল করতে হয় না। কেউ যদি উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে খিলাল না করে অন্যভাবে করে তাতেও খিলাল আদায় হয়ে যাবে। তবে কম লাভজনক হবে। প্রত্যেকটা জিনিস যেভাবে করা আদব সেভাবে করলে ফায়দা বেশি। আপনি একভাবে করেন, অপরজনকে দেখলেন সে অন্যভাবে করছে তার সাথে তর্কে লিপ্ত হবেন না যে,

আপনি এভাবে কেন খিলাল করলেন? কারণ, এটা বড় ধরনের ভুল নয়। বরং আদব। তাই এ রকম বলা যেতে পারে যে, ভাই আপনি যেভাবে করেছেন তা ঠিক আছে তবে এভাবে করলে বেশি ভালো হয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের সাথে আলাপ করে নিলে ভালো হবে। আর উনি এভাবে করে আর আমি এভাবে করি দেখে নিজেকে খুব ভালো মনে করব না। সেও তো সুন্নত আদায় করছে। আমি হয়ত উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে এই পদ্ধতিটা জেনেছি, হয়ত তিনি অন্যান্য ব্যাপারে আরও দশটা বিষয় আমার চেয়ে অনেক ভালো করে জানেন। তাই আমি কেন তাকে খাট মনে করব?

আর কিছু সমস্যা হয় আমাদের মাথা মাসাহ করার মাঝে। মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা ফরয। এর কম করলে মাসাহ হবে না। পুরো মাথা মাসাহ করা সুন্নত। কান মাসাহ করাও সুন্নত। গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব। ফরয তো এক হাত দিয়ে ঘষা মারলেই আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নতটি শেখার বিষয় রয়েছে। সুন্নত যত আদায় করব তত আমার দিল সুন্দর হবে। মদীনার সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহব্বত এমনকি আল্লাহর মহব্বতও বেড়ে যাবে। যেটা আমাদের দরকার। আর ঐ সুন্নত মোতাবেক ওযু দ্বারা যে নামায পড়ব তার ফলাফল অনেক অনেক বেশি হবে। এ জন্য মাথা মাসাহ করার নিয়ম জেনে নিই। মাথা মাসাহর সাথে কান ও গর্দান মাসাহ করার বিষয় রয়েছে। মাথা মাসাহ করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। উভয়টি পদ্ধতিই সুন্নত ও সিদ্ধ। *

* ১৬/০২/১৩ ঈ. ফুলছোঁয়ার বার্ষিক মাহফিলে বাদ ফজর প্রদত্ত বয়ান ও প্রশিক্ষণ

ওযু ও নামাযের জরুরী মাসায়েল

ওযুর ফরয ৪টি

১। সমস্ত মুখ (চুলের গোড়া থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত) একবার ধৌত করা। দাড়ি যদি পাতলা হয়, তাহলে দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয। আর যদি দাড়ি ঘন হয় তাহলে দাড়ির উপরিভাগে পানি প্রবাহিত করলেই চলবে।

২। কনুই সহ উভয় হাত একবার ধোয়া।

৩। মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা।

৪। টাখনু সহ উভয় পা একবার ধোয়া।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত অঙ্গসমূহ থেকে যদি কোন অঙ্গের এক চুল পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকে তাহলে ওযুই হবে না।

ওযুর সুন্নতসমূহ

১। নিয়ত করা। যেমন- আমি ওযু করছি বা আল্লাহর হুকুম পালন করছি।

২। ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। যেমন-

بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام

৩। উভয় হাত কব্জিসহ তিনবার ধৌত করা।

৪। মেসওয়াক করা।

৫। তিনবার কুলি করা।

৬। তিনবার নাকে পানি দেয়া এবং প্রতিবার নাক ঝাড়া।

৭। দাড়ি খিলাল করা। (ঘন হোক বা পাতলা হোক)

৮। হাতের অঙ্গুলি খিলাল করা।

৯। সমস্ত মাথা মাসেহ করা।

১০। কানের ভিতর ও বাহির মাসেহ করা।

১১। পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করা।

১২। ধোয়া ফরয এমন অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়া।

১৩। ডান হাত বাম হাতের আগে আর ডান পা বাম পায়ের আগে ধোয়া।

১৪। তারতীব অর্থাৎ যে অঙ্গ আগে ধোয়ার নিয়ম সেই অঙ্গ আগে ধোয়া।

১৫। এক অঙ্গ শুকানোর আগে আরেক অঙ্গ ধোয়া।

১৬। ফরয অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় মলা।

ওযুর মুস্তাহাব ও আদবসমূহ

১। উঁচু স্থানে বসা।

২। কেবলামুখী হওয়া।

৩। ওযুতে অন্যের সাহায্য না নেয়া।

৪। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।

৫। কুলি ও নাকে পানি দেয়ার সময় ডান হাত ব্যবহার করা এবং বাম হাতে নাক ঝাড়া।

৬। ঢিলা-ঢালা আংটি নাড়া-চাড়া দেয়া।

৭। কান মাসেহ করার পর কনিষ্ঠা অঙ্গুলি কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো।

৮। গর্দান মাসেহ করা (হাতের পিঠ দ্বারা)।

৯। হাত এবং পায়ের অঙ্গুলি থেকে ধোয়া শুরু করা।

১০। ওযুর সময় মানুষের সাথে কথা না বলা।

১১। মাজুর না হলে নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ওযু করে নেয়া।

১২। প্রত্যেক অঙ্গকে পুরোপুরি তিনবার এবং ফরযের সীমার বাহিরেও কিছু অংশ ধৌত করে ওযুকে শানদার বানানো।

১৩। অবশিষ্ট পানি থেকে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে পান করা।

১৪। ওযু শেষ করে কেবলামুখী দাঁড়িয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করা।

১৫। এবং اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين এই দু'আ পড়া।

১৬। ওযুর পানি না মোছা।

দাড়ি খিলাল করার পদ্ধতি

ডান হাতে পানি নিয়ে থুতনির নীচে লাগিয়ে ডান হাতের পিঠ গলার দিকে আর তালু বাহিরের দিকে রেখে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে খিলাল করা।

হাতের অঙ্গুলি খিলাল করার পদ্ধতি

উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়ার পর বাম হাতের অঙ্গলিসমূহের পেট দ্বারা ডান হাতের পিঠের দিক দিয়ে এভাবে খিলাল করবে যে বাম হাতের অঙ্গুলিগুলো ডান হাতের অঙ্গলিসমূহের মাঝে প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে টেনে আনবে। অনুরূপভাবে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহের পেট দ্বারা বাম হাতের অঙ্গুলি খিলাল করবে।

মাথা ও কান মাসেহ করার পদ্ধতি

এক হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রভাগ অন্য হাতের অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে মাথার শুরু থেকে পেছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত মাসেহ করবে। অতঃপর উভয় হাতের তালু দ্বারা মাথার উভয় পাশ পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে মাসেহ করবে। অতঃপর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা উভয় কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করবে। আর শাহাদাত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মাসেহ করবে। অতঃপর আদব হিসেবে উভয় হাতের কনিষ্ঠার মাথা উভয় কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে একটু নাড়বে।

মাথা মাসেহ এভাবেও করা যায়

এক হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রভাগ অন্য হাতের অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে তার দ্বারা এবং উভয় হাতের তালু দ্বারা (উভয় হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদাত অঙ্গুলি ব্যতীত) পুরো মাথা এক সাথে মাসেহ করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত মাথার শুরু থেকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আবার পেছন থেকে মাথা শুরু ভাগ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। আর কান ও গর্দান পূর্ব পদ্ধতিতে মাসেহ করবে।

পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করার পদ্ধতি

উভয় পা তিনবার ধোয়ার পর বাম হাতের কনিষ্ঠা দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় এসে খিলাল শেষ হবে। বাম হাতের কনিষ্ঠা যথারীতি পায়ের দু'আঙ্গুলির ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে টেনে আনবে।

নামাযের পূর্বশর্ত (ফরয) ৭টি

১। শরীর পাক হওয়া। অর্থাৎ,

ক) শরীরে কোন প্রকারের নাপাক থাকলে তা দূর করা।

খ) ওযু না থাকলে ওযু করে নেওয়া।

গ) গোসল ফরয হয়ে থাকলে তা করে নেওয়া।

২। নামাযের কাপড় পবিত্র হওয়া।

৩। নামাযের স্থান পাক হওয়া।

৪। সতর ঢাকা। পুরুষের সতর হলো– নাভীর নীচ হতে হাঁটু পর্যন্ত (হাঁটু সহ)। স্ত্রী লোকের সতর হলো– চেহারা, কব্জি পর্যন্ত হাত ও গিট

পর্যন্ত পা ব্যতীত মাথার চুলসহ পুরো শরীর। উল্লেখ্য, সতরের এ সীমা শুধু নামাযের জন্য, পর্দার জন্য নয়।

৫। নামাযের ওয়াক্ত চিনে ওয়াক্তের ভেতর নামায পড়া।

৬। কেবলামুখী হওয়া।

৭। নিয়ত করা। যেমন, আমি আজকের ফজরের দু'রাকাত ফরয আদায় করছি- একথাটি মনে মনে কল্পনা করলেই চলবে।

এ সাতটির একটিরও যদি অভাব বা ত্রুটি থাকে তাহলে নামায আরম্ভই করা যাবে না।

নামাযের মধ্যে ফরয ৬টি

১। তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলা।

২। কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরয ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া। অনেকের মতে ফজরের সুন্নতেও কিয়াম ফরয।

৩। কিরাআত অর্থাৎ যে কোন বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া। (চাই সূরা- ফাতিহা থেকেই হোক না কেন) ফরযের শুধু দুই রাকাতে আর অন্য নামাযের সকল রাকাতে কিরাআত ফরয।

৪। প্রতি রাকাতে এক রুকু করা। রুকুর মধ্যে ফরযের সীমা হল সামনের দিকে এ পরিমাণ বাঁকা হওয়া যেন হাঁটুতে হাত লাগানো সম্ভব হয়।

৫। প্রত্যেক রাকাতে দুই সিজদা করা। সেজদার মধ্যে ফরযের সীমা হচ্ছে কপাল এবং পায়ের আঙ্গুলের মাথা একই সময়ে জমিনে রাখা। পায়ের শুধু এক আঙ্গুলের মাথাও যদি জমিনে লেগে থাকে তাতেও সেজদার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

৬। শেষ বৈঠক করা। বৈঠক এ পরিমাণ হতে হবে যাতে (আত্যাহিয়্যাতু ..... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু) তাশাহহুদ পড়া যায়।

নামাযের এই ছয়টি ফরযের একটিও যদি ছুটে যায় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে- সংশোধনের কোন পথ থাকবে না। পুনরায় পড়তেই হবে।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১। ফরয নামাযের দুই রাকাতে আর অন্যান্য নামাযের সব রাকাতে সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পড়া।

২। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য আরেকটি সূরা অথবা ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত সংযুক্ত করা। এটিও ফরযের দুই রাকাতে আর অন্য নামাযের সব রাকাতে হতে হবে।

৩। উপরোক্ত সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা আয়াত ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে পড়া।

৪। সূরা ফাতিহা অন্য সূরা বা আয়াতের পূর্বে পড়া।

৫। সূরা ফাতিহা এক রাকাতে একত্রে একাধিকবার না পড়া।

৬। কিরাআত (সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা আয়াত) রুকুর আগে হওয়া।

৭। প্রত্যেক রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা পরবর্তী রাকাত শুরু করার আগে হওয়া।

৮। তা'দিলে আরকান- অর্থাৎ রুকু এবং সেজদাতে একবার "সুবহানাল্লাহ" বলার সময় পরিমাণ বিলম্ব করা। অনুরূপ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে ততটুকু দেরী করা।

৯। প্রথম বৈঠক করা অর্থাৎ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে সেজদা শেষ করে তাশাহুদ (আত্যাহিয়্যাতু ..... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু) পড়া যায় পরিমাণ সময় বসা।

১০। প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।

১১। নামায শেষ করার সময় দু'বার আস্সালামু শব্দ বলা। 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলা ওয়াজিব নয় সুন্নত।

১২। প্রত্যেকটি ফরয, ওয়াজিব স্ব-স্ব স্থানে আদায় করা। যেমন- সূরা ফাতিহা অন্য সূরা বা আয়াতের আগে পড়া। রুকু, কিয়াম আর সেজদার মাঝখানে রুকু আদায় করা ইত্যাদি।

১৩। কাওমা, জলসার অবস্থা ছাড়া নামাযের কোন ফরয বা ওয়াজিব আমল আদায়কালে অথবা দুই ফরয, দুই ওয়াজিব কিংবা ফরয ও ওয়াজিবের মাঝখানে নামাযের আমল জাতীয় কোন কিছু (যা সেখানে করার নিয়ম নাই) পড়ে বা করে বিলম্ব না করা। এমনিভাবে উক্ত ক্ষেত্রগুলোতে তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা যায় পরিমাণ সময় চুপ না থাকা।

১৪। বিতরের নামাযের মধ্যে দু'আয়ে কুনূত পড়া।

১৫। দু'আয়ে কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা।

১৬। ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।

১৭। জামাতের নামাযে ইমামের জন্য ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকাতে এবং তারাবীহ, রমযানের বিতর, ঈদ ও জুমু'আর সব রাকাতে কিরাআত উচ্চঃস্বরে পড়া আর বাকী অন্যান্য নামায ইমাম ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) সকলের জন্য কিরাআত নিম্নস্বরে পড়া।

উল্লিখিত ১৭টি ওয়াজিবের যে কোন একটি বা একাধিক ছুটে গেলে নামায নষ্ট না হলেও অঙ্গহীন অবশ্যই হবে। ভুলে যাওয়ার কারণে এক বা একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সেজদা করতে হয়। সাহু সেজদা করে নিলে নামাযের অঙ্গহীনতা দূর হয়ে যাবে- পুনরায় পড়া লাগবে না।

আর যদি সাহু সেজদা না করে অথবা উক্ত ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে সে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কিতাবে সাহু সেজদা ওয়াজিব হওয়ার বহু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে কোনো রূপ সন্দেহ নেই। তবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সাহু সেজদা ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ একটাই; আর তা হল "ভুলবশতঃ নামাযের এক বা একাধিক ওয়াজিব ছুটে যাওয়া।"

সুতরাং উল্লিখিত ১৭টি ওয়াজিবের কোন একটি না ছুটলে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে না।

নামাযের সুন্নতসমূহ

১। দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পা সোজাভাবে কেবলামুখী করে রাখা।

২। পুরুষের জন্য নামায আরম্ভ করার (তাকবীরের তাহরীমার) সময় কান পর্যন্ত এভাবে হাত উঠানো সুন্নত যে, হাতের তালু কেবলামুখী থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের নিম্নভাগ স্পর্শ করে অথবা তার বরাবর হয়। অনেক নামাযী হাতের তালু কেবলামুখী না রেখে কানের দিকে করে রাখেন। আবার অনেকে হাতের দ্বারা কান সম্পূর্ণ ঢেকে রাখেন। কোন কোন মুসল্লী হাত সম্পূর্ণ না উঠিয়ে সামান্য ইশারা করে থাকেন। কেউ কেউ কানের নিম্নভাগকে হাতের দ্বারা ধরে রাখেন। এ সমস্ত পদ্ধতি সুন্নতের পরিপন্থী। আর মহিলাদের জন্য শুধু কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নত।

৩। ইচ্ছাপূর্বক আঙ্গুলগুলো ফাঁক বা জড়ো করে না রেখে স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া।

৪। তাকবীরে তাহরীমার সময় সামনের দিকে মাথা না ঝুকানো (দৃষ্টি কেবলামুখী থাকবে)।

৫। ইমামের জন্য তাকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তাকবীর ও সালাম উচ্চঃস্বরে বলা যেন মুক্তাদীগণ শুনতে পায়।

৬। পুরুষের জন্য ডান হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী গোলাকার করে বাম হাতের কব্জি ধরা এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর সোজা করে রাখা সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য ডান হাতের তালু (পাঁচ আঙ্গুলসহ) বাম হাতের পিঠের উপর রেখে দেয়া সুন্নত। ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে ধরা তাদের জন্য সুন্নত নয়।

৭। পুরুষের জন্য হাত দু'টি উপরোক্ত নিয়মে নাভীর নীচে বাঁধা সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য বুকের উপর রাখা সুন্নত।

৮। শুধু প্রথম রাকাতে সানা (সুবহানাকাল্লাহুম্মা .....) পড়া।

৯। সানার পর শুধু প্রথম রাকাতে (আউযুবিল্লাহি .....) পড়া সুন্নত।

১০। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে (বিসমিল্লাহির ...) পড়া।

১১। সূরা ফাতিহা শেষান্তে "আমিন" বলা। (সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির .... পড়া উত্তম)।

১২। ফজর ও যোহরের ফরয নামাযে 'তিওয়ালে মুফাস্সাল' থেকে, আছর ও এশার ফরয নামাযে 'আওসাতে মুফাস্সাল' থেকে, আর মাগরিবের ফরয নামাযে 'কিসারে মুফাস্সাল' থেকে যে কোন সূরা পড়া সুন্নত।

* তিওয়ালে মুফাস্সাল : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত।

* আওসাতে মুফাস্সাল : সূরা তারেক্ব থেকে সূরা লামইয়াকুন (বায়্যিনাহ) পর্যন্ত।

* কিসারে মুফাস্সাল : সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

১৪। পুরুষদের জন্য রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব ফাঁক করে রাখা এবং ডান হাত দ্বারা ডান হাঁটু আর বাম হাত দ্বারা বাম হাঁটু মজবুত করে ধরা সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য হাতের আঙ্গুলগুলো

পরস্পরে মিলিয়ে হাঁটুর উপর রেখে দেয়া সুন্নত। আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখা এবং হাঁটু ধরা তাদের জন্য সুন্নত নয়।

১৫। পুরুষদের জন্য রুকুতে মাথা, পিঠ ও কোমর সমানভাবে বিছিয়ে দেয়া সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য শুধু এ পরিমাণ বাঁকা হওয়া সুন্নত যে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১৬। পুরুষদের জন্য রুকুতে হাঁটু না ভেঙ্গে পায়ের গোছা সোজা রাখা সুন্নত। (পুরো দেহকে সামনের দিকে একটু টান করে রাখলে পায়ের গোছা সোজা হয়। আর মহিলাদের জন্য হাঁটু ভেঙ্গে সামনের দিকে একটু বাঁকা করে রাখা সুন্নত।

১৭। পুরুষদের জন্য রুকুতে হাতের বাহু পাঁজর থেকে পৃথক রাখা এবং কনুই না ভেঙ্গে সোজা করে রাখা সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য কনুই ভেঙ্গে পাঁজরের সাথে লাগিয়ে রাখা সুন্নত।

১৮। রুকুতে তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) তিনবার পড়া।

১৯। রুকু থেকে উঠার সময় ইমামের জন্য 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলা, মুক্তাদীদের জন্য 'রাবাব্বনা লাকাল হাম্‌দ' আর একাকী নামায আদায়কারীর জন্য উভয়টি বলা সুন্নত।

২০। সেজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা।

২১। সেজদায় যেতে মাটিতে প্রথমে হাঁটু তারপর হাত অতঃপর নাক এরপর কপাল রাখা।

২২। সেজদার মধ্যে মাথা উভয় হাতের মাঝখানে এভাবে রাখা যেন বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের নিম্নভাগের বরাবর থাকে।

২৩। সেজদার মধ্যে হাতের আঙ্গুলগুলো একেবারে মিলিয়ে কেবলমুখী করে রাখা।

২৪। পুরুষদের জন্য সেজদায় বাহু পাঁজর থেকে আর পেটকে রান থেকে পৃথক রাখা এবং তালু ব্যতীত হাতের বাকী অংশ জমিন থেকে পৃথক রাখা সুন্নত। মহিলাদের জন্য বাহু পাঁজরের সাথে, পেট রানের সাথে আর কনুইসহ হাত জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখা সুন্নত।

২৫। সেজদায় সম্পূর্ণ সময় নাক জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখা।

২৬। সেজদায় পুরুষদের উভয় পা এভাবে সোজা করে রাখা সুন্নত যে, পায়ের গোড়ালী উপরের দিকে থাকে এবং আঙ্গুলগুলো ভালোভাবে

বাঁকা হয়ে কেবলামুখী থাকে। আর মহিলাদের পা খাড়া করে না রেখে উভয় পা ডান দিকে বের করে বিছিয়ে রাখা সুন্নত।

২৭। সেজদায় তিনবার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া।

২৮। সেজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল তারপর নাক তারপর হাত উঠানো।

২৯। সেজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা।

৩০। সেজদা হতে উঠে পুরুষদের জন্য বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এভাবে খাড়া করে রাখা সুন্নত যে, তার আঙ্গুলগুলো বাঁকা হয়ে কেবলামুখী হয়ে থাকে। মহিলাদের জন্য বাম নিতম্বের উপর বসা এবং উভয় পা ডান দিকে এভাবে বের করে দেয়া সুন্নত যেন ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের গোছার উপর থাকে।

৩১। বসা অবস্থায় ডান হাতের তালু ডান রানের উপর আর বাম হাতের তালু বাম রানের উপর রাখা।

৩২। প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা।

৩৩। ফরযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া এবং অন্য কোন সূরা বা আয়াত না পড়া।

৩৪। শেষ বৈঠকে আত্যাহিয়্যাতু শেষ করে দরূদ শরীফ পড়া।

৩৫। দরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাসূরা পড়া।

৩৬। সালাম প্রথমে ডান দিকে, পরে বাম দিকে ফিরানো।

৩৭। সালাম ফিরানোর সময় ডানে বামে চেহারা এ পরিমাণ ফিরানো সুন্নত, যেন পিছনের ব্যক্তি সামনের দিকে তাকালে তার গাল দেখতে পায়।

৩৮। যখন যে দিকে সালাম ফিরাবে তখন সেদিকের ফেরেশতা ও মুসলমানদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা।

৩৯। সালাম ফিরাবার সময় "আস্‌সালামু" শব্দের সাথে "আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" সংযুক্ত করা সুন্নত।

উপরোক্ত সুন্নতগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। কেননা এগুলোর একটিকেও ওজর ব্যতীত ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয়া হলে গুনাহ হবে। তবে নামায নষ্ট হবে না এবং সাহু সেজদাও ওয়াজিব হবে না। আর ভুলবশতঃ ছুটে গেলে গুনাহ হবে না। তবে সর্বাবস্থাতেই সে নামাযটি পুনরায় পড়ে নেয়া মুস্তাহাব।

নামাযের মুস্তাহাব ও আদবসমূহ

১। পুরুষদের দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়ানো। আর মহিলাদের জন্য যথাসম্ভব ফাঁক কমিয়ে রাখা।

২। পুরুষদের জন্য তাকবীরে তাহরীমার সময় চাদর বা আস্তিনের ভেতর থেকে কব্জি পর্যন্ত হাত বের করে নেয়া। আর মহিলাদের জন্য তা বের না করে চাদর বা কাপড়ের ভেতর রাখা।

৩। কিয়ামাবস্থায় সেজদার স্থানে, রুকু অবস্থায় পায়ের পিঠের দিকে, সেজদার সময় নাকের অগ্রভাগে, বসা অবস্থায় কোলের দিকে, আর সালাম ফিরাবার সময় কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা।

৪। সেজদায় যাওয়ার সময় সামনের দিকে বাঁকা না হয়ে সোজা নিম্নগামী হয়ে দু'পায়ের গোড়ালির উপর বসে যাওয়া।

৫। দুই সেজদার মাঝে বসাবস্থায় ফরয ও ওয়াজিব নামাযে "আল্লাহুম্মাগফিরলী" পড়া আর সকল নফল নামাযে "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফা'নী পড়া।

৬। আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে শাহাদাত বাক্য (আশ্‌হাদু....) পড়ার সময় মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একত্র করে গোলাকার করতঃ কনিষ্ঠা ও অনামিকা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলি উঠিয়ে ইশারা করা। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, "ইল্লাল্লাহু" বলার সাথে সাথে শাহাদাত অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলতে হবে। আর অন্যান্য আঙ্গুলগুলো ইশারা করার সময়ের ন্যায় বন্ধ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত থাকবে।

৭। মোয়াজ্জিনের একামতের মধ্যে "হাইয়্যা-আলাল ফালাহ" বলার পর বসে না থেকে জামাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া।

৮। হাই এসে গেলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা। প্রয়োজনে হাতের পিষ্ঠভাগের সাহায্য নেয়া।

৯। কাশি এসে গেলে তা চেপে রাখা। ওজর ব্যতীত ইচ্ছাপূর্বক অনর্থক কাশি দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

এ নয়টি মুস্তাহাব ও আদব রক্ষা করা বড় সাওয়াবের কাজ। তবে না করলে গুনাহ হবে না।

নামায পড়ার পদ্ধতি

এখানে নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে। সাথে সাথে বন্ধনীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি আমলের হুকুম (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি) বাতলে দেয়া হবে। মনে রাখবেন, ফরয ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়, পুনরায় পড়তেই হয়। ওয়াজিব ছুটে গেলে নামায নষ্ট না হলেও অঙ্গহানি অবশ্যই হয়। ভুলে যাওয়ার কারণে ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সেজদা করতে হয়। সাহু সেজদা না করলে অথবা কোন ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে, সে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। ওজর ব্যতীত ইচ্ছা করে সুন্নত ছেড়ে দিলে গুনাহ হয়; কিন্তু নামায নষ্ট হয় না এবং সাহু সেজদা ওয়াজিব হয় না। আর ভুলবশতঃ ছুটে গেলে গুনাহও হয় না। তবে উভয় অবস্থাতে নামাযটি পুনরায় পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। কোন মুস্তাহাব বা আদব ছুটে গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না, তবে সাওয়াব কমে যায়।

একাকী ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি

যখন আপনি নামায পড়ার ইচ্ছা করবেন, তখন নামাযের পূর্বশতগুলো অবলম্বন করবেন (ফরয)। দাঁড়াতে সক্ষম হলে দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল ফাঁক রেখে (মুস্তাহাব), উভয় হাত শরীরের দু'পাশে ছেড়ে দিয়ে এবং উভয় পা সোজা কেবলামুখী করে (সুন্নত) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন (ফরয)। প্রথমে চাদর বা আস্তিনের ভিতর থেকে কব্জি পর্যন্ত হাত বের করে নিবেন (আদব) তারপর সুন্নতের ২নং এ বর্ণিত নিয়মে উভয় হাত কান বরাবর উপরে উঠিয়ে (সুন্নত), (দৃষ্টি কেবলামুখি থাকবে) তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহ আকবার) বলবেন (ফরয) এবং সুন্নতের ৬নং এ বর্ণিত পদ্ধতিতে (সুন্নত) হাত দু'টি নাভির নিচে রেখে দিবেন (সুন্নত)। হাত বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবেন (আদব)। অতঃপর ছানা পড়ে (সুন্নত) আউযুবিল্লাহ ..... (সুন্নত) ও বিসমিল্লাহির ..... পড়বেন (সুন্নত)। তারপর সূরা ফাতিহা শেষ করে (ওয়াজিব) আমিন বলবেন (সুন্নাত)। তারপর বিসমিল্লাহি... পড়ে (উত্তম) অন্য যে কোন বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত (ওয়াজিব) অথবা সুন্নতের ১২নং এর বর্ণনা মোতাবেক একটি সূরা (সুন্নত) পড়বেন। অতঃপর আল্লাহ আকবার (সুন্নত) বলার সাথে সাথে রুকুতে যাবেন (ফরয)। সুন্নতের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭নং এ বর্ণিত নিয়মানুসারে রুকু করবেন (সুন্নত) এবং দৃষ্টি পায়ের পিঠের উপর

রাখবেন (আদব)। রুকুতে কমপক্ষে ৩বার (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়বেন (সুন্নত)। অতঃপর "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্", "রাব্বানা লাকাল হামদ্" (সুন্নত) বলার সাথে রুকু থেকে উঠবেন এবং একবার "সুবহানাল্লাহ" বলার সময় পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকবেন (ওয়াজিব)। এবার আল্লাহু আকবার (সুন্নত) বলার সাথে মুস্তাহাব ও আদবের ৪নং এ বর্ণিত নিয়মে (মুস্তাহাব) নিম্নগামী হয়ে সুন্নতের ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭নং-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সেজদা করবেন (ফরয)। সেজদার দৃষ্টি নাকের দিকে রাখবেন (আদব) এবং কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়বেন (সুন্নত)। অতঃপর তাকবীর (সুন্নত) বলার সাথে সুন্নতের ২৮নং এ বর্ণিত নিয়মে (সুন্নত) উঠবেন এবং সুন্নতের ৩০ ও ৩১নং এ বর্ণিত পদ্ধতিতে (সুন্নত) বসবেন। এভাবে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার সময় পরিমাণ বসে থাকবেন (ওয়াজিব)। এ সময় একবার 'আল্লাহুম্মাগফির্লী' পড়বেন (মুস্তাহাব)। অতঃপর আল্লাহু আকবার (সুন্নত) বলার সাথে দ্বিতীয় সেজদায় যাবেন (ফরয) এবং প্রথম সেজদার ন্যায় দ্বিতীয় সেজদা শেষ করবেন। অতঃপর না বসে দ্বিতীয় রাকাতের উদ্দেশ্যে তাকবীর বলার সাথে (সুন্নত) সোজা দাড়িয়ে যাবেন এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবেন; তবে দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে 'সানা' ও 'আউযুবিল্লাহ....' পড়বেন না। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে সূরা ফাতেহা পড়বেন। এরপর প্রথম রাকাতে যে সূরা বা আয়াত পড়েছেন দ্বিতীয় রাকাতে সে আয়াত বা সূরা না পড়ে অন্য আয়াত বা সূরা পড়বেন। দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সেজদা শেষ করে উপরে বর্ণিত দুই সেজদার মাঝখানে বসার পদ্ধতিতে বসবেন। (দুই রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে এই বৈঠক ফরয আর দুই এর অধিক রাকাতের নামায হলে এই বৈঠক ওয়াজিব)। অতঃপর তাশাহুদ পড়বেন (ওয়াজিব)। তাশাহুদের মধ্যে শাহাদাত বাক্য (আশ্হাদু...) পড়ার সময় মুস্তাহাব ও আদবের ৬নং এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ইশারা করবেন (মুস্তাহাব)। তাশাহুদ শেষ করার পর দুই রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে দরূদ শরীফ পড়া (সুন্নত) ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ে (সুন্নত) সুন্নতের ৩৭, ৩৮নং এ বর্ণিত নিয়মে (সুন্নত) দু'বার "আস্সালামু" (ওয়াজিব) "আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্" (সুন্নত) বলার মাধ্যমে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন। আর দু'য়ের অধিক রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে তাশাহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে সানা ও

"আউযুবিল্লাহ...." বাদ দিয়ে শুধু "বিসমিল্লাহ..." (সুন্নত) ও সূরা ফাতিহা আমিনসহ পড়ে (সুন্নত) যথারীতি রুকু সেজদা শেষ করবেন। অতঃপর তিন রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে বসে যাবেন এবং দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ন্যায় নামায শেষ করবেন। আর চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে তৃতীয় রাকাতের সেজদা শেষ করে না বসে চতুর্থ রাকাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং তৃতীয় রাকাতের ন্যায় চতুর্থ রাকাত পড়বেন। চতুর্থ রাকাত শেষ করে বসবেন এবং যথারীতি নামায শেষ করবেন।

জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি

আপনি যখন ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করবেন তখন আউযুবিল্লাহ....., বিসমিল্লাহ....., সূরা ফাতেহা, অন্য সূরা বা কোন আয়াত পড়বেন না। ইমামের পড়াটাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে। আপনি শুধু তন্ময় হয়ে ইমামের পড়া শুনবেন। শোনা না গেলে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এছাড়া বাকী সমস্ত আমল একাকী নামায আদায়কারীর মতই যথারীতি ইমামের অনুসরণে আদায় করবেন।

উল্লেখ্য, মুক্তাদীর জন্য নামাযের নিয়তের সময় ইমামের পিছনে ইক্তেদার নিয়ত করা জরুরী।

ইমামতি করার পদ্ধতি

আপনি যে পদ্ধতিতে একাকী নামায পড়বেন, সে পদ্ধতিতে ইমামতি করবেন। তবে সমস্ত তাকবীর, (আল্লাহু আকবার) "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" এবং সালাম বড় আওয়াজে বলবেন (সুন্নত)। আর ফজর ও জুমা'র সব রাকাআতে মাগরিব ও এশার প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরা বা আয়াত সরবে পড়বেন (ওয়াজিব)।

বিতির নামায পড়ার পদ্ধতি

বিতির নামায তিন রাকাত। প্রথম রাকাত একাকী ফরয নামাযের প্রথম রাকাতে ন্যায় পড়বেন। দ্বিতীয় রাকাত একাকী নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের মত আদায় করবেন। অতঃপর যথারীতি বসে (ওয়াজিব) তাশাহুদ পড়ে (ওয়াজিব) তৃতীয় রাকাতের উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে যাবেন। অতঃপর (বিসমিল্লাহ ...সহ) সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা বা আয়াত

শেষ করে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলবেন (ওয়াজিব) এবং যথাস্থানে পুনরায় হাত রেখে দিবেন। অতঃপর দু'আয়ে কুনুত পড়ে (ওয়াজিব) রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ও সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

সুন্নত ও নফল নামায পড়ার পদ্ধতি

সুন্নত ও নফল নামায পড়ার পদ্ধতি আর একাকী ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি একই। তবে (১) ফরয নামাযের কিয়াম (দাঁড়িয়ে পড়া) ফরয। কিন্তু ফজরের সুন্নত ২ রাকাত ব্যতীত বাকী সমস্ত সুন্নত ও নফলে কিয়াম ফরয নয়। বসে পড়লেও নামায হয়ে যাবে। তবে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে। (২) সুন্নত ও নফলের তৃতীয় ও চতুর্থ তথা প্রত্যেক রাকাআতে 'বিসমিল্লাহ..., পড়া সুন্নত, সূরা ফাতেহা, অন্য সূরা বা আয়াত পড়া ওয়াজিব। (৩) সুন্নতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত অন্য সব সুন্নতে জায়েদা ও নফল এক সাথে চার রাকাত না পড়ে দুই রাকাত করে পড়া যায়। আর যদি এক সাথে চার রাকাত পড়তে মনে চায় তাহলে দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহুদের সাথে দরূদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়া ও তৃতীয় রাকাতের শুরুতে (বিসমিল্লাহ...) এর পূর্বে ছানা ও (আউযুবিল্লাহ...) পড়ে নেয়া উত্তম।

মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি

মহিলাগণ পুরুষদের মতই নামায আদায় করবেন। তবে শুধু নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে পুরুষদের ব্যতিক্রম করবেন।

১। নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় মহিলাগণ দুই পায়ের মাঝে ফাঁক যথাসম্ভব কমিয়ে রাখবেন। (আদব)

২। তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলাগণ চাদর বা কাপড়ের ভেতর হাত রাখবেন, পুরুষদের মত তা বের করবেন না। (আদব)

৩। তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলাগণ শুধু কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবেন। (সুন্নত)

৪। মহিলাগণ দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষদের মত ডান হাতের আঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরবেন না; বরং শুধু ডান হাতের তালু (পাঁচ আঙ্গুলসহ) বাম হাতের পিঠের উপরে রেখে দিবেন। (সুন্নত)।

৫। মহিলাগণ নাভীর নীচে হাত বাঁধবেন না; বরং বুকের উপর বাম হাত রেখে তার উপর ডান হাত রেখে দিবেন। অঙ্গুলি পেঁচিয়ে ধরবেন না। (সুন্নত)

৬। মহিলাগণ রুকুতে শুধু এ পরিমাণ বাঁকা হবেন যে, হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর বেশি বাঁকা হবেন না। (সুন্নত)

৭। রুকুতে মহিলাগণ হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরে মিলিয়ে হাঁটুর উপর রেখে দিবেন। হাঁটু ধরবেন না। (সুন্নত)

৮। রুকুতে হাঁটু ভেঙ্গে সামনের দিকে একটু বাঁকা করে রাখবেন। (সুন্নত)

৯। রুকু অবস্থায় হাতের কনুই ভেঙ্গে বাহু পাঁজরের সাথে, আর হাত রানের সাথে লাগিয়ে রাখবেন। (সুন্নত)

১০। সেজদায় বাহু পাঁজরের সাথে, পেট রানের সাথে আর কনুইসহ হাত জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবেন। (সুন্নত)

১১। সেজদায় মহিলাগণ পা খাড়া করে না রেখে উভয় পা ডান দিকে বের করে বিছিয়ে রাখবেন। (সুন্নত)

১২। মহিলাগণ সেজদা থেকে উঠে বাম নিতম্বের উপর বসবেন এবং উভয় পা ডান দিকে এভাবে বের করে দিবেন যেন ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের উপর থাকে (সুন্নত) এবং আঙ্গুলসমূহকে যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখবেন। তাশাহুদ পড়ার সময়ও মহিলাগণ এভাবেই বসবেন।

বিঃ দ্রঃ মহিলাদের জন্য জামাতে নামায পড়া মাকরূহে তাহ্‌রীমি। ফেৎনার এ জামানায় নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। মহিলাদের জন্য যতটুকু সম্ভব গোপন ও নির্জন স্থানে নামায পড়াই উত্তম। হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলাদের নামাযের উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের নির্জন কোণ। (মুসনাদে আহমদ ও বাইহাকী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট মহিলাদের

সেই নামায বেশি প্রিয়, যা নির্জন ও অন্ধকার কক্ষে পড়া হয়। (ছহীহ ইবনে খুযাইমা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, মহিলাদের ক্ষুদ্র কক্ষের নামায, বড় কামরার নামাযের তুলনায় উত্তম আর ঘরের নির্জন কোণের নামায ক্ষুদ্র কক্ষের নামাযের তুলনায় উত্তম। (আবু দাউদ শরীফ)

অন্য এক হাদীসে আছে, মহিলাদের একা নামায পড়া জামাতে নামায পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব। (মুসনাদে ফেরদাউস)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের নামায যত গোপনে হবে, তত বেশি সওয়াব। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও মহিলাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা জামাতে শরীক হওয়া মোটেও জরুরী বিষয় ছিল না। শুধু মাত্র অনুমতি বা অবকাশের পর্যায়ে ছিল। তবে তাও এ জন্য যে, সে যুগ ছিল সমস্ত ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ। ওহী নাযিল হতো, নতুন নতুন আহকাম আসত, আবার অনেকে ছিল নতুন মুসলমান, যার দরূন নামায, রোযা ইত্যাদির আহকাম শিক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মসজিদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে নামায পড়ার সৌভাগ্য হতো। তারপরও তখন মহিলাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম ছিল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অবকাশ আর থাকেনি। ক্রমশঃ ফেৎনা-ফাসাদও বিস্তার লাভ করতে থাকে, এজন্যই তো ইবনে উমর (রা.) জুম'আর দিন পাথর মেরে মহিলাদের মসজিদ থেকে বের হতে বাধ্য করেছিলেন। আর এ কাজ সাহাবাগণের উপস্থিতিতে হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ পরিস্থিতি দেখতে পেতেন যা প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর মহিলাদের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিষেধ করতেন। (বুখারী শরীফ- খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২০ ও মুসলিম শরীফ- খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৩)

এটা ছিল সেই স্বর্ণযুগের কথা। তাহলে আজ যখন ফেৎনা-ফাসাদ তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি, বিশেষ করে নারী-পুরুষ সকলের অন্তর থেকেই আখেরাতের ফিকির বিদায় নিয়েছে, সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও বিলাসিতার প্রতি সকলেই ঝুঁকে পড়েছে- এমতাবস্থায় কিভাবে মহিলাদেরকে পুরুষদের জামাতে শরীক হতে অনুমতি দেয়া যায়? এ জন্যই ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহ্রীমী। তা ওয়াক্তিয়া নামাযের জন্য হোক অথবা জুমা বা ঈদের নামাযের জন্য হোক। কিন্তু যদি ঘরের মাহ্রাম ব্যক্তিগণ ঘরে জামাত করেন, তাহলে তাদের সাথে জামাতে শরীক হওয়া দোষণীয় নয়। তবে এ অবস্থায় মহিলাগণ পুরুষদের একেবারে পিছনে দাঁড়াবেন। পাশাপাশি কখনও দাঁড়াবেন না। *

.....

...

* আলোচনা পরিপূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের লিখিত 'পাঁচওয়াক্তের হাদিয়া' বই থেকে মাসায়েল অংশটি জুড়ে দেয়া হল।

ইলম অর্জনের পথে সাধনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.[46]

وقال تعالى : إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .[47]

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ার দিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন; শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ, দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন; আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হল দীন; এ দীনের নিসবতে এবং এ দীনের মহব্বতে আমাদের সমস্ত আয়োজন। আমাদের এ কওমী মাদরাসাগুলো দীনের কল্যাণেই প্রতিষ্ঠিত। এ সমস্ত ইসলাহী মাহফিল ও মজলিসগুলোও শুধু দীনের জন্যই। আল্লাহপাক আমাদেরকে এ দীনের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন–এটা তাঁর এহসান ও দয়া।

সৃষ্টিকুল মানুষের কল্যাণেই সৃজিত

পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আল্লাহপাকের যত সৃষ্টি আছে সবগুলো একমাত্র মানুষের উপকার ও কল্যাণেই সৃজিত। তাই তো মানুষ গরু মহিষ ছাগল দুম্বা ভেড়া মোরগ ইত্যাদি জবাই করে খায়। কোনোটা

৪৭. সূরা যুমার : ৯
৪৮. সূরা ফাতির: ২৮

দিয়ে হাল চাষে। এগুলো আল্লাহপাকের মাখলুক। এই খাওয়াটা কি মানুষের জন্য হালাল, না হারাম? সম্পূর্ণভাবে হালাল। কেন হালাল? আল্লাহপাক মানুষ ও প্রাণী সবার সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহপাক নিজে বলে দিয়েছেন–

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ –তোমাদের জন্য গবাদি পশু খাওয়া হালাল করা হয়েছে।–সূরা মায়েদা-১

তাই এখানে এ ধরণের প্রশ্ন তোলা ঠিক নয় যে, প্রাণী ও জীব হত্যা অমানবিক। আল্লাহর হুকুমের সামনে কারও কোনো মন্তব্য চলবে না। কেন? যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি ঐ গরু-ছাগলকেও বানিয়েছেন। তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন তোমরা এগুলো খাও। তবে নিয়ম মত খাও এবং খেয়ে আমার শুকরিয়া আদায় কর।

কোনো মানুষ ফেরেশতার উপকারে আসে না। কিন্তু ফেরেশতা মানুষের উপকারে আসে। মানুষ ফেরেশতার উপকার করতে পারে না; কিন্তু ফেরেশতা মানুষের উপকার করে। অগণিত-অসংখ্য ফেরেশতা মানুষের উপকারে নিয়োজিত। কেননা ফেরেশতারাও মাখলুক। আর সকল মাখলুকই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল আমরা যেন আমাদেরকে চিনি। আমরা যেন চিন্তা করি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে কত দামি করে বানিয়েছেন। কুল কায়েনাত যাদের জন্য বানিয়েছেন তাদের চেয়ে আর দামি কী হবে? আমরা তো কল্পনাও করতে পারি না যে, আল্লাহপাক আমাদের জন্য কী কী মাখলুক বানিয়ে রেখেছেন। আমরা তো চোখ দিয়ে আসমান-জমিন, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, আগুন-পানি, বৃক্ষলতা, পশু-পাখি ইত্যাদি দেখি। এগুলোর বাইরে আরও কত কিছু পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার করে তা আমরা দেখি না এবং অনুভবও করতে পারি না। এগুলো আল্লাহপাক বানিয়ে রেখেছেন মানুষের উপকারের জন্য।

তন্মধ্যে অনেকগুলো তো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন। আর অনেকগুলো তাদের আবিষ্কারের ঊর্ধ্বে রয়ে গেছে। বলুন তো আবিষ্কৃত-অনাবিষ্কৃত কুল কায়েনাত কার জন্য বানিয়েছেন? মানুষের জন্য। মানুষের ক্ষতির জন্য কিছু বানানো হয়নি। মনে রাখবেন, মানুষের ক্ষতির জন্য আল্লাহপাক কিছুই বানাননি।

সাপ কেন সৃষ্টি করা হল

বলুন তো, আল্লাহপাক পৃথিবীতে বিষাক্ত ও বিভৎস সাপ কেন বানিয়েছেন? সাপও মানুষের উপকারের জন্য বানিয়েছেন। কারণ মানুষ যে অঞ্চলে বাস করবে সে অঞ্চলটা মানুষের বসবাসের উপযোগী হতে হবে। মানুষ বসবাসের উপযোগিতার জন্য সেখানে বিভিন্ন রকম প্রতিষেধক থাকতে হবে। সাপের শ্বাস-প্রশ্বাসে অনেক রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়। আমরা তো দেখি সাপ মানুষকে কামড়ায়। বলুন তো, এ পর্যন্ত কয়টা সাপ কয়টা মানুষকে কামড় দিয়েছে? আর মনে রাখবেন, সাপ মানুষকে এমনিতেই কামড় দেয় না। সাপ মানুষকে ঐ সময় কামড়ায় যখন সে বুঝতে পারে মানুষটি তাকে আঘাত হানবে। তখন সে কেবল আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করে। সাপ নিজে নিজে বলে, মানুষ আমাকে আঘাত করার আগে আমি তাকে আক্রমণ করে বসব। তবে অনেক সময় সাপের অনুমানটা ভুল হয়ে যায়। আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, সাপ বাচ্চাদেরকে কামড় দিয়েছে এর নজীর অনেক কম। সাপ সাধারণত বড়দেরকে কামড়ায়। বাচ্চারা হাত-পা নাড়াচড়া করলে কামড়ায়। তখন মনে করে বাচ্চাটি বুঝি আঘাত করবে। আর বড়দেরকে কামড়ায় এই মনে করে যে, লোকটি আমাকে আঘাত করবে। তাই তার আঘাতের আগেই সে দংশন করে বসে। অনেক সময় এমনও হয় যে, একটি নিরীহ মানুষ সাপ দেখে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। এ দিকে সাপ মনে করে যে, লোকটি বুঝি তাকে মারার জন্য এমন করছে। তাই ভুল অনুমানের উপর ভিত্তি করে সাপ ছোবল মেরে বসে।

যাই হোক, কামড় না হয় দু'একটা দিল। সাপের কামড়ে না হয় দু'চারজন মানুষ মারা গেল; কিন্তু সাপের উসিলায় বাঁচল কত কোটি মানুষ? এর হিসাব রাখেন কিনা। অনেক রোগ-ব্যাধি এমন আছে যার একমাত্র ঔষধ এ সাপের বিষ। একে تریاق (তিরইয়াক) বলে। গুলিস্তঁা কিতাবে আছে– تا تریاق از عراق آورده شود ما رگُزیده مرده شَوَد ইরাক থেকে তিরইয়াক আনার পূর্বেই রোগী মারা যাবে।

তিরইয়াক মূলত সাপের বিষ। সাপের মাঝে দু'রকমের জিনিস রয়েছে। একটা হল সাপের বিষাক্ত পদার্থ। যেটা মানুষকে দংশন করার সময় প্রয়োগ করে। এটার কারণে দেহ বিশিষ্ট মানুষটা মারা যায়। কিন্তু উপরে তার মাথার মধ্যে আরেকটি জিনিস রয়েছে। যাকে তিরইয়াক

বলা হয়। এটি তার বিষক্রিয়া দূর করার প্রতিষেধক। এই তিরইয়াক কেবল সাপের বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক নয় বরং অনেক জটিল জটিল রোগের বা বিষাক্ত জিনিসের প্রতিষেধক ।

যাই হোক, এ বিশ্লেষণে যাওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হল পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহপাক মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

মশা-মাছি কেন সৃষ্টি করা হল

বলতে পারেন, মশা কেন সৃষ্টি করেছেন? মশাও মানুষের উপকারের জন্য বানিয়েছেন। মাছি কেন বানিয়েছেন? মাছিও মানুষের উপকারের জন্য বানিয়েছেন। মাছির ভনভন ভালো না লাগলেও তা মানুষের উপকারেই সৃজিত। মাছি যদি সমাজে না থাকে তাহলে সমস্যা আছে। মাছি কিন্তু সব জায়গায় থাকে না। যে জায়গায় বৃষ্টি বেশি হয় সেখানে মাছি বেশি। বৃষ্টির কিছু ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। তা দূর করার জন্য মাছির সৃষ্টি। মাছি না থাকলে মিনিটে মিনিটে মানুষ মারা যাবে।

মোটকথা সব জিনিস আল্লাহপাক মানুষের জন্য বানিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .[48]

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।

বুদ্ধিমান কে

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ .[49]

বুদ্ধিমান হল তারা যারা আল্লাহকে ভুলে না। আল্লাহকে স্মরণে রাখে। কখন? দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়। এ তিন অবস্থার বাইরে মানুষের আর কোনো অবস্থা আছে? এ তিন অবস্থা ছাড়া মানুষের আর

৪৯. সূরা আলে-ইমরান : ১৯০
৫০. সূরা আলে-ইমরান : ১৯১

কোনো অবস্থা নেই। অর্থাৎ যারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর যিকির ও স্মরণে লিপ্ত থাকে তারা বুদ্ধিমান। আর বুদ্ধিমানরা কী কাজ করে?

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.[50]

আসমান-জমিনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। চিন্তা করে, এগুলো কে সৃষ্টি করল? কেন সৃষ্টি করল?

আর চিন্তা-গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে সেটা হল–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا.[51]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রব।

রব কাকে বলে? যখন যার জন্য যেটা যে পরিমাণে প্রয়োজন তখন তার জন্য সেটা সে পরিমাণে দিয়ে যিনি লালন-পালন করেন তাকে রব বলে। এজন্য আয়াতে খেতাব বা সম্বোধন করেছে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا হে আমার রব! গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করে দেখলাম পৃথিবীর কোনো একটা মাখলুকও তো আপনি অনর্থক বানাননি। মশাও আমার জন্য বানিয়েছেন। মাছিও আমার উপকারের জন্য বানিয়েছেন। সাপও আমার উপকারের জন্য বানিয়েছেন। কোনোটাই অনর্থক পয়দা করেননি। সবকিছুই উদ্দেশ্যগতভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

যাই হোক, পৃথিবীর সকল সৃষ্টি কার জন্য? মানুষের জন্য। মানুষের চিন্তা করা দরকার তার জন্য আল্লাহপাক কেমন ব্যাপক আয়োজন করে রেখেছেন। কারো একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের বাবা দুনিয়াবী অঢেল সম্পদের মালিক। এ মেয়ের বিবাহের সময় তার বাবা বরের জন্য কেমন আয়োজন করে? কী পরিমাণ আয়োজন করে? ঐ আয়োজন দেখে অনেকে অবাক হয়ে যায়। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্যের কথা! আল্লাহপাক মানুষ নামক বরের জন্য যে ব্যাপক আয়োজন করেছেন তা দেখে সে অবাক হয় না। চিন্তাও করে না যে, আমার জন্য আমার মাওলা কী আয়োজন করে রেখেছেন।

یہ زمین میرے لئے ہے آسماں میرے لئے
ہے مصروف خدمت کل جہاں میرے لئے

৫১. সূরা আলে-ইমরান : ১৯১
৫২. সূরা আলে-ইমরান : ১৯১

حرکت انجم وافلاك دور شمسی کا نظام
چل رہا ہے دیر سے یہ کا روا ں میرے لئے
ایك میرے دم سے ہے اس بزم عالم کا فروغ
وقف خدمت ہے یہ سب کون ومکان میرے لئے

এ যমীন আমার জন্য বানিয়েছেন, আমাকে যমীনের জন্য বানাননি। এই আসমান আমার জন্য বানিয়েছেন, আসমানের জন্য আমাকে বানাননি। এ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সী যা কিছু তার কক্ষপথে চলছে সবকিছু আমার জন্য বানিয়েছেন।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, এত আয়োজন করে আল্লাহপাক মানব জাতিকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন?

کیو ں نہ ہو روز ازل میں ہو چکی تقسیم کار
میں ہوں مالك کیلئے اور دوجہاں میرے لئے

আল্লাহপাকের সাথে আমাদের একটা চুক্তি আছে। একটা বণ্টন আছে। আল্লাহপাক একটা বণ্টন করে দিয়েছেন যে, গোটা দুনিয়াতে যা কিছু আছে আমি সব তোমাদের ভোগ ও উপকারের জন্য বানালাম আর তোমাদেরকে শুধু আমার জন্য বানালাম। আর কারো জন্য নয়।

শুধু দুনিয়া ও দুনিয়ার বস্তু নয়; বরং আখেরাত ও আখেরাতের বস্তুসমূহও মানুষের জন্য বানিয়েছেন।

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, আমরা সবাই যেন নিজের অবস্থা ও দাম বুঝি। যারা মুমিন তারাও যেন নিজের মূল্য অনুধাবন করি। যারা নাস্তিক তারাও নিজেদের মূল্য বোঝা দরকার। যারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তারাও নিজেদের দাম বোঝা দরকার যে, পৃথিবীর সব কিছু যেহেতু আমাদের জন্য বানানো হয়েছে তাই আমাদের অনেক দাম ও মূল্য রয়েছে।

ইলম শেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আর এ বিষয়গুলো বোঝার জন্য আল্লাহ তাআলা ইলমের ধারা চালু করেছেন। ইলম আল্লাহকে চেনার জন্যই দেয়া হয়েছে।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেন–

چو شمع ازپائے علم باید گداخت
که بے علم نتواں خدا را شناخت

ইলমের পিছনে মোমের মত গলে যাওয়া উচিত। কেননা ইলম ছাড়া আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় না।

এ জন্য আল্লাহপাক ইলমকে ফরজ করেছেন। কিছু অংশ ফরযে আইন, আর কিছু অংশ ফরজে কেফায়া। ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করা সবার জন্যই ফরজ।

আজ দুনিয়াতে যত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এর মূল কারণ হচ্ছে উভয় পর্যায়ের ফরজ ইলম মুসলমানদের জানা না থাকা। আল্লাহপাক যাদেরকে ইলমের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন তারা কত ভাগ্যবান!

ইলম শিখতে হয় সাধনা করে

এ যমানায় ইলম হাসিল কারার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সবচেয়ে উচ্চতর পদ্ধতি তো হলো মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ইলম অর্জন করা। আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর নেসাব ও শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যে এখানে গভীর মনোযোগের সাথে পড়া-লেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। বস্তুতঃ ইলম এভাবেই অর্জন করতে হয়। যে জিনিস যত দামি হয় তা অর্জন করতেও কষ্ট বেশি করতে হয়। অনেক সাধনা করতে হয়।

اَلْعِلْمُ عِزٌّ لا ذُلَّ فِيه * وَ يُحْصَلُ بالذُّلِّ لَا عِزَّ فِيْه

ইলম শুধু ইজ্জত আর ইজ্জতের জিনিস। এর মধ্যে যিল্লতির কোনো গন্ধও নেই। তবে **وَيُحْصَلُ بِالذُّلِّ لا عِزَّ فِيه** এ ইলম হাসিল করতে হয় এমন যিল্লতির ভেতর দিয়ে যার মধ্যে ইজ্জতের নাম-গন্ধ নেই। ইলম আগাগোড়া ইজ্জতের জিনিস; কিন্তু তা অর্জন করতে হয় বেইজ্জতির মাধ্যমে। যিল্লতি ও বেইজ্জতি সহ্য করে ইলম অর্জন করতে হয়। এজন্য যারা ইলম অর্জনের যমানায় ইজ্জত-সম্মান চায়, ভালো খাওয়া-পরা চায় আল্লাহ তাদেরকে ইলম দেন না।

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। ইলম অর্জনের সময়কালে যারা ইজ্জত-সম্মান ও শান-শওকত চায় আল্লাহপাক তাদেরকে ইলম দেন না। ইলম তো ওরা পায় যারা এ ইলম অর্জনের পিছনে সর্বপ্রকার যিল্লতি

বরদাশত করে। কী খেলাম, আর কোথায় থাকলাম–এর ফিকির নেই। কী কাপড় পরিধান করলাম, মোটা, না পাতলা, শীতের উপযুক্ত, না গরমের উপযুক্ত–তালিবে ইলমের কাছে এসবের খবর নেই। এসবের খবর নেয়ার সময় কোথায় তার!

শিক্ষণীয় ঘটনা

এবার ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ। দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খে সানী- আমরা যার কাছে হাদীস পড়ার তৌফিক পেয়েছি এবং এখনও যিনি সেই পদে আছেন- বড় মাপের বুযুর্গ ও আলেম শায়খ আব্দুল হক আজমী (দা.বা.)। তিনি এখন খুব বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় আছেন। এ বুড়ো বয়সেও দরস-তাদরীস সবই চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজ থেকে পনের ষোল বছর আগের কথা। তিনি তখন বাংলাদেশে সফরে ছিলেন। যে দিন তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাবেন তার আগের রাতে তিনি বসুন্ধরা মাদরাসায় ছিলেন। হুজুরের কাছে আমিও ছিলাম। আমরা হযরতের সামানাপত্র গুছানোর কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ অনেকগুলো গাড়ী এসে মাদরাসার গেইটে থামল। প্রথম গাড়ীটি থেকে নামলেন করাচীর হযরত হাকীম আখতার সাহেব (রহ.)। তিনি বের হয়েই বারবার বলতে লাগলেন, হযরত আব্দুল হক আজমী কোথায়? আমরা বললাম, হুজুর এ কামরায় আছেন। তিনি এলেন। এসে বললেন, সবাই বের হয়ে যেতে হবে। হযরতের সাথে আমার একান্ত কিছু আলাপ আছে। আমরা বের হয়ে গেলাম। কামরায় শুধু তারা দু'জন। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। চার-পাঁচ মিনিট পর দরজা খুলে বের হয়ে সোজা গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আমরা আবার হযরতের কামরায় গেলাম। হযরত বললেন–

تم جانتے ہوں حکیم صاحب کیوں تشریف لائے؟

তোমরা জানো, হাকীম সাহেব কেন এসেছিলেন? আমরা বললাম, কেন? তিনি বললেন, مجھے ھدیہ دینے کیلئے আমাকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। কেন হাদিয়া দিতে এলেন, এর কারণ বলার আগে তিনি একটি কথা বলেছেন–

آج کل طلبه اکابر کي انتها دیکھتے ھیں ابتدا نھیں دیکھتے

আজকাল মাদরাসার তালেবুল ইলমরা মুরব্বীদের শেষ অবস্থা দেখে। শুরু অবস্থা কেউ দেখে না।

এরপর হাদিয়া দেয়ার ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, আমি (আব্দুল হক আজমী) ও হাকীম আখতার সাহেব ভারতের ফুলপুর মাদরাসায় পড়তাম। মাওলানা আব্দুল গনী ফুলপুরী (রহ.) নামে হযরত থানভী (রহ.)-এর একজন খলীফা ছিলেন। সেটি তাঁর মাদরাসা। সেই ফুলপুর মাদরাসায় আমি ও হাকীম আখতার সাহেব পড়া-লেখা করতাম। হাকীম আখতার সাহেব ছোটবেলা থেকেই খুব নেককার-পরহেজগার ছিলেন। ইবাদতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। পড়া-লেখার প্রতিও খুবই মনোযোগী ছিলেন। তবে তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। মাদরাসা থেকে দু'বেলা যে খাবার দেয়া হত তা খেয়েই দিন কাটাতেন। বাড়ী থেকে টাকা-পয়সা আসার ব্যবস্থা ছিল না। খুব অসহায় অবস্থায় ছিলেন। এ জন্য তিনি নাস্তা করতেন না। বিষয়টি কাউকে বুঝতেও দিতেন না। আমার সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল বিধায় আমি জানতাম। তাই আমি তাকে প্রায় সময় নাস্তা করাতাম। সেখান থেকে আমার প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে তা এখনও আছে। সব সময় যোগাযোগ আছে। যদিও আমি থাকি ভারতে আর তিনি থাকেন পাকিস্তানে। তিনি জানতেন এখন আমি বাংলাদেশে আছি। এজন্য তিনি বন্ধুত্বের হক আদায় করার জন্য এখানে এসেছেন।

বুদ্ধিমান তালেবুল ইলম

ওহে তালিবে ইলম ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখ, হাকীম সাহেব এখন কত বড় হয়েছেন। এখন তিনি চললে একা চলেন না। তাঁর পিছনে মানুষের ঢল নামে। গাড়ির বহর চলে। এই মর্যাদা তাঁকে আল্লাহপাক ছাত্র যমানায় কঠিন মেহনতের কারণে দিয়েছেন। কিন্তু এখনকার ছাত্ররা দেখে কোন হুজুর কেমন শান-শওকতে চলেন। কোন হুজুর কেমন পরিপাটি জামা-কাপড় পরেন। তারা হুজুরের শেষ অবস্থা দেখল কিন্তু শুরুর অবস্থা দেখল না। এরা বোকা ছাত্র। কেউ না বলুক আমি বলি,

এসব তালেবুল ইলম বোকা তালেবুল ইলম। বুদ্ধিমান কে? বুদ্ধিমান তো তারা যারা আকাবির ও বুযুর্গানে দীনের শুরু অবস্থাটা দেখে মেহনত করে করে নিজেকে দামী বানায়। আমরা এমন বোকা হতে চাই না। আমরা সবাই বুযুর্গদের মেহনতী জীবন দেখব। আমরা দেখব তারা ইলমের পিছনে কী পরিমাণ মেহনত করেছেন, কেমন কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং কী ধরনের একাগ্রতা অবলম্বন করেছেন।

কওমীতে পড়েও সরকারী মাদরাসায় পরীক্ষা দেয়া

আমাদের তালেবুল ইলমরা তো একেকজনে বত্রিশ রকমের কাজ করে। সব কিছুর ভিতর দিয়ে এলেম পেতে চায়। কওমী মাদরাসার কিছু কিছু ছাত্র গোপনে আলিয়ার নেসাব পড়ে এবং সেখানে গিয়ে পরীক্ষা দেয়। আচ্ছা! এসব করে কতটুকু এগুতে পারবে। আল্লাহ যদি এগিয়ে না দেন তাহলে কেউ এগুতে পারে না। দুই নৌকায় পা দেয়া ভালো নয়। তাই হাকীকতের উপর থাকা চাই। আমাকে খাওয়াবেন আল্লাহ। পালবেন আল্লাহ। আমি আল্লাহর জন্য নিজের জীবন ওয়াকফ করে দিলাম এবং ভবিষ্যতেও দিব। আল্লাহ আমাকে খাইয়ে রাখলেও রাজি, উপোস রাখলেও রাজি।

আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহ কি তাকে না খাইয়ে রাখবেন? দুনিয়ার একটা সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে যদি কেউ আসে এবং সারাক্ষণ তার জন্যই সময় দেয়, সে কি তাকে খেতে দিবে না? দুনিয়াতে যে সবচেয়ে নির্বোধ সেও তো তাকে খানা দিবে। কারণ, যে লোকটি আমাকে উদ্দেশ্য করে এসেছে, আমার জন্য সময় দিচ্ছে, আমাকে উদ্দেশ্য করে এখানে থাকছে; আমি খাব আর তাকে খাওয়াব না- এটা বিবেকে ধরে? একজন সাধারণ মানুষই যদি এমনটা না করে তাহলে আল্লাহপাকের ক্ষেত্রে এটা কী করে সম্ভব? এটা কি হতে পারে যে, কেউ তার জীবনকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করল আর আল্লাহ তাকে খাওয়াবেন না। যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না আল্লাহপাক তো তাদেরকেও খাওয়ান। নাস্তিক-মুরতাদদেরকে খাওয়ান। আমরা যারা আল্লাহর জন্য জীবন ওয়াক্‌ফ করে দিব আমাদেরকে আল্লাহপাক খাওয়াবেন না–এটা কল্পনা করাও ভুল। আর আল্লাহপাক যে খাবার খাওয়াবেন সেটা খুব ইজ্জতের খানা হবে। এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে।

একটি ঘটনা

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বলখের বাদশা ছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহর জন্য সব ছেড়ে দিয়েছেন। দীনি বুঝ আসার পর সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যান। রাজকীয় জীবন ছেড়ে সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। একবার এক মসজিদে গিয়ে এশার নামায পড়েছেন। রাত হয়ে গেছে। এখন আর কোথায় যাবেন। তাই নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হন না। চুপচাপ বসে আছেন। ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেব তাকে চিনেন না। তারা মনে মনে হয়ত ভাবছিলেন, লোকটি কে? কোথা থেকে এলো? নামায শেষ তবুও যাচ্ছে না কেন? আমরা খাবার খাব। মানবতার খাতিরে হলেও তো তাকে আমাদের খাবারে শরিক করতে হবে। এতে তো আমাদের ভাগে কম পড়ে যাবে। তাই বললেন, ভাই আপনি চলে যান, মসজিদ বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি জবাব দিলেন, আমি রাতে মসজিদে থাকব। আমার খানা-পিনার চিন্তা আপনাদের করতে হবে না। তখন তারা আর কিছু বলল না। থাকার অনুমতি দিল।

মনে রাখবেন, সফর অবস্থায় মুসলমানদের থাকার সবচেয়ে ভালো স্থান হলো মসজিদ, হোটেল নয়। মসজিদে থাকবেন। মুসাফিরের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুধু জায়েযই নয়; বরং পছন্দনীয়। মুসলমান মুসাফির মসজিদে থাকবে। আরাম করবে, ঘুমাবে, নামায কলাম করবে। মসজিদে থাকার অবকাশ শুধু তাবলীগ জামাতের জন্যই নয়। যারা মুসাফির তাদের জন্যও অবকাশ রয়েছে। অনেকে বলে, মসজিদে আবার থাকে কিভাবে? আরে মসজিদে থাকা জায়েয আছে বিধায়ই তো থাকে।

এবার মূল ঘটনায় আসি। ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেব দস্তরখানে তাদের খাবার নিয়ে বসেছেন। ঘটনাক্রমে আজ তাদের খানার সাথে অতিরিক্ত কিছু খাবার এসেছে। খাবার ছিল খুব উন্নতমানের। মোরগ পোলাউ। ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাবলেন, খানা যখন বেশি আছে তাই মসজিদে অবস্থানরত মুসাফির লোকটিকে দাওয়াত করি। তাই ইবরাহীম আদহামকে বললেন, আসুন, আমাদের সাথে খাবারে শরীক হোন। তিনি বললেন, আমি এসব খাবার খাই না। আমি মোরগ পোলাউ খাই। ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেব বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন মোটে খানা পায় না, আবার মোরগ পোলাউ চায়। শেষে বললেন, আসুন মোরগ পোলাউ আছে। তিনি বললেন, আমি বাসি খাবার খাই না। আমি তাজা

ও গরম মোরগ পোলাউ খাই। এবার তারা আরো বিস্মিত হলেন যে, এ কোনো পাগল কিনা। মোটে খাবারই পায় না। আবার গরম মোরগ পোলাউ চায়। তিনি না আসায় ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেব খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। কতক্ষণ পর কে যেন এসে দরজায় আঘাত করল। ইমাম বা মুয়াজ্জিন কেউ গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। অবাক কাণ্ড! আগন্তুকের হাতে একটি প্লেটে সুন্দর করে সাজানো মোরগ পোলাউ। প্লেট থেকে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। লোকটি বলছে, এখানে একজন মেহমান আছেন? জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছেন। বলল, প্লেটটি তাকে দিন। প্লেটটি মেহমানের সামনে রাখা হলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি এমন খাবারই খাই।

দোস্ত! আর কিছু বলার দরকার আছে? রহস্য কোথায়? রহস্যটা হলো মাওলায়েপাকের সাথে সম্পর্ক গড়ার মাঝে। ইবরাহীম ইবনে আদহামের কুরবানী ছিল বড়, তাই নিয়ামতও পেয়েছেন বড়। তিনি শাহী বালাখানার মোরগ পোলাউ ছেড়ে এসেছেন তো তেমন মোরগ পোলাউ পেয়েছেন। আমরা তো রুটি ও ডাল ভাতও পাই না। ডাল ভাত না হয় পাই; কিন্তু ভাত গোস্ত পাই না। এমন কেন? আমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়ে এ ডাল ভাতকে মোরগ পোলাউ বানিয়ে নিতে পারি না।

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندہ سے پوچھے بتا تیرا رضا کیا ہے

ব্যক্তিত্বকে এত উন্নত কর যেন প্রত্যেক ভাগ্য নির্ধারণের পূর্বে খোদা স্বয়ং মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন, বল তুমি কিসে রাজি?

রিযিক আল্লাহর হাতে

যাই হোক, আল্লাহপাক আমাকে কুরবানী অনুযায়ী ইজ্জত দান করবেন। তবে আমাকে ইলম অর্জনের জন্য যিল্লতী বরদাশত করতে হবে। ঐ হাকীম আখতার সাহেবের পড়া-লেখার যমানাটা আমাদের জিন্দেগীতে আনতে হবে। তারপর শেষ অবস্থাটা আল্লাহপাকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে আমরা পড়ব না। একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য পড়ব। আল্লাহপাক আমাকে যে অবস্থায় রাখেন সেটাই আমার কাম্য। আল্লাহপাক কাউকে কোনো দিন কষ্ট দিয়ে

রাখবেন না। আসলে আমাদের ঈমানের মধ্যে অনেক কমতি। সাবারই ঈমানের কমতি। আমার ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমতি। আসল সমস্যা আমাদের দিলে। আমাদের ঈমানের হালত ভালো না। মাদরাসায় এবং মাদরাসার বাইরে যারা আছি এক্ষেত্রে বেশি একটা তারতম্য নেই। সবার দিলের প্রায় একই হালত। আল্লাহপাক দুনিয়াতে তাঁর কাছে সব চাইতে পছন্দনীয় যে কাজ তথা ইলম হাসিল করার কাজে আমাদেরকে লাগিয়েছেন এজন্য খুব বেশি বেশি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আমরা যারা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে লেখা-পড়া করতে পারি না তারা কিভাবে ইলম শিখব? পূর্বে বলে এসেছি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ইলম অর্জন করা হল সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতি। এরপরের পদ্ধতি হল উলামায়ে হক্কানী রব্বানীর মজলিসে বসা। যারা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে পড়া-লেখা করার বয়স পার করে ফেলেছেন তাদের জন্য কি ইলম শিখার পথ বন্ধ হয়ে গেছে? না। তাদেরও সুযোগ আছে। তারা উলামায়ে হক্কানীর মজলিসে বসবে এবং উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস থেকে যা বলবেন তা শুনে শুনে আমল করবে। এমনিভাবে ফাযায়েলে তা'লীমের হালকা থেকে আমল শিখবে।

ইলমের সর্বনিম্ন পরিমাণ

ইলমের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ঐ পরিমাণ যতটুকু জানলে একটা মানুষ কোনো রকম ঈমানদার হয়। ঈমানদার হতেও কিন্তু এক ধরনের ইলম লাগে। নাস্তিকদের মাঝে ঐ পরিমাণ ইলমও নেই। এজন্য তারা ঈমানদার হতে পারেনি। আল্লাহ একজন আছে এটা ইলমের কথা, না জাহালাতের কথা? এটা জ্ঞানের কথা, না মূর্খতার কথা? জ্ঞানের কথা। তো যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না তাদের এতটুকু ইলম ও জ্ঞান নেই। এরা অন্য কোন দিক দিয়ে কি জ্ঞানী সেটা আমরা জানি না, তবে এ ঈমানের লাইনে যে তারা কেবল মূর্খই নয়; বরং মহামূর্খ কিংবা গণ্ড মূর্খ- এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক কী পরিমাণ ইলম দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন–

اِنَّمَا اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

'আগের পরের যত ইলমওয়ালা মানুষ, ফেরেশতা, জিন রয়েছে তাদের সকলের ইলম আমাকে দেয়া হয়েছে।'

অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে হবে–সকলের ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। তাহলে অনুমান করা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কী পরিমাণ ইলম ছিল! এত কিছুর পরও আল্লাহপাক তাঁকে দু'আ শিখিয়ে দিচ্ছেন 'হাবীব! আপনি দু'আ করুন– رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا –হে আল্লাহ! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন।'

ইলম আল্লাহপাকের কাছে কত প্রিয় হলে এভাবে দু'আ শিখিয়ে দেন। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহপাক ঐ ধরনের মু'জিযা দিয়েছেন যে ধরনের মু'জিযা দ্বারা তাঁর কওম তাকে সহজে মেনে নিতে পারে। আর আমাকে দেয়া হয়েছে ইলম। নবীজির মু'জিযার নাম হল ইলম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক মু'জিযা আছে। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা আছে। আঙ্গুল দিয়ে পানি বের হওয়ার মু'জিযা আছে। এমন বিস্ময়কর যত মু'জিযা রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল ইলম। আর এ ইলমের কেন্দ্র হল কুরআন শরীফ। আল্লামা ইকবাল (রহ.) কুরআনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন–

مجھ میں بھرے ہوئے علوم و فنون ہیں
نام میرا قرآن، میں اُمُّ الکتاب ہوں

আমার মাঝে সকল ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গচ্ছিত রাখা হয়েছে।
আমার নাম কুরআন, আমি সকল গ্রন্থের আকরগ্রন্থ।

এ ইলম অর্জন করতে পারা কতটুকু সৌভাগ্যের বিষয়! আমরা যারা মাদরাসায় পড়ি তাদের কতটুকু শোকরগুজার হওয়া উচিত। আর আমরা যারা মাদরাসায় পড়ি না, তবে আল্লাপাক এ ইলমের ধারাবাহিকতার সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন, আমরা তা'লীমের হালকা ও উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসে ইলম হাসিল করব। আমাদেরও শোকর আদায় করতে হবে।

প্রকৃত ইলম কোনটি

আর মনে রাখবেন ইলম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। আর প্রকৃত ইলম ওটা যার মাধ্যমে আল্লাহপাকের পরিচয় লাভ হয়। আর আল্লাহপাকের পরিচয় কার মাঝে আছে? আল্লাহপাকের পরিচয়ের ফলাফল কী? কুরআন বলে–

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ –(سورة الفاطر :28)

যার মধ্যে ইলম আসবে সে আল্লাহপাকের যাত-সিফাত সম্পর্কে বুঝবে, নিজের সম্পর্কেও বুঝবে। আর এর ভিতর থেকে তার মধ্যে একটি আলামত প্রকাশ পাবে। তার জীবনে এর একটি ফল প্রকাশ পাবে। তা এভাবে যে, তার জিন্দেগীতে অটোমেটিক আল্লাহর ভয় চলে আসবে। সে আল্লাহপাকের কোনো নাফরমানী করতে পারবে না। একা একা এবং গোপনেও গুনাহ করতে পারবে না, প্রকাশ্যেও পারবে না।

ইলম একটা গাছ। তার ফল হল আল্লাহর ভয়। এজন্য এ ইলম নিয়ে খুব বেশি বেশি ফিকির ও মেহনত করা উচিত।

ইলমের শান বজায় রাখতে হবে

ইসলামের প্রাক্কালে হাতেমতাঈ নামে এক বড় দানবীর ছিলেন। গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দানবীর ছিলেন বিধায় কাউকে বড় দাতা বলতে গিয়ে 'হাতেমতাঈ' বলা হয়। তিনি অনেক বড় আখলাকী ও নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ইসলামের যামানা পাননি। যদি পেতেন তাহলে এ ধরনের ভালো মানুষটি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করতেন। জাহিলিয়াতের যুগেও দু'চারজন ভালো মানুষ ছিল। সে প্রবাদতুল্য দাতা হাতেমতাঈ বলেন–

وَنَفْسَكَ اَكْرِمْهَا فَاِنَّكَ اِنْ تُهِنْ * عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقٰي مِنَ النَّاسِ مِنْ مُكْرِمًا

নিজের কদর নিজে কর, নিজের দাম নিজে বুঝ। কারণ তুমি যদি হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যাও, তাহলে পৃথিবীতে এমন কাউকে পাবে না যে তোমাকে সম্মান দিবে, কদর করবে।

তাই তালিবে ইলমকে নিজের ইজ্জত-আব্রুর হিফাজত নিজেকেই করতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেটা তালেবুল ইলমের শানের খেলাফ। এমন কোনো মজলিসে যোগদান করা যাবে না যেটা তালেবুল ইলমের শানের খেলাফ। দোকানে বসে চা-নাস্তা করা এবং

আড্ডা দেওয়া উচিত নয়। মাদরাসা বন্ধ হলেও তোমার জায়গা দোকান নয়। কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে তাড়াতাড়ি কিনে চলে আসবে। ফাসেক-ফুজ্জারদের সাথে ওঠা-বসা করা যাবে না। অন্যদের সাথে খুব বেশি মাখামাখি করা যাবে না। সর্বদা চিন্তা করবে, আমি তো তালেবুল ইলম। মাদরাসা খোলা অবস্থায়ও আমি কিতাব পড়ব, বন্ধেও পড়ব। বুযুর্গদের জীবনী পড়ব। তাঁরা কিভাবে নিজেদের জীবন গড়েছেন–তা পড়ে পড়ে আমিও আমার জীবনকে সে ভাবে গড়ব।

দু'টি কিতাব পড়ুন

এজন্য দুইটি কিতাব পড়ার কথা সবাইকে বলব। একটা কিতাবের নাম হল 'আপবীতি'। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর নিজের লেখা নিজের জীবনী। তালেবুল ইলম ও ওলামায়ে কেরামের জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় ও উপকারী কিতাব।

আরেকটি হল আবুল হাসান আলী নদভীর (রহ.)-এর বয়ান-সংকলন 'পাজা সুরাগে জিন্দেগী'। 'তালিবে ইলমের জীবন পথের দিশা' নামে যা বাংলায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

এ দু'টি কিতাব অবশ্যই পড়া উচিত। এগুলো ছাড়া এ বিষয়ে আরও অনেক কিতাব আছে। যেমন- তা'লীমুল মুতাআল্লিম। আরেকটি কিতাব হল 'আদাবুল মুতাআল্লিমীন'। এটি মাওলানা সিদ্দিক হাসান বান্দভী (রহ.)-এর লেখা। খুবই সুন্দর কিতাব ।

আর মাদরাসার উস্তাদগণ এগুলোর পাশাপাশি থানভী (রহ.)-এর 'আল ইলমু ওয়াল উলামা' ও মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বান্দভী রচিত 'আদাবুল মুয়াল্লিমীন' পড়বেন। একটা হল আদাবুল 'মুতাআল্লিমীন' যা ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য, আরেকটি হল 'আদাবুল মুআল্লিমীন' যা উস্তাদদের জন্য প্রযোজ্য। এ কিতাবগুলো মোতালা করবেন।

কিভাবে আদর্শ উস্তাদ হওয়া যায় সেখানে তার বিবরণ রয়েছে। এগুলো পড়লে আমরা নিজের অবস্থা বুঝতে সক্ষম হব। এগুলোতে দিকনির্দেশনা দেয়া আছে কিভাবে আমাকে অগ্রসর হতে হবে এবং ইলমী ময়দানে কিভাবে আমি সফলকাম হতে পারব।

সৎসঙ্গ গ্রহণ করবে

তালেবুল ইলমের সুহবত বা সঙ্গ ভালো হতে হবে। কেননা মানুষ সামাজিক জীব। একা একা জীবন-যাপন করতে পারে না। মানুষ যদি দু'চার দিনের জন্যও কোথাও যায় সেখানেও তার চলাফেরা একা একা হয় না, কারো না কারো সাথেই হয়। মাদরাসার তালেবুল ইলমরা মাদরাসায় যতক্ষণ অবস্থান করে ততক্ষণ তো একটি শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে। মাদরাসায়ও ভালো ছাত্রদের সাথে ওঠা-বসা করতে হবে। আর বন্ধের মধ্যে যখন বাড়িতে বা কোথাও যাবে সেখানেও উপদেশটি মনে রাখবে। আর আমরা যারা মাদরাসার ছাত্র নই তারা এ কথাটি সবসময় সবখানে মনে রাখব। উপদেশটি বড়ই চমৎকার। তুমি যেখানেই থাক না কেন, খুঁজে বের কর সেখানে ভালো মানুষটি কে? ভালো মানুষটির সন্ধান বের করে তার সঙ্গী হও।

আরবের সুবিখ্যাত কবি তারাফা বলেন–

إِذَا كُنْتَ فى قَومٍ فَصاحِبْ خِيارَهُم ... وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْدٰى فَتَرْدٰى مَعَ الرَّدٰي

عَنِ الْمَرْءِ لَاتَسْئَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ ... فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِى

যারা নিকম্মা, অসৎ চরিত্রবান তাদের সঙ্গ গ্রহণ করো না। তাহলে তুমিও তাদের মত হয়ে যাবে। তাদের মত অধঃপতনে পড়ে যাবে। বরং ভালো মানুষ খুঁজে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করবে।

সংখ্যায় কম হলেও মাদরাসার মধ্যে কিছু কিছু অসুবিধাজনক ছেলে থাকে, আমরা কেউ তাদেরকে সঙ্গী বানাব না। ওরা যখন মাদরাসায় সঙ্গী পাবে না তখন ওরা একঘরে হয়ে যাবে। তখন ওরা তালাশ করে করে ভালোদের সাহচর্যে আসার চেষ্টা করবে এবং এ উসিলায় ওরা ভালো হয়ে যাবে। ওরা ভালো হোক–এটা আমরা চাইত? চাই। এজন্য ওদের সাথে আমরা মিশব না। ওরা মিশুক ভালোদের সাথে। এতে ওরা ভালো হয়ে যাবে।

সার্টিফিকেট লাভের নেশায় পড়বে না

ইলম সতীন দেখতে পারে না। অর্থাৎ অন্য কাজ পছন্দ করে না। অন্য কাজ ইলমের সতীন। যে তালেবুল ইলম ইলমের সাথে অন্য কাজ করে সে ইলম পায় না। আমরা তো ইলম শিখব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। এজন্য এক নম্বরের বিষয় হল কোনো দিনও আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দেয়ার চিন্তা মাথায় আনব না। যদি আনি তাহলে বড় ধরনের ভুল করব।

আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? একটা সার্টিফিকেট পেলাম এই তো! অসংখ্য মানুষ আই.এ, বি.এ এবং এম.এ পাস করে বসে আছে, চাকরি পাচ্ছে না। আর তোমরা আলিয়ায় পরীক্ষা দিলেই চাকরি পেয়ে যাবে? চাকরির জন্যই কি মাদরাসায় আসা? এ ইলম দিয়ে দুনিয়া হাসিল করতে চাও?

یوسف جیسا عزیز کوکس چیز کے بدلے میں تم بیچ رہے ہو

ইউসুফের মত অমূল্য বস্তুটি কিসের বদলে বিক্রি করতে চাও!

তালেবুল ইলমগণ আল্লাহর হাতে লাগানো চারাগাছ

আল্লাহপাক আমাদেরকে মাদরাসায় এনেছেন ইলম দেওয়ার জন্য। মাদরাসার তালেবুল ইলমগণ হল আল্লাহপাকের হাতে লাগানো চারাগাছ। এটা হাদীসের শব্দ। হাদীসে এসেছে–

لَايَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِى هٰذَا الدِّيْنِ غَرَسًا يَسْتَعْمِلُهُ فِى طَاعَتِه

আল্লাহপাক দীনের জন্য কিছু চারাগাছ লাগান। কেন? এরা বড় হবে এবং এগুলোকে আল্লাহপাক তাঁর পছন্দ মত কাজে ব্যবহার করবেন।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, এ চারাগাছ হল মাদরাসার ছাত্ররা। এরা আল্লাহপাকের কুদরতী হাতের লাগানো চারাগাছ।

হে তালেবুল ইলম ভাই! চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তোমাকে কী বানাতে চান আর তুমি কী হতে চাচ্ছ। তুমি আলিয়া মাদরাসার দিকে নজর দিয়ে বসে আছ। আল্লাহ তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন আর তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছো। এটা কেমন কথা। **لاحول ولاقوة الا بالله** এ ভ্রান্তি ও ভুল যেন কোন দিন মাথায় ভর না করে।

খাবারের শেকায়েত করবে না

আরেকট কথা। এ মাদরাসার চেয়ে অমুক মাদরাসার খানা ভালো–এই রোগে যেন না পায়। আমাদের ছাত্র যমানায় তো ফরিদাবাদ মাদরাসায় খুব অভাব অনটন ছিল। শুধু ফরিদাবাদ নয় তখন বাংলাদেশের সব মাদরাসার অবস্থাই এমন কষ্টের ছিল। এর কারণ হল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের হাতে টাকা-পয়সা ছিল না। ধীরে ধীরে মুসলমানদের হাতে টাকা-পয়সা হয়েছে তো দান-খয়রাত করা শুরু করেছেন। এখন আর কোনো মাদরাসার অবস্থা খারাপ নেই। তো

বলছিলাম, আমাদের ছাত্র যমানায় মাদরাসার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। দুই বেলা ভাতের সাথে ডাল দেয়া হত। আমাদের ক্লাসে খুব মেধাবী এক ছাত্র ছিলেন। অন্য মাদরাসা থেকে এসে ভর্তি হয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষায় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন। কিছু দিন পড়া-লেখা করার পর হঠাৎ চলে গেলেন। পরবর্তীতে দেখা হলে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেলেন? আরেকটা মাদরাসার নাম বলেছেন। সে মাদরাসার নাম আমি বলব না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন গেলেন? বললেন, সেখানে দুপুর বেলা ডালের সাথে ভাজি দেয়া হয়। এজন্য সে মাদরাসায় গিয়েছি। তার চেয়ে অনেক কম মেধার ছাত্র–যারা শুধু ডাল দেয়ার কারণে অন্য মাদরাসায় চলে যায়নি তারা সবাই–এখন অনেক উজালা, অনেক আলোকিত। এদের সবার যিন্দেগী খুব সুন্দর। আর যে ছাত্র ভালো খানার জন্য এখান থেকে ওখানে গিয়েছে সে এখন কোনো রকম টুকটাক ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন যাপন করে। আবার জেনারেল লাইনে গিয়ে আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দিয়েছে। ফলাফল কী হয়েছে তা তো শুনলেনই। এমন একটি নয়। ডজন ডজনে উদাহরণ রয়েছে।

এজন্য বলি, এগুলো দেখার বিষয় নয়। আমাদেরকে আল্লাহপাক অনেক উঁচু কাজের জন্য নির্বাচিত করে সে কাজের উপযুক্ত বানানোর জন্য মাদরাসায় এনে বসিয়েছেন। আমাদের উচিত এর কদর ও মূল্যায়ণ করা। নিজের কদর নিজেকেই করতে হবে। কী হবে এখানে পড়ে, চল আলিয়াতে পরীক্ষা দেই, এখানে ডাল খেয়ে কী হবে, সেখানে গোশত খাওয়ায়, চল সেখানে যাই–এমন চিন্তা যেন মাথায় না আসে। এগুলো যেন মনের ভিতর কোনো সময় না আসে। আমি ইলম শিখতে এসেছি। এটাই আমার মাকসাদ।

কোনো সংগঠনে ভর্তি হবে না

আরেকটা কথা বলি। ইকবাল মরহুম খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন–

ہو صداقت کیلئے جس دل میں مرنے کی تڑپ
پہلے اپنی پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے

আমাদের মাদরাসার ছেলেদেরকে অনেক সময় অনেক সংগঠনওয়ালারা এসে পুশিং মারে। হায় হায়! এই হয়ে গেল ওই হয়ে

হয়ে গেল! রিকসাওয়ালাদের একটা সংগঠন আছে। মেথরদেরও সংগঠন আছে। আমাদেরও সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। এমন পুশিং দিয়ে বিভিন্ন সংগঠনে ভর্তি করতে চায়। হাদীসের বরাত দিয়ে বলে নবীজি বলেছেন, যাদের কোনো আমীর নেই তারা জাহান্নামে যাবে। সুতরাং সংগঠন করতে হবে। আরও কত কি লেকচার দেয়! তাদেরকে বলবেন, এসব হাদীস আমাদের উস্তাদগণ আমাদেরকে পড়ান। আল্লাহ আমাদেরকে আলেম বানাচ্ছেন বিচ্ছিন্নতা দূর করে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আর তোমরা সংগঠন করে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চাও। ছাত্র যমানায় সংগঠন মাদরাসা ছাত্রদের জন্য زهر قاتل বিষের মত। ছাত্রদের জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই।

আমরা সবাই এক সংগঠনের সদস্য

আমরা সবাই এক সংগঠনের সদস্য। সেটি কোন সংগঠন? তার প্রধান কে?

سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا
اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا

আমরা সবই এক সংগঠনের সদস্য। আমাদের সংগঠনের মুরব্বীর নাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই সংগঠনের কর্মসূচী হল সুন্নতের ইত্তেবা। আমরা এ সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। এ ছাড়া যত সংগঠন রয়েছে এগুলো সংগঠিত হওয়া নয়; বরং বিচ্ছিন্ন হওয়া। যারা সংগঠনের দাওয়াত নিয়ে আসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়েছেন কি না। জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে নেতা সাহেব ফজর পড়েছেন সূর্য ওঠার পর।

সুতরাং ছাত্র যামনায় কোনো সংগঠন নেই। আমরা সবাই এক সংগঠনের সদস্য। আমাদের এ কাফেলার প্রধান হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কর্মসূচী ইত্তেবায়ে সুন্নাত।

সাথে আরেকটা পরিচয় যোগ করি। আমাদের আরেকটা সংগঠন আছে। আমরা সবাই সে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন সংগঠনের প্রয়োজন নেই। সে সংগঠনের নাম হল দেওবন্দী। দেওবন্দী সংগঠন। আমরা সবাই দেওবন্দিয়তের উপর আছি। এটাই আমাদের কর্মসূচী। ছাত্র যামানায় কোনো সংগঠনের নাম নিব না। এতে ভিতরে এনতেশার সৃষ্টি

হবে। পড়া-লেখার মনোযোগ ছুটে যাবে। অনেক রকম সমস্যা সৃষ্টি হবে। ইলম থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন এবং আলোচিত কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করুন। আমীন! *

* ২২/০২/১৩ইং নারায়ণগঞ্জ আমলাপাড়া মাদরাসায় ইসলাহী মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান

ইলম অনুযায়ী আমল : গুরুত্ব ও মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .[52]

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন; শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ, দিল-দেমাগ ভালো

৫৩. সূরা মুজাদালাহ : ১১

রেখেছেন; আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হল দীন; এ দীনের নিসবতে এবং এ দীনের মহব্বতে দীনের কথা বলা এবং শোনার জন্য একত্রে বসার তৌফিক দান করেছেন। এটাও তাঁর অনেক বড় দয়া।

মুমিন ও আলেম উভয়ের মর্যাদা উঁচু করার ঘোষণা

কুরআনে কারীম থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .[53]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার আর ইলমদার উভয় শ্রেণীর মর্যাদা বুলন্দ করেন।

প্রকৃত ইলম কোনটি

আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমল ছাড়া ইলম আল্লাহপাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যে ইলম আমলের প্রতি **مُلجِی** বা বাধ্যকারী হয় না, সেটা ইলমই নয়। কেউ ইলম শিখেছে কিন্তু আমল করে না, তাহলে এটা ইলম হিসেবে গণ্য নয়। যে ইলম ইলেমওয়ালাকে আমলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় বা আমলের দিকে টেনে আনে ঐ ইলমই গ্রহণযোগ্য, অনথ্যায় গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা আবু ইসহাক শাতবী (রহ.) **الموافقات** নামক কিতাবে লিখেছেন, কুরআন ও হাদীসে ঐ ইলমের ফযীলত এসেছে যেই ইলম ইলমওয়ালাকে আমলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। কেউ ইলম শিখেছে কিন্তু আমলের তৌফিক হয় না, তার ঐ ইলম ইলমই না। এ প্রসঙ্গে তিনি অনেক দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। কুরআন-হাদীস ও যুক্তির আলোকে প্রমাণ করেছেন, যে ইলমের উপর আমল হয়েছে সেটাই ইলম। আর আমল ছাড়া শুধু পড়ার নাম ইলম নয়।

মনে করুন, কেউ ইলম শিখেছে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কিন্তু সে দাড়ি রাখে না। তার এ শেখাটা ইলম বলে বিবেচিত হবে না। আল্লামা শাতবী (রহ.) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এটা ইলমই নয়। যে নিজে দাড়ি রেখেছে তার জানাটা ইলম বলে গণ্য হবে। যে ইলম তাকে দাড়ি

৫৪. প্রাগুক্ত

রাখতে বাধ্য করেছে সেটাকে ইলম বলা যাবে। অন্যথায় ইলম বলা যাবে না।

এজন্য এটাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহপাক ইলমওয়ালাদের দরজা বুলন্দ করেন; কিন্তু কিসের কারণে বুলন্দ করেন? কিসের শর্তে? আমলের শর্তে। আল্লাহপাক ইলম অনুযায়ী আমলকারী আলেমের মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

ঈমানদারের মর্যাদা

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.[54]

ঈমানদারের মর্যাদা আল্লাহপাক বুলন্দ করেন। একজন আদনা ঈমানদার, যার পরে আর কম হতে পারে না এরকম কম ঈমানদারেরও অনেক দাম। একজন বেঈমানের চেয়ে তার অনেক দাম। ঐ সামান্যতম ঈমানটুকুর দাম সেদিন বুঝে আসবে যেদিন জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে আর আল্লাহপাক বিভিন্নজনের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মানুষদেরকে মুক্তি দিতে থাকবেন।

নবীদের সুপারিশে অনেকে মুক্তি পাবে। ওলীদের সুপারিশে অনেকে মুক্তি পাবে। মা-বাবার সুপারিশে মুক্তি পাবে। হাফেযে কুরআনের সুপারিশে মুক্তি পাবে। হাজীদের সুপারিশে, আলেমদের সুপারিশে, ফেরেশতাদের সুপারিশে অনেকে নাজাত পেয়ে যাবে। সবার সুপারিশের পরও অনেকে জাহান্নামে থেকে যাবে। নবীদের জানা মতে কোনো ঈমানদার এখন জাহান্নামে নেই, ফেরেশতাদের জানা মতে কোনো ঈমানদার এখন জাহান্নামে নেই। জানা থাকলে তারা সুপারিশ করে বের করে আনতেন। কারও জানা মতে আর কোনো ঈমানদার জাহান্নামে নেই। এজন্য সুপারিশ বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ সময় আল্লাহপাক বলবেন, সকলে সুপারিশ করল, নবী ও ফেরেশতারা সুপারিশ করল, সুপারিশ করার আর কেউ বাকি থাকল না। শুধু আমি আরহামুর রাহিমীন বাকি রয়ে গেলাম। এটা বলে দুই হাতের (কুদরতী) আঁজলা দিয়ে অনেককে বের করে আনবেন।

---

৫৫. প্রাগুক্ত

যারা আল্লাহর কুদরতী হাতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে তারা কারা? এরা কি বেঈমান? না, এরা সবাই ঈমানদার। তবে তাদের ঈমানের পজিশন ও অবস্থা এত খারাপ যে, নবী ওলী আলেম-উলামা ফেরেশতা কেউই তাদের ঈমানের খবর জানে না। শুধু আল্লাহপাক জানেন যে, তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে। আল্লাহপাক এ বিন্দু পরিমাণ ঈমানও নষ্ট হতে দিবেন না। চির দিনের জন্য তাকে জাহান্নাম থেকে তুলে এনে দশ দুনিয়ার সমান জান্নাত দিয়ে দিবেন। এদের নাম হবে عُتَقَاءُ الرَّحْمٰن রহমানের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্ত। জাহান্নাম থেকে যখন তাদেরকে বের করে আনা হবে তখন তারা একদম কয়লার মত থাকবে। এ ঝলসানো দেহটাকে নাহরুল হায়াত বা সঞ্জীবনী নদীতে ঢেলে গোসল দিয়ে দিবেন। ফলে তরতাজা হয়ে যাবে। এবার চিন্তা করুন, সামান্য ঈমানদারও কেমন দামি!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একবার খানায়ে কাবা তওয়াফ করার সময় কাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে খানায়ে কাবা! আমি জানি তুমি আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তোমার অনেক মর্যাদা। তোমার প্রতি মানুষের অনেক আসক্তি ও অনুরাগ রয়েছে। মানুষ তোমার চার পাশে তওয়াফ করে। পাগলের বেশ ধরে সেলাইহীন কাপড় পরে তোমার কাছে আসে। সুগন্ধি ব্যবহার করে না। মাথায় টুপি পরে না। তোমার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে আর চোখের পানি ঝরায়। নিঃসন্দেহে তোমার অনেক মর্যাদা । হে কাবা! তুমি এটাও মনে রেখো, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, একজন ঈমানদারের মর্যাদা আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও বেশি।

আল্লাহু আকবার! একজন ঈমানদারের চেহারা আল্লাহপাক কত দামি বানিয়েছেন।

কাবা শরীফের অপূর্ব সম্মান

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) কালো জুতা পায়ে দিতেন না। এটা কি কোনো গুনাহের কাজ? না। কালো জুতা পায়ে দেয়া সুন্নত কিংবা মুস্তাহাবেরও খেলাফ নয়। এতে কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু তিনি

পরতেন না। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতেনও না। কেউ কালো জুতা হাদিয়া দিলে রেখে দিতেন বা অন্য কাউকে দিয়ে দিতেন। তিনি নিজে পরতেন না। তিনি যে কালো জুতা পরেন না–বিষয়টি অনেকে বুঝতে পেরেছেন। অনেকে মনে করতে পারেন তাঁর কাছে ভালো লাগে না তাই পরেন না। কেউ জিজ্ঞেস করার সাহস করেন না। মুরব্বীরা যখন জিজ্ঞেস করেন তখন ঠিকই বলতে হয়। বড়রা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তুমি কালো জুতা পরিধান কর না কেন? এখন তো না বলে পারেন না। তিনি বললেন, কালো জুতা পায়ে দেয়ার সময় আল্লাহপাকের ঘরের কথা মনে পড়ে যায়। কাবা'র গিলাফটা কালো আর আমার জুতাটাও কালো–এটা মনে পড়লে কেমন যেন দিলে বিরাট ধাক্কা লাগে।

কেবল আল্লাহর বান্দী বিবেচনায় স্ত্রীকে ক্ষমা

এক লোক তার স্ত্রীর কারণে অনেক বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। স্ত্রী হয়তবা কোনো সম্পদ নষ্ট করে ফেলেছে কিংবা তার কোনো অসতর্কতার কারণে গহনাগাটি বা অন্য কোনো সম্পদ চুরি হয়ে গেছে। মোটকথা, ক্ষতিটা এমন যা কোনোভাবে সহ্য করার মত নয়। ঐ লোক সবর করেছেন। বিবিকে গালিগালাজ কিংবা মারধর কিছুই করেননি। তালাকও দেননি। মাফ করে দিয়েছেন এ বলে যে, এতো আল্লাহর বান্দী। স্ত্রী হিসেবে ক্ষমা করেননি। ক্ষমা করেছেন আল্লাহর বান্দী হিসেবে। এজন্য ক্ষমা করেছেন যে, তাকে আল্লাহপাক বানিয়েছেন।

এ লোক মারা যাওয়ার পর এক বুযুর্গ তার কবরের পাশে মোরাকাবা করে জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেন ক্ষমা পেল? জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে এজন্য ক্ষমা করে দিয়েছিলাম যে, এ তো আল্লাহর বান্দী। তো আল্লাহপাকও আমাকে বললেন, যদি আমার বান্দী হওয়ার কারণে আমার এক বান্দীকে তুমি ক্ষমা করে দিতে পারো আমি কি তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি না। এটাকেই বলে নিসবত বা সম্বন্ধ।

দোস্ত! চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহপাক আমাদের ঈমানকে খানায়ে কাবার চেয়েও দামি বানিয়েছেন।

সবার জন্য ইলম

দ্বিতীয় আরেকটি বস্তুর নিসবতে (সংশ্লিষ্টতায়) আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সেটা হল ইলম। ইলমের দ্বারা আল্লাহ আমাদের মর্যাদা উঁচু করেন। ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে সবার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শেখার অনুমতি নেই। যেমন হিন্দু ধর্ম। তাদের মধ্যে কাজের ভাগ আছে। একেকজনের দায়িত্ব ভাগ করা আছে। ওদের মধ্যে যারা ধর্মীয় গুরু হবে তাদেরকে ব্রাহ্মন বলা হয়। ব্রাহ্মনরাই কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় পণ্ডিত হবে, অন্যরা পারবে না। কিন্তু আল্লাহপাকের মনোনীত দীন ইসলামে সবার জন্য ইলম শেখার রাস্তা খোলা। যে কোনো ব্যক্তির জন্য রাস্তা খোলা এবং ফযীলতও সবার জন্য।

আপনারা এ কথা শুনে খুব আশ্চর্য বোধ করবেন যে, ইসলামের ইতিহাসে যারা বড় বড় জাস্টিজ হয়েছেন তাদের অনেকে ক্রীতদাস ছিলেন।

আগের যুগে তো মানুষ বেচাকেনা হত। ইসলামের আগমনের পর এ প্রথা ক্রমান্বয়ে উঠে যায়। ইসলাম নানা কাফফারাস্বরূপ গোলামদের আজাদ করার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলাম আজাদ করার বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এভাবে একদিন পৃথিবী গোলাম মুক্ত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন আমাদের ঘরে বা বাসাবাড়িতে যেসব গৃহ-পরিচারিকা রয়েছে তারা বুঝি সে শ্রেণিভুক্ত। এটা ভুল চিন্তা।

অনেক গোলামকে তার মালিক পড়া-লেখা শিখিয়ে আজাদ করে দিয়েছেন তো এক সময় তারা রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আসীন হয়েছেন। বিচারক হয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের মাঝেও অনেকে ক্রীতদাস ছিলেন। মালিক তাকে গোলাম অবস্থায় ইলম শিখিয়েছেন। পরবর্তীতে আজাদ করে দিয়েছেন কিংবা আজাদ হওয়ার পর তিনি ইলম শিখে বড় মুহাদ্দিস হয়েছেন। এমন অনেকের ঘটনা পাওয়া যায়। অনেক আজাদকৃত গোলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীও হয়েছেন।

আমার বলার উদ্দেশ্য হল, ইলম সকলের জন্য ফরজ। আমরা অনেকে শিখি, অনেকে শিখি না। হ্যাঁ, এক পর্যায়ের ইলম তো সবাইকে শিখতে হয়। যেমন কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত সবাইকে শিখতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনের মাসআলা জানা ফরজ। দৈনন্দিন জীবন যাপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের তরীকা জানা তো সকলের জন্য ফরযে আইন। কিছু না কিছু ইলম না থাকলে তো বান্দা মুমিনই হতে পারে না। কমপক্ষে আল্লাহ একজন, তাঁকে আমার মেনে চলতে হবে- এ ইলমটা তো অবশ্যই লাগবে। এটা জানা না থাকলে সে ঈমান আনলো কিভাবে? এটাও তো ইলম।

তো এ উম্মতের মধ্যে ইলম অর্জনের জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষত্ব নেই। ইলম শেখার অধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত। যে যত বেশি ইলম শিখল তার মর্যাদা আল্লাহপাক তত বেশি উঁচু করবেন।

আগেই বলা হয়েছে, ইলম সে জিনিসের নাম যেটা مُلْجِى الى العمل তথা আমলের প্রতি বাধ্য করে।

আলেমের মর্যাদা

এবার শুনুন, আহলে ইলমকে আল্লাহপাক কত উঁচু মর্যাদা দান করেন। ছোট একটা ঘটনা মনে পড়েছে। বড় সুন্দর ঘটনা। রবীয়াতুর রায় নামে একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর উস্তাদ। তাঁর বাবা বনু উমাইয়াদের আমলে সিপাহী ছিলেন। কোনো এক দেশে রাষ্ট্রীয় কাজে তাকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানেই দীর্ঘ দিন অবস্থান করেছেন। তার বিবি গর্ভবতী ছিল। তিনি বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিবির কাছে রেখে গেছেন। দীর্ঘ ২৭ বছর পর বাড়ী এসেছেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দরজায় জোরে করাঘাত করলেন। একজন যুবক এসে দরজা খুলে দিল। যুবক জিজ্ঞেস করল আপনি কে? আমাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন কেন? তিনিও উল্টো বলছেন, তুমি কে? তুমি আমার ঘরে কেন প্রবেশ করেছ? উভয়ে উভয়কে ধমকাচ্ছে। অনেকক্ষণ যাবত এ বাকবিতণ্ডা চলছে। উভয়ে উভয়কে বেগানা পুরুষ মনে করে শাসাচ্ছে। কথার আওয়াজ যখন উঁচু হল তখন মহল্লার লোকজন জড়ো হয়ে গেল। সবাই যুবক রবীয়ার পক্ষ নিল। কারণ তাকে সবাই চিনে, আগন্তুক লোকটিকে কেউ চিনে না। তাই রবীয়ার পক্ষ নিয়ে তারাও বলছে আপনি কে? ওদের বাড়ীতে আপনি কেন প্রবেশ করতে চান? দরজার সামনে এত হৈচৈ শুনে

রবীয়ার মা এগিয়ে এলেন। রবীয়া তার মাকে আসতে দেখে দরজা বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়াল। রবীয়ার মা ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? রবীয়া বিষয়টি জানালে মা বললেন, দরজাটি খোলো দেখি! দরজা খোলার পর রবীয়ার মা বললেন, ইনি তোমার বাবা। ওই দিকে স্বামীকেও বললেন, এ যুবক আপনার ছেলে। পিতা-পুত্রের পরিচয় পাওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে ঝগড়া শেষ হয়ে গেছে।

রাত গেল, দিন গেল। রবীয়ার বাবার নাম ছিল ফররুখ। তিনি বিবিকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে ত্রিশ হাজার আশরাফী রেখে গিয়েছিলাম তার হিসাব দাও। বিবি বললেন, হিসাব পরে দিব। ফজরের সময় হয়েছে। মসজিদে নববীতে আযান হয়েছে। ফররুখ নামায পড়তে গেল। নামাযের পর দেখল লোকজন মসজিদে নববীর এক কিনারে জড়ো হয়েছে আর একজন যুবক সবাইকে হাদীস শোনাচ্ছে। ফররুখও বসল। মুগ্ধ মনে হাদীস শুনল। তার মনে সন্দেহ হয়েছে এ কোনো সেই ছেলেটি কিনা। বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে বলে আমার ছেলে তো অনেক বড় আলেম হয়েছে। স্ত্রী বলেন, এবার বলুন তো ত্রিশ হাজার আশরাফী দামি, না এমন একজন সন্তান। তুমি ত্রিশ হাজার আশরাফী চাও, না এমন একজন সন্তান চাও। বলল, আমি এমন সন্তানই চাই। স্ত্রী বললেন, তোমার ত্রিশ হাজার আশরাফী এ সন্তানের পিছনে খরচ হয়েছে।

বাস্তবেই ইলম এমন মর্যাদা বয়ে আনে।

দোস্ত! আমরা যে যতটুকু আমল করি ততটুকুর ইলম কিন্তু আমাদের আছে। কমবেশি ইলম প্রত্যেক ঈমানদারেরই আছে। কারণ ইলম হলো ওটা যেটা তাকে আমলে বাধ্য করে। সে হিসেবে আমরা যে যদ্দুর আমল করি আর আমলটা যদি সঠিক হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে, এতটুকুর ইলম আল্লাহ তাকে দান করেছেন।

ইলম অনুযায়ী আমল করার সুফল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مالَمْ يَعْلَمْ

যে যতটুকু জানে ততটুকুর উপর যদি আমল করে তাহলে সে যেটা জানে না ওটার ইলম আল্লাহপাক কুদরতীভাবে তাকে দিয়ে দেন। এটাকে ইলমে লাদুন্নী বলে। এটা অনেক মূল্যবান জিনিস, বহু দামি সম্পদ।

হযরত নানুতবী (রহ.)-এর ঘটনা

একবার হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, হযরত! সমাজে আলেম তো অনেক আছে। কিন্তু আপনার অবস্থা এত ভিন্ন কেন? বস্তুত হযরত নানুতবী (রহ.) ছিলেন খুবই বড় মানুষ। অথচ নিজেকে খুব গোপন রাখতেন। লেবাস-পোশাকও খুব মামুলি পরতেন। লেবাস-পোশাক দেখে কেউ তাকে আলেম মনে করত না। খুব গোপন থাকতেন। এক বৃদ্ধ লোক গেন্ডারীর আঁটি নিয়ে দেওবন্দ মাদরাসায় আসছেন। কাসেম নানুতবী (রহ.)ও সেখান দিয়ে আসছেন। সাদাসিধা মানুষ। বৃদ্ধ লোকটি গেন্ডারীর আঁটি মাথায় নিয়ে যাচ্ছেন দেখে কাসেম নানুতবী বললেন, আঁটিটা আমার কাছে দিন। আপনার কষ্ট হচ্ছে। লোকটি বললেন, হ্যাঁ, নিলে ভালোই হয়। মৌলভী কাসেম গেন্ডারীর রস খুব পছন্দ করেন তাই তার জন্য এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে তুমি একটু নিয়ে দাও। মাওলানা কাসেম নানুতবী আঁটিটি মাথায় নিয়ে বুড়োর সাথে সাথে হেঁটে চলেছেন। চলতে চলতে মাদরাসার কাছে পৌঁছে গেছেন। গেটের কিছু আগেই বুড়ো মিয়াকে বললেন, আপনি যার কাছে এগুলো নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ওই তো তার কামরা দেখা যাচ্ছে। তাই এবার আঁটিটি আপনি নিন। তিনি গেন্ডারীর আঁটিটাকে একটু আগেই দিয়ে দিলেন, যাতে লোকটি বুঝতে না পারে যে, তিনিই কাসেম নানুতবী। তিনি আঁটি বুঝিয়ে দিয়ে অন্য দিক থেকে কামরায় চলে যান এবং কাপড় বদল করে আপন জায়গায় আসীন হন। লোকটি জানলে কষ্ট পাবেন চিন্তা করে তাকে বিষয়টি বুঝতে দিলেন না।

এই কাসেম নানুতবীকে জিজ্ঞেস করা হল, ইলমওয়ালা তো কতই আছে আপনার মর্যাদা এমন কেন? জবাবে তিনি একটি বড় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। পড়া-

লেখা করেছি সাধারণ হিসেবে। অনেকের ব্রেইন ভালো ছিল। তারা ইলমের রুমুজ-গুমুজ, দর্শন ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝার জন্য অনেক কিছু নিয়ে পড়া-লেখা করেছে। আমি তো শুধু পড়া-লেখা করেছি এজন্য যে, কুরআন-হাদীস থেকে আল্লাহপাকের হুকুম-আহকাম জেনে তার উপর কোনো রকম আমল করতে পারি। আর আমি যখন ইলমে দীন তথা কুরআন ও হাদীস পড়তাম তখন আমি আল্লাহর কাছে বলতাম, হে আল্লাহ! আমি তো জাহেল মানুষ, কিছু জানি না। আপনি আমাকে যদি ইলম দান করেন তাহলে আমি সে মোতাবেক আমল করতাম। কোন কাজে আপনি রাজি আর কোন কাজে আপনি রাজি নন তা বুঝে চলতাম। হে আল্লাহ! আমাকে 'ইলমে নাফে' উপকারী ইলম দান করুন। এভাবে আমি পড়া-লেখা করেছি। আমি গভীর কিছু বোঝার জন্য পড়া-লেখা করিনি। আমলের জন্য করেছি।

দোস্ত! এটাই হল ইলমের হাকীকত। উনি আমলের জন্য ইলম হাসিল করেছেন। ফলে যারা ইলমের হাকীকত রুমুজ-গুমুজ তথা ভিতরে কী আছে তা জানার জন্য পড়া-লেখা করেছেন তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তারা পড়া-লেখা করে যত রুমুজ-গুমুজ শিখেছেন আল্লাহপাক তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশি রুমুজ-গুমুজ কলবের ভিতর ঢেলে দিয়েছেন। তাই তো তার কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে মাথা ঘুরে যায়। এবার অনুমান করুন তিনি দীনের হাকায়েক কী পরিমাণ বুঝেছেন।

তো দোস্ত! ইলমের দরজাও খোলা, আমলের দরজাও খোলা। সবার জন্য খোলা। এতে কারো বিশেষত্ব নেই। অনেকে ইলম শিখেছে; কিন্তু তার মাঝে আমল নেই। সে মূলত শব্দের অর্থ শিখেছে, ইলম শিখেনি।

আরেকটি ঘটনা

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-কে আমরা অনেকেই চিনি। তিনি ছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহ.)-এর উস্তাদ। মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহ.) কত উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন তাও আমরা অনেকে জানি। তিনি মারা গেছেন আজ

অনেক বছর হয়েছে। বর্তমানে যারা আছেন তারা তাঁর তিন চার সিঁড়ি নীচের। ঐ বংশের কাউকে দেখলে মানুষ পীর সাহেবের মত মনে করে। আর ঠিকই ঐ বংশের সবাই পীর হয়ে যায়। একজন একেক এলাকায় যায় আর মানুষ বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা অনেক কিছু এনে তাকে দেয়। এগুলো কি তাদের নিজস্ব ইলম-আমলের ফযীলত? কিছুতেই নয়। ঐ যে তাদের একজন মুরব্বী ছিলেন তাঁর বংশের হওয়ার কারণে মানুষ তাদের মহব্বত করেন।

মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহ.)-এর পীর ছিলেন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ (রহ)। তিনি দিল্লিতে লেখা-পড়া করতেন। একদিন বাসা থেকে মাদরাসায় যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় লক্ষ করলেন রাস্তার পাশে একটি ছোট মসজিদ। মনে হচ্ছে এ মসজিদের মধ্যে মানুষ এখন আর নামায পড়ে না। হয়ত এ মহল্লায় এখন মুসলমান নেই। আশে পাশে হিন্দুরা বসবাস করে। তাদের তো আর মসজিদের প্রয়োজন নেই। নানা আবর্জনা পড়ে সেটি ময়লা হয়েছিল। মসজিদটির এ বেহাল অবস্থা দেখে তাঁর মনে খুব কষ্ট লাগল। তাই তিনি মসজিদটি ঝাড়ু দিয়ে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করলেন। এতে তার ক্লাসে যেতে দেরী হয়ে গেল। ক্লাসে গিয়ে আস্তে করে পিছনের সারিতে বসে গেলেন। কিতাব খুললেন। কিন্তু কিতাবে কোনো লেখা দেখলেন না। খালি কাগজ দেখতে পান। তিনি তো ভয় পেয়ে গেছেন যে, দেরীতে পৌঁছার কারণে হুজুরের বদ দোয়া লাগল কিনা। যার কারণে আমার কিতাবের লেখা উঠে গেল। সবকের পর হুজুরের কাছে গিয়ে বলেন, আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়ে গেছে। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? তখন তিনি আসল ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে হুজুর বললেন, তুমি আসলে ব্যাপারটা বুঝনি। তোমার ঐ মসজিদ পরিষ্কারের কাজটি আল্লাহপাকের খুব পছন্দ হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি এত রাজি হয়ে গেছেন যে, এখন আর তোমার এত মেহনত করে ইলম শিখতে হবে না। তোমাকে আল্লাহপাক অজানা ইলম সরাসরি দান করবেন।

এজন্য দোস্ত! বেশি বেশি আমল করি। জানা কারো কম নয়। যারা পর্দা-পুশিদা করে না তারাও জানে পর্দা করা ফরয। কিন্তু পর্দা করে না।

যারা দাড়ি রাখে না তারাও জানে দাড়ি রাখা ওয়াজিব, মুণ্ডানো গুনাহ। তারপরও রাখে না। অনেকে আবার এক মুষ্ঠির কম রাখে। ছোট করে রাখে। এটা ঠিক নয়।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব

অনেকে দাড়ি রাখার মাসআলাটা ভুল জানে এবং ভুল জানার কারণে বলে, দাড়ি রাখা সুন্নত। আসলে দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্ঠি পর্যন্ত রাখা ওয়াজিব। যারা এই মাসআলাটা ভুল জানে হক্কানী আলেম-উলামাদের সাথে তাদের সম্পর্ক কম। নিজে নিজে হাদীস পড়েছেন বিধায় ভুল জেনেছেন।

সুন্নতের অর্থ

সুন্নতের ব্যবহারিক বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা। হাদীসের পরিভাষায় ফরযও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকায় কি ফরয নামায নেই? আছে। বরং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত সব মিলিয়েই নবীর তরীকা। এখানে সুন্নত ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে সুন্নত বলে হালকা দৃষ্টিতে দেখে। যে সুন্নত ওয়াজিবের নিচে এবং মুস্তাহাবের ওপরে সেটা তো ফেকাহর পরিভাষায়। এটা হাদীসের পরিভাষায় নয়। যারা এসব মাসআলা বলে তারা উলামাদের কাছে যায় না। নিজে নিজে মহা পন্ডিত। হাদীসের বাংলা কিতাব পড়া নিষেধ নেই। তবে আলেমদের থেকে বুঝে বুঝে পড়বেন এবং কোন বইটা পড়লে ভালো হবে তাও তাদের থেকে জেনে নিবেন। বই তো একেকজন একেক রকমের লিখেছে। বুখারী শরীফ একেকজনেরটা পড়লে একেক রকমের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবে। কুরআন শরীফের এক আয়াতের তাফসীর একেকজনেরটা পড়লে একেক রকমের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবে। এজন্য উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে বুঝতে হবে। কুরআনে কারীমের তরজমা তো হিন্দুও করেছে। আপনারা কি মনে করেন খুব বিশুদ্ধ তরজমা করেছে? একেবারে অশুদ্ধ করেছে।

অনেকের ভাবসাব তো এই যে- হিন্দু বেচারা কুরআনের যে অনুবাদটা করেছে সেটা পড়ব, অন্যটা পড়ি আর না পড়ি।

তাফসীর অধ্যয়নে সতর্কতা জরুরী

একজন বড় ডাক্তার। লিবিয়াতে অনেক দিন ডাক্তারী করেছেন। এখন বাংলাদেশ থাকেন। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন না। নামায পড়েন কিন্তু একা একা পড়েন। জামাতের সাথে পড়েন না। কিভাবে যেন আমাকে ভালো জানতেন। চিকিৎসার জন্য গেলে ভিজিটের পয়সা রাখতেন না।

ডাক্তার সাহেব একদিন আমাকে বললেন, হুজুর! আমি প্রচুর অধ্যয়ন করি। আমি কুরআনের তাফসীর অনেক পড়েছি। আমার কাছে কোনোটা ভালো লাগে না। তবে আমি একটি ইংরেজী তাফসীর পেয়েছি। সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। সেটা পড়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি। এটা খুব ভালো তাফসীর। আমি বললাম, আপনি অন্য তাফসীরে তৃপ্তি পেলেন না বরং এতে তৃপ্তি পেলেন। তাতে এমন কী পেলেন? একটি উদাহরণ দেখান তো। তিনি আমাকে 'সূরা আলাম নাশরাহ' এর তাফসীর শোনালেন। বিশুদ্ধ তাফসীর মতে الم نشرح لك صدرك-এর তরজমা হল, আমি কি আপনার জন্য আপনার সিনাটাকে খুলে দেইনি? কিন্তু ডাক্তার সাহেব বললেন, এখানে লেখা আছে– আমি কি আপনার ব্রেইনকে খুলে দেইনি?

ইংরেজী তাফসীরটিতে صدر বা সিনার তরজমা করা হয়েছে ব্রেইন। আমরা তো صدر বা সিনা বলি এটাকে (ইশারা করে) যেখানে কলব থাকে। আর ঐ ইংরেজী তাফসীরের মধ্যে সিনার তাফসীর করেছে ব্রেইন দিয়ে। অথচ ব্রেইন আর কলব ভিন্ন দুটি জিনিস।

তিনি আরও বলেন, আমি একজন ডাক্তার হিসেবে বলি, আসলেই এখানে (কলবে) কিছু নেই। ব্রেইনই সব কিছু। এজন্য এই তাফসীরটা আমার মনঃপূত ও বিশুদ্ধ মনে হয়েছে।

আফসোস! মানুষ আজ বিষকে ঔষধ মনে করছে। صدر বা সিনার তরজমা ব্রেইন দিয়ে করা সরাসরি কুরআনের তাহরীফ, বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা। তবে صدر অর্থ সিনা। বক্ষ বলা হয়। ব্রেইন বললে ভুল হবে। ব্রেইনের কথা অন্য জায়গায় আছে। এখানে ব্রেইনের কথা বলা হয়নি। বরং

সিনার কথা বলা হয়েছে। যেখানে কলব রয়েছে। ডাক্তার সাহেব তো তার বুঝ অনুযায়ী বলেছেন। কারণ ডাক্তাররা তো ব্রেইনে অনেক কিছু পান। কোষ পান। কিন্তু কলবে কিছু খুঁজে পান না। কলব তো কেবল একটি গোশতের টুকরা। আসলেও তো কলব গোশতের একটি টুকরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এটাকে গোশতের টুকরাই বলেছেন। ডাক্তাররা এখানে এর বেশি কিছু পান না। কিন্তু কলবের ভিতরে যে বিশাল অনুভূতি রয়েছে সেটা শুদ্ধ হলে যে ব্রেইন শুদ্ধ হয়, এটা নষ্ট হলে যে ব্রেইন নষ্ট হয় এই অদৃশ্য বিষয়টি তারা কিভাবে বুঝবে? শুধু বস্তুবাদী মন-মানসিকতা নিয়ে যারা কুরআন বুঝতে চায় তারা তো সিনার তারজমা ব্রেইন ছাড়া আর কিছু পাবে না। দৃষ্টিভঙ্গিই তো ভুল। এজন্য বলি, একেকজন একেক রকম তাফসীর লিখে। তাই তাফসীর পড়তে সাবধানতা জরুরী। ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়া নিষেধ নয়, তবে হক্কানী আলেমদের পরামর্শক্রমে পড়তে হবে।

দুনিয়া মুমিনের স্বদেশ নয়

হাদীসে এসেছে–

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ .[55]

দুনিয়ার মধ্যে তুমি থাক পরদেশি হিসেবে। বিদেশি হিসেবে। দুনিয়া আমার বিদেশ। এটা আমার স্বদেশ নয়। আমি বিদেশে আছি। আমার স্বদেশ কোনটা? আমার স্বদেশ হল জান্নাত।

گنج ِعلم مَا ظهر مع ما بطن
گفت از ایما ن بود حب الوطن
این وطن مصر و عراق و شام نیست
این وطن شهر یست کا ں را نام نیست

এমন একটা দেশ আছে, যার প্রকৃত পরিচয় দেয়া অনেক কঠিন। আমরা কেবল এতটুকু বুঝতে পারি যে, আমাদের বাবা আদম (আ.)

৫৬. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪১১৪

আর মা হাওয়া (আ.) যেখানে ছিলেন সেটা আমাদের স্বদেশ। জান্নাত আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। কারণ তাঁরা তো জান্নাতে ছিলেন।

হিন্দুস্তান আমাদের

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর একটি ছোট কিতাব আছে। যার নাম হল هندوستان همارا هے 'ভারত উপমহাদেশ আমাদের'। কেন, কিভাবে? আমাদের আকীদা-বিশ্বাস হল, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে ছিলেন। হিন্দুস্তানের অন্য ধর্মাবলম্বীরা এটা বিশ্বাস করে না। আর আদম (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীর যে ভূমিতে নেমেছেন সেটি ছিল হিন্দুস্তান। আমরা আদমকে আমাদের আদি পিতা মনে করি। সর্বপ্রথম যিনি যে অঞ্চলে আসেন তিনি তার মালিক হয়ে যান। বন্যায় মাছ ভেসে এলে যে যেটা ধরতে পারে সে সেটার মালিক হয়ে যায়। এটাকে**حق اسبقیت** বলে। অর্থাৎ সবার আগে যে যেটা ধরতে পারে সেটার মালিক সে হয়ে যায়। সরকারী জায়গায় ঘাস হয়েছে। একজনে কেটে বস্তা ভর্তি করেছে তো অন্যজন সেটা নিতে পারবে না। জমিদারী প্রথা শেষ হওয়ার পর যখন মানুষকে জমি-জমা দেওয়া হয়েছে সেখানেও কিন্তু যার যার কাছে যতটুকু ছিল তার মালিক তাকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে তোমরা শুধু সামান্য খাজনা দিবে। এটাকে **حق اسبقیت** বলে। এটা আন্তর্জাতিক আইন। আল্লাহপাকেরও আইন।

তো হিন্দুস্তানের মালিক হযরত আদম (আ.)। আমাদের বিশ্বাস হল আল্লাহর সৃষ্টি সর্বপ্রথম মানুষের সর্বপ্রথম অবস্থান হয়েছে হিন্দুস্তানে। এজন্য হিন্দুস্তান আমাদের বাবার সম্পদ। আমরা ওয়ারিশ হিসেবে মালিক। তাই هندوستان همارا هے হিন্দুস্তান আমাদের আদি ভূমি।

হিন্দুস্তানে সুগন্ধিময় বস্তুর প্রাচুর্য কেন?

আরেকটা মজার কথা শুনে নিন। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এসেছে- পৃথিবীর সব জায়গার তুলনায় সুগন্ধিজাতীয় জিনিস হিন্দুস্তানে বেশি উৎপন্ন হয়। যেমন 'উদে হিন্দী' নামে একটি সুগন্ধি বস্তু আছে। অনেক

দামি। এটা হিন্দুস্তান ছাড়া অন্য কোনো দেশে হয় না। এর কারণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে- হযরত আদম (আ.) দুনিয়াতে আসার পূর্বে তো তাঁর শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খুলে পড়েছিল। তখন তিনি জান্নাতের বিভিন্ন গাছের লতাপাতা দিয়ে দেহ আবৃত করেছেন এবং সেগুলো নিয়েই তিনি ভারতের মাটিতে এসেছেন। ফলে জান্নাতী বস্তু সেখানে পড়েছে। তাই সেখান থেকে ভালো ভালো সুগন্ধিযুক্ত গাছ উৎপন্ন হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

মু'মিনের স্বদেশ হল জান্নাত

বলছিলাম, আমাদের একটা ঠিকানা আছে। সেটি হল জান্নাত।

ملكِ دنيا تن پرستاں را حلال
ما غلام ملك مولى بے زوال

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আখেরাত ভুলে যাওয়া দুনিয়াদারদের জন্যই শোভা পায়। যাদের সামনে আখেরাত নেই দুনিয়ার রাজত্ব তাদের জন্যই মানায়।

আমাদের সামনে ভিন্ন জিনিস আছে। আমাদের সামানে আখেরাত আছে। আমাদের সামনে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি আছে। আমাদের সামনে চিরস্থায়ী বিষয়াদী আছে। এজন্য আমদের অবস্থা আর তাদের অবস্থা এক হওয়ার কথা নয়। আমরা ঈমানদার। আমরা আখেরাতকে বিশ্বাস করি। তারা বিশ্বাস করে না।

দোস্ত! আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ .[56]

দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি পরদেশি। বিদেশি মানুষ। আমাদের দেশের মানুষরা সৌদি গিয়ে বিদেশি হয়। আমেরিকায় গিয়ে বিদেশি হয়। লন্ডন গিয়ে বিদেশি হয়। আর সেখানে কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে বাড়িতে পাঠায়। সে টাকায় জায়গা কিনে ঘর-দুয়ার করে। বিদেশে সে অল্প দিনের জন্যই থাকে।

---

৫৭. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪১১৪

দুনিয়া হল ঈমানদারের পরদেশ। দুনিয়ার জীবন বিদেশি জীবন। মৃত্যুর পর শুরু হয় স্বদেশ। কেউ মারা গেল তো আসল জায়গায় গেল। উর্দুতে প্রবাদ আছে-

لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مرگیا مظہر اپنا گھر گیا

মানুষ মনে করে যে, মাযহার মরে গেছে। আসলে মাযহার মরেনি বরং নিজের বাড়ী গেছে।

আবু আমের নামের একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। ঐ যমানার বাদশা এসে তাকে বললেন, আমার কাছে দুনিয়ার জিনিসগুলো খুব ভালো লাগে। দুনিয়াতে বেশি দিন থাকতে ইচ্ছা করে। মরতে মন চায় না। ব্যাপার কী? আমি না ঈমানদার! মরলেই তো আমি আল্লাহর কাছে চলে যাব। আমার কাছে কষ্ট লাগে কেন? আবু আমের (রহ.) তো ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের ডাক্তার। তাই তিনি জবাব দিয়েছেন–

'হে বাদশা! তুমি তোমার দুনিয়ার জগতটাকে আবাদ করে রেখেছো। আর পরকালটাকে অনাবাদ করে রেখেছো। পরকালকে 'ছাড়াবাড়ী' বানিয়ে রেখেছো। তাই আবাদী ছেড়ে অনাবাদীতে যেতে মন চায় না। তুমি যদি পরকালকে আবাদ করে রাখতে তাহলে অবশ্যই তোমার সেখানে যেতে মন চাইত'।

দোস্ত! দুনিয়ায় আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহপাক আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন ঈমান আর আমলের জন্য। আর এর জন্য ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। সবাইকে ইলম শিখতে হবে। আমরা যে মজলিসে বসে আছি এটা একটা তালিমের হালকা। যেখানে ফাযায়েলের কিতাব পড়া হয় সেটাও একটা ইলমের হালকা। তাফসীর মাহফিল হয়, উলামায়ে হক্কানী বয়ান করেন সেটাও ইলমের হালকা। এসব মজলিসে বেশি বেশি শরীক থেকে আমরা দীন শিখব।

আর মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য কোনো একজন আলেমের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখব। তাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া আমার এক কদম চলার উপায় নেই। তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। নিজে বই পড়েই আমল শুরু করে দিব না। তাহলে পূর্বের ঘটনার মত অবস্থা হবে। আজ তো

মানুষ বিষকে ঔষধ মনে করছে। এজন্য একথাগুলোর প্রতি সবাই আমরা যত্নবান হব। সবাই খেয়াল রাখব।

মু'মিনের ভবিষ্যত

দোস্ত! আমাদের বোঝা উচিত, একজন মানুষের ভবিষ্যত বলতে কোনটাকে বোঝায়। অনেকে মনে করে, ভবিষ্যত হল আমার এ দুনিয়ার বাকী হায়াত কিভাবে যাবে। অনেকে চিন্তা করে, আমি যখন বিছানায় পড়ে যাব তখন কিভাবে চলব। কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে চিন্তা করে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানরা কিভাবে চলবে–এগুলো নিয়ে চিন্তা করে এবং সে অনুযায়ী কাজ-কর্ম করে থাকে।

দোস্ত! একজন ঈমানদারের ভবিষ্যত কেবল এতটুকু নয়। তবে এটা ভবিষ্যত বহির্ভূত জিনিসও নয়। ঈমানদারের ভবিষ্যত হল আমার আগামীকাল থেকে নিয়ে জান্নাতে গিয়ে আল্লাহপাকের দীদার লাভ করা পর্যন্ত পুরাটা বিষয়। একজন দুনিয়াদারের ফিকির থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। আর ঈমানদারের ফিকির থাকে জান্নাত পাওয়া পর্যন্ত। এখানেই শেষ নয় তারপরও আরো কিছু আছে। জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহপাকের দীদার লাভ করা এবং আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা পেয়ে যাওয়া যে, আমি চির দিনের জন্য তোমাদের প্রতি রাজি হয়ে গেলাম। আর কোনো দিন নারাজ হব না। এ সবটাই মু'মিনের ভবিষ্যত। আল্লাহপাক বলেন–

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ – (سورة الحشر : 18)

সবাই যেন এটা দেখে আগামী কালের জন্য সে কী প্রেরণ করেছে? তাই আমাদের জীবনটাকে ওভাবেই কাটাতে হবে। আল্লাহপাক আমার দুনিয়ার হায়াতটি মূলতঃ আমার আখেরাতের কামাইয়ের জন্য দিয়েছেন। এখন যদি এটাকে এ পর্যন্তই শেষ করে দিলাম আর সামনে কিছু করলাম না, তো কী হল? কিছুই হল না। এজন্য দোস্ত! আমাদের এ হায়াতের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করতে পারি, সময়ের কদর করতে পারি, আমল শিখতে পারি।

এজন্য ফুলছোঁয়া মাদরাসায় দু'দিনের তরতীব করা হয়েছে। সেখানে ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায ইত্যাদির প্রশিক্ষণ হয়। বিভিন্ন আধুনিক

মাসআলার আলোচনা হয়। কবর, দাফন-কাফন সুন্নত মোতাবেক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব শিখতে হবে। শিখে এসে নিজ এলাকায় এসবের প্রচলন ঘটাতে হবে। আল্লাহ তৌফিক দান করুন।*

---

* ২৫/০১/১৩ইং তারিখে নারায়ণগঞ্জ ডি.আই.টি জামে মসজিদে প্রদত্ত বয়ান

মানুষের মূল্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.
اَمَّا بَعْدُ :
فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ او كما قال عليه الصلاة والسلام. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন; শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ, দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন; আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হল দীন; এ দীনের নিসবতে এবং এ দীনের মহব্বতে দীনের কথা বলা-শোনার জন্য এমন একটি পরিবেশে এনে বসিয়েছেন, যার এক দিকে মসজিদ অপর দিকে মাদরাসা। আবার এখানে অনেক আলেম-উলামার সমাবেশ। এরকম একটা মজলিসে বসার তৌফিক দেয়া আল্লাহপাকের অনেক বড় এহসান ও দয়া।

মুমিনের আনন্দঘন মুহূর্ত

خوش آں وقت که خرّم روز گارے
که یارے بر خورد از وصل یارے

দুই বন্ধুর জন্য ঐ সময়টুকু বেশি মূল্যবান, যে সময় তাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়।

এর চেয়ে আর খুশির মুহূর্ত কোনটি? আমার মাওলা আমাকে তাঁর দিকে টেনে নেয়ার জন্য রাস্তা খুলে দিয়েছেন। এমন পন্থা অবলম্বনের তৌফিক দিয়েছেন, এমন কাজে অংশ গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, এমন মজলিসে বসার তৌফিক দিয়েছেন যেখানে বসার উসিলায় মাওলার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। যেখানে বসলে মাওলায়েপাক আমাকে তাঁর দিকে টেনে নেন, আমাকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এর চেয়ে আর খুশির মুহূর্ত আর কী হতে পারে।

মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রা.)-এর ঘটনা

আমাদের দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)। তিনি কেবল দারুল উলূমের প্রধান মুফতী ছিলেন না; বরং সারা পৃথিবীর প্রধান মুফতী ছিলেন। তিনি আমাদের বাংলাদেশেও এসেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন। রমযানে তিনি একেক বছর একেক দেশে চলে যেতেন। সেখানকার ভক্তবৃন্দ হুজুরকে নিতেন এবং হুজুরও আগ্রহের সাথে যেতেন। সেখানে দীনের কাজ করতেন। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে এমনই এক সফরে। সাউথ আফ্রিকায় তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। ইন্তেকালের পূর্বে খুবই বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ সময় কাটিয়েছেন। এসময় একবার তাঁর শুভাকাঙ্খীরা বলল হযরত! আপনার কাছে তো সারা পৃথিবী থেকেই লোকজন আসে। এখানেই তো যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। এ বৃদ্ধ বয়সে দেশে দেশে সফর না করে বরং এখানেই থাকুন। আপনার শরীর তো খুবই দুর্বল। তিনি জবাব দিলেন, আমি যাই না; বরং মাওলায়েপাক টেনে নিয়ে যান। তিনি টেনে নিলে আমি কী করব। একথাটা তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে বলতেন–

رشتئه درگردنم افگنده دوست
می برد هر جاکه خاطر خواهِ اُوست

আমার মাওলা আমার গলায় একটি রশি ঝুলিয়ে দিয়েছেন। আমার মাওলা রশির এক মাথা আমার গলায় বেঁধেছেন, আরেক মাথা তাঁর কুদরতী হাতে ধরে রেখেছেন। ঐ রশি ধরে টেনে টেনে আমাকে এখানে ওখানে নিয়ে যান। যেখানে গেলে তিনি রাজি-খুশি হন সেখানে নিয়ে যান। মাওলায়ে পাক আমাকে টেনে নিয়ে যান তো আমি যাই। তিনি নিয়ে যেতে চাইলে আমি না যেয়ে পারব?

দোস্ত! আমি আপনি যে এ মাহফিলে এলাম আমরা আসিনি, মাওলা আমাদেরকে টেনে এনেছেন। কেউ কারো বাহু বলে আসিনি।

میں خود آیا نہیں' لایا گیا ہوں
محبت دے کہ تڑ پایا گیا ہوں

আমি আসিনি, আমাকে আনা হয়েছে। কেন আনা হল? আল্লাহপাক আমাদের ভেতর যে মহব্বত দিয়েছেন ঐ মহব্বতের টানে এখানে এনেছেন। ইঞ্জিনের টানে যেমন রেলের বগি চলে, তেমন আল্লাহর মহব্বতের টানে আমাদের এখানে আসা।

কত মানুষ কত জায়গায় যায়। কেউ সিনেমা দেখতে যায়। কেউ টেলিভিশনের পর্দার সামনে যায়, কেউ বেগানা নারীদের অনুষ্ঠানে যায়, কেউ বিদআতী বেশরা পীর-ফকীরের মজলিসে যায়। আমরা এসেছি আল্লাহর প্রিয় জায়গায়।

দীনের নামে বদদীনি মাহফিল

বেদআতী মাহফিলগুলো নামেই দীন, আসলে বদদীন। নামে দীন, কাজে নির্ভেজাল শিরক। তারা শরীয়ত আর মারেফাতকে ভাগ করে নিয়েছে। বলে, শরীয়ত আর মারেফাত ভিন্ন জিনিস। দু'টি আলাদা আলাদা লাইন। একটা শরীয়তের লাইন আরেকটি মারেফতের লাইন। তারা বলে, শরীয়তের লাইনেও খোদাকে পাওয়া যায়। আর মারেফাতের লাইনই তো আসল লাইন। তারা কী বলে জানেন? তারা বলে–

'' শরীয়তের আলেম যারা বাদ্যযন্ত্র ধরা মানা
বাদ্যের ভিতর কী ভেদ আছে আলেমগণে জানে না।
আউয়াল ও আখের তুমি জাহের ও বাতেন তুমি
কেউ বা বলে মোস্তফা তুমি, কেউ বা বলে হুবহু খোদা।"

(নাউযু বিল্লাহ!)

এমন শিরকী কথা যারা বলে তারাও তো পীর দাবী করে। তাদের আস্তানাও তো পীরের দরবার। যেখানে প্রতি মুহূর্ত শিরকের চর্চা হয় সেটা আর দীন হয় কিভাবে? আল্লাহপাক মেহেরবানী করে আমাদেরকে এরকম জায়গায় নেননি বরং আমাদেরকে এমন জায়গায় এনেছেন যেখানকার কাজ হল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর তরীকা অনুযায়ী আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা।

خیال عارفاں باشد محمد
جمال دل براں باشد محمد

দুনিয়াতে যত ওলী-বুযুর্গ রয়েছেন তাঁদের সকলের কাজ মাত্র একটি। সেটা হল আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় তুলে দেয়া। সকলের এই একটি কাজ। দ্বিতীয় আর কোনো কাজই নেই। উদ্দেশ্য একটা, রাস্তাও একটা। উদ্দেশ্য যদি দু'টা হয় তাহলে শিরক হবে।

একটা শিরকী কথা

অনেকে বলে, আগে আল্লাহ পিছে আপনি। এটাও শিরকী কথা। আগেও আল্লাহ, পিছনেও আল্লাহ, ডানেও আল্লাহ, বামেও আল্লাহ, নিচেও আল্লাহ, উপরেও আল্লাহ। অনেক সময় লোকজন এসে বলে, হুজুর! ছেলেটাকে রেখে গেলাম। আগে আল্লাহ পিছে আপনি। নাউযুবিল্লাহ। ঐসব কথায় ভন্ডরা খুশি হতে পারে। সে ভাববে আমাকে খুব ইজ্জত করেছে। আমরা খুশি হতে পারি না।

কারণ, একথার মাঝে শিরকের গন্ধ আছে। তাওহীদ তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাঝে যদি দুইটা জিনিস এসে যায় তাহলে শিরক হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মাঝেও যদি দুটি জিনিস এসে যায় তাহলে এর নাম বিদআত।

শরীয়াত ছাড়া মারেফাতের উপমা

ভণ্ডরা বলে, উদ্দেশ্য একটাই কিন্তু রাস্তা দুটি। একটা শরীয়তের রাস্তা, আরেকটা তরীকতের রাস্তা। এটা হল ভন্ডামীর রাস্তা।

যখন শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করা হয় তখন ওটা মারেফাতের দিকে যায়। সুসন্তান বিবাহ-শাদীর ফসল। বিবাহ-শাদী ছাড়া সন্তান হলে তার নাম ...। অনেক জিনিসের নাম বলা যায় না। না বলাই ভালো। বিবাহ-শাদী ছাড়া সন্তান হলে যেমনটা হয়, শরীয়ত বাদ দিয়ে যারা মারেফাত ধরে তাদের অবস্থাও অনুরূপ।

উদ্দেশ্যও একটি, পন্থাও একটি

আমাদের উদ্দেশ্যও একটি। সে উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য রাস্তাও একটি। তার নাম হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হক্কানী-রব্বানী বুযুর্গানে দীনের কাজই হল মানুষকে ধরে এনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় তুলে দেয়া। উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো। রাস্তা হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এটাই হল কালিমার হাকীকত। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু হল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য আদর্শ ও রাস্তার প্রয়োজন। ওই আদর্শ আর রাস্তার নাম হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। উদ্দেশ্যও এক, আদর্শও এক।

আল্লাহপাক আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে না নিয়ে সঠিক পথে এনেছেন—এটা তাঁর অনেক বড় ইহসান ও দয়া।

ইসলাহী মাহফিলের অর্থ

এ মজলিসের নাম ইসলাহী মজলিস। ইসলাহ শব্দের অর্থ হল সংশোধন করা। কিসের সংশোধন করা হবে? দুনিয়ার বহু জিনিসের সংশোধন করা হয়। রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন হয় এবং ভবিষ্যতেও করা হবে। এখানে ইসলাহ বা সংশোধন দ্বারা কী উদ্দেশ্য? অন্যের সংশোধন, নাকি নিজের সংশোধন? নিজের সংশোধন। এখানে যারা বয়ান করেন তারা নিজেদের সংশোধনের জন্যই বয়ান করেন। কখনো নিজের সংশোধনের জন্যও আলোচনা করতে হয়। শ্রোতাগণ শুনে উপকৃত হলে তো ভালো কথা।

কী সংশোধন করা হবে

মানুষকে আল্লাহপাক যেসব জিনিস দিয়ে তৈরি করেছেন তন্মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিস হল দিল। এ দিলের কারণেই মানুষ 'মানুষ' হয়। একটা সন্ত্রাসী আর দয়াশীল মানুষ যদি একত্রে হাঁটে তাহলে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে, কে সন্ত্রাসী আর কে দয়াশীল। দেখতে তো উভয়েই মানুষ। আসলেই কি উভয়ের পরিচয় এক, নাকি ভিন্ন? ভিন্ন। ভিন্ন হল কী দিয়ে? দিল দিয়ে। একজনের দিলের হালত ভালো নয়।

আরেকজনের দিলের হালত ভালো। একজনের দিলের হালত এত খারাপ যে, আল্লাহপাকের ভাষায় সে- أُوْلٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ হিংস্র জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।[৫৭]

হিংস্র জন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট কী জিনিস?

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম কারী তৈয়্যব (রহ.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল হুজুর! পশুর চেয়ে অধম আবার কেমনে হয়? তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন পশুরও তো একটা স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে। এই স্বাভাবিক অবস্থায় পশু মানুষের সাথে চলাফেরা করতে পারে। যেমন কুকুর মানব সমাজেই বাস করে। মানুষ তাকে দেখে ভয় পায় না। কিন্তু এই কুকুর যখন পাগল হয়ে যায় তখন কত হিংস্র হয়ে যায়। তখন মানুষ তাকে কত ভয় পায়। কোনোভাবে যদি একটু দাঁত বা আঁচড় লেগে যায় তাহলে জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ইঞ্জেকশন দিতে হয়।

মানুষ পশুর চেয়েও খারাপ হয়। যদিও দেখতে একই রকম দেখায়। ব্যবধান হয়েছে দিলের হালতের কারণে। মানুষের মধ্যে যারা ভালো তারাও দিলের হালতের ব্যবধানের কারণে অনেক ভাগে বিভক্ত। কেননা ভালোর কোনো শেষ নেই। আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে যদি সামনে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে এত সামনে অগ্রসর হয় যে, প্রধান ফেরেশতা জিবরীলও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আবার যদি মানুষ নিচে নামতে থাকে তো নামতে নামতে এত নিচে নেমে যায় যে, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। এ ব্যবধান একমাত্র দিলের বিবেচনায়।

নবীদের কর্মক্ষেত্র

যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে আগমন করেছেন তাদের সকলেরই কর্মক্ষেত্র ছিল মানুষের দিল। দিল বানাও, মানুষ হয়ে যাও। দিল বানাও ফেরেশতাদের চেয়ে দামি হয়ে যাও। সমস্ত আসামানী কিতাবে এক কর্মসূচী এক বিষয়বস্তু- মানুষের দিলকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করা।

মানুষের মর্যাদা ও যোগ্যতা

৫৮. সূরা আরাফ : ১৭৯

এ মর্মে একটি হাদীসের অংশ তেলাওয়াত করা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا .[58]

দুনিয়াতে সবচেয়ে দামি জিনিস হল মানুষ। চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে দামি নয়। মানুষের চেয়ে দামি আর কিছুই নেই। এমনকি ফেরেশতাকুলকেও আল্লাহপাক মানুষের খাদেম বানিয়েছেন।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেন–

ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كار اند
تا تو نانے بكف آری وبغفلت نخوری
همه از بهر تو سر گشته و فرماں بردار
شرط انصاف نباشد كه تو فرماں نبری

অর্থ– মেঘ, বায়ু, সূর্য ও আসমান সবই তোমার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যেন যখন তুমি রুটি হাতে নিবে তখন তা উদাসীনভাবে ভক্ষণ না করো। সকল বস্তু তোমার সেবার জন্য ব্যস্ত ও তোমার অনুগত। যদি তুমি আল্লাহ তাআলার অনুগত না হও তা হলে অন্যায় হবে।

হযরত মুফতী শফী (রহ.) বলেন–

یه زمیں میرے لئے هے آسماں میرے لئے
هے مصروف خدمت كل جهاں میرے لئے

এই পৃথিবী আমার জন্য, আসমান আমার জন্য, কুল কায়েনাত আমার খেদমতে নিয়োজিত।

حركت افلاك و انجم دور شمسی كا نظام
چل رها دیر سے یه كارواں میرے لئے

নক্ষরাজির ঘূর্ণন ও সূর্যের আবর্তন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে চলছে, এই কাফেলা আমারই জন্য।

ایك میرے دم سے هے اس بزم عالم كا فروغ
وقف خدمت هے یه سب كون ومكاں میرے لئے

৫৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৬০

বিশ্বসভা আমার অস্তিত্বেই আলোকিত, বিশ্ব প্রকৃতি আমার খেদমতেই নিয়োজিত।

میرے ہستی میں ہے مضمر ہستی عالم کا راز
ہے یہ سب ایجاد وشورکن فگاں میرے لئے

আমার অস্তিত্বেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য লুকায়িত, এই সবের সৃষ্টি ও কোলাহল পরিবেশ আমারই জন্য।

کیوں نہ ہو روزِ ازل میں ہو چکی تقسیم کار
میں ہوں مالك کیلئے اور دو جہاں میرے لئے

রোযে আযলে কাজ বিভক্ত হয়ে গেছে যে, আমি আমার প্রভুর জন্য এবং ইহকাল ও পরকাল আমার জন্য।

মুদ্দাকথা পৃথিবীর এ জমিন আমার। আমার জন্য জমিন বানানো হয়েছে। আমাকে জমিনের জন্য বানানো হয়নি। এই আসমান আমার জন্য বানানো হয়েছে, আমাকে আসমানের জন্য বানানো হয়নি। এই চন্দ্র-সূর্য, গ্যালাক্সী আমার জন্য বানানো হয়েছে। প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্ররাজি এমনকি গোটা পৃথিবী বানানো হয়েছে আমার জন্য। কক্ষপথে যা কিছু ঘুরছে সব একমাত্র আমি মানুষের সেবা দেয়ার জন্য। তাই চিন্তা করে দেখুন, কেমন দাম মানুষের। প্রতিটি মানুষের পিছনে অগণিত ফেরেশতা খেদমতে নিয়োজিত যাতে সাপ-বিচ্ছু কামড় দিতে না পারে। উপর থেকে যেন কিছু ভেঙ্গে না পড়তে পারে। অনেক বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা! প্রতি সেকেন্ড সব ফেরেশতা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে। কত ফেরেশতা এই ধান ও গম উৎপাদনের পেছনে মেহনত করছে।

মানুষের চেয়ে দামি আর কোনো বস্তু নেই। বড় আফসোস আর দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা কী নিয়ে ব্যস্ত। কী নিয়ে পাগল হলাম। দলাদলি করে মানুষ মারছি। কেউ মরে আর কেউ মারে। যেন প্রতিযোগিতার বিষয়। আহ! এই মানবতা আর এই মনুষ্যত্বের জন্য আমরা ধিক্কার পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। গোটা দুনিয়ার মুসলমানকে হেফাজত করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে মানুষের মূল্য বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মানবসম্পদ। দুনিয়াতে মানব সম্পদের মূল্যায়নেই বড় বড় দার্শনিক বিজ্ঞানী তৈরি হয়েছে।

মানুষের মূল্য বোঝানোর জন্য নানাজন নানাভাবে মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচয় পেশ করেছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর দার্শনিক ও জ্ঞানী গুণীরা মানুষের যেসব সংজ্ঞা ও পরিচয় দিয়েছেন সবগুলোকে এক পাল্লায় রাখুন আর মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটুকু اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ এক পাল্লায় রাখুন। দেখবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীটি ওজনে সবচেয়ে বেশি হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ বাণীতে বলেন, মানুষ হল স্বর্ণ ও রূপার খনি। আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে এমন জিনিস রেখেছেন যা স্বর্ণ-রূপার খনির মত মূল্যবান ও সম্ভাবনাময়।

স্বর্ণ-রূপার খনিতে কী পমিাণ স্বর্ণ থাকে অনুমান করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার তেমনি একটি খনির মূল্য নির্ধারণ করাও দুষ্কর বিষয়। এক কথায় পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল স্বর্ণ-রূপার খনি। মানুষের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে এ খনির সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে স্বর্ণ-রূপার খনির চেয়ে মূল্যবান কিছু থাকলে সেটার সাথেই তুলনা করা হত। আরও লক্ষণীয় হল হাদীসে খনির একবচন ব্যবহার করা হয়নি; বরং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যেন একথা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষের মূল্য একটি মাত্র খনির সমান নয়; বরং অনেকগুলো খনির সমান। গোটা পৃথিবীর মূল্য দিয়েও যদি মানুষকে মূল্যায়িত করা হয় তাহলেও মানুষের মূল্য হবে না। মানুষের একটা অঙ্গের কত মূল্য! তাই তো মানুষের অঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এমনকি মাথার একটি চুলও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। কারণ এ চুলটি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সত্তার অংশ। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ ۔ [59]

আমি বনূ আদম তথা মানুষকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি।

---

৬০. সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০

কেমন সম্মানিত করেছেন? এত সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন যে, গোটা পৃথিবীর সকল সম্পদের বিনিময়েও মানুষের একটি চুল ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই।

দোস্ত! মানুষের ভেতরের খনিটা কী? খনি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? মানুষের দিলের অবস্থা আর সম্ভাবনাকে খনি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহপাক মানুষের দিলে এমন সম্ভাবনা দিয়েছেন যা অন্য কোনো মাখলুকের মধ্যে নেই। এমনকি ফেরেশতাদের মাঝেও নেই। আল্লামা ইকবাল বলেন–

بر خود نظر کشاں زتہی دامنی مرنج
کہ در سینۂ تو ماہی تمامی نہادہ اند

তুমি তোমার ভিতরে একটু নজর দাও। যদি দেখ তাতে কিছু নেই তাতে পেরেশান হয়ো না। কারণ তুমি যদি এখন থেকে দৃঢ়প্রত্যয়ী হও, তুমি তোমার দিলকে দিল বানানোর কাজে আত্মনিয়োগ কর, তোমার দিলে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা কাজে লাগানোর ইচ্ছা কর তাহলে দেখবে তোমার ভিতর পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছে। স্বর্ণ-রূপা যখন খনির মধ্যে থাকে তখন তা চেনা যায় না। মাটি লেগে থাকে। যখন ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং ঘষা দেয়া হয় তখন স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যাবে।

হে মানুষ! তোমার ভিতর এ সম্পদ রাখা হয়েছে।

مقام انکا ہے دلوں کی خلوتوں میں
خدا جانے مقام دل کہاں ہے

বান্দার দিলের পজিশন কত বড় তা কল্পনাও করা যায় না। কারণ আল্লাহর অসীম সত্তা বান্দার দিলে সংকুলান হয়ে যায়।

চিন্তা করুন, বান্দার দিলের অবস্থানটা কোথায়। দিলের মাঝে অনেক যোগ্যতা ও সম্ভাবনা দিয়ে মানুষকে তৈরি করেছেন। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুন। আমরা কী নিয়ে এত পাগল হলাম। আমার ভিতর যে দামি সম্পদ রয়েছে সেটা কাজে লাগছে না। আমরা যদি দুনিয়া ও আখেরাতে দামি হতে চাই তাহলে নিজের দিলকে টার্গেট বানাই। আমার দিলকে আমি ভালো বানাব।

آرزوئے خون ہوں یا حسرتیں پا مال ہو ں
اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

দোস্ত! আমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে, আমার দিলটা আমার মাওলার উপযুক্ত বানাতেই হবে।

میرا سر ہو تیرا در ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی

মাওলা! আমার জীবনের কেবল এই আশা যে, আমার দিলটা আপনার ঘর হয়ে যায়। আমার দিলটা আপনার জায়গা হয়ে যায়।

দোস্ত! দিলের হালত অটোমেটিক এমন হয়ে যাবে না। এর জন্য আমাকে অনেক দীর্ঘ ভূমিকা পালন করতে হয়। নামায পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, হজ করতে হবে, যাকাত দিতে হবে, পর্দা-পুশিদা মত চলতে হবে, হালাল-হারাম বেছে চলতে হবে, দুনিয়ার অনেক সুবিধাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। এভাবে মাওলার সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হতে হবে। যাতে আমার দিলটা মাওলার জায়গা হয়ে যায়।

দুনিয়ার হাকীকত

আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ওলী। আমার নানুপুরী আ'লা হযরত বলতেন তিনি সে যুগের আউলিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ যুগের সবচেয়ে বড় ওলী ছিলেন। তিনি তার রচিত 'মহব্বত নামা' কিতাবে নিজেকে সম্বোধন করে লিখেছেন–

دلا تاکئے دریں کاخِ * کنی مانندِ طفلاں خاکبازی
مجازی * کہ بودت آشیاں بیروں ازیں
توئی آں دست پر ور مرغ * کاخ
گستاخ * چو دوناں چغد ایں ویرا نہ
چرا زاں آشیاں بیگانہ گشتی
گشتی بپر تاکنکر اَیْوَان اَفْلاك
بیفشاں بال وپرز آمیزش

خاك

ওহে দিল! তুমি আর কত দিন এই ধূলায়-ধূসরিত পৃথিবীতে ছোট বাচ্চাদের মত মাটি নিয়ে খেলাধূলা করবে।

এটা মূলত কুরআনের এ আয়াতের তফসীর–

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [60]

আল্লামা জামী (রহ.) নিজের দিলকে সম্বোধন করে বলেন, হে দিল! মাটির তৈরি এই পৃথিবীতে ছোট বাচ্চারা যেমন নারিকেলের আইচার মধ্যে ধুলা-বালু দিয়ে রান্নাবান্না করে এবং আনন্দ করে এই দুনিয়াতে তুমি আর কতদিন শিশুদের মত খেলাধুলায় মত্ত থাকবে!

তুমি তো মাওলায়ে পাকের কুদরতী হাতে তৈরি একটি পাখি। (মানুষের দিলকে পাখির সাথে উপমা দেয়া হয়। কারণ পাখি যেমন উড়তে পারে, মানুষের দিলের মধ্যেও উড়ার ক্ষমতা রয়েছে)। তোমার বাসস্থান তো মাটির পৃথিবী নয়। ইট দিয়ে তৈরি এসব দালান-কোঠা তোমার আসল ঠিকানা নয়। তোমার আসল বাড়ি তো হল দুনিয়ার জগতের উর্ধ্বে যে জগত রয়েছে সেটি। জান্নাত কোথায়? মাটির নীচে না উর্ধ্বজগতে? উর্ধ্ব জগতে। একজন মুমিনকে এ দুনিয়ার দশগুণ সমপরিমাণ বেহেশত দেয়া হবে। শত শত কোটি মানুষকে বেহেশত দেয়া হবে। তাদের বেহেশতের জায়গা কোথায়? উর্ধ্বজগতে। উর্ধ্বজগতে জায়গার অভাব নেই। উর্ধ্ব জগতটা কত বড়, মহাশূন্যটা কত বিস্তৃত আমি আর আপনি তা কল্পনাও করতে পারব না। শুধু এতটুকু বুঝুন যে, সূর্যটা প্রথম আসমানের অনেক নীচে। এই সূর্যটা পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। উর্ধ্ব জগতে সূর্যটাকে কত ছোট দেখা যায় এবং তার চতুর্দিকে কী পরিমাণ খালি জায়গা। এত বিশাল জায়গা দুনিয়ার আসমানের নীচে।

এখান থেকে দুনিয়ার আসমানের দূরত্ব যতটুকু আসমানটা ঠিক ততটুকু মোটা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এর

৬১. সূরা আনকাবুত : ৬৪

পরিমাণ বোঝাতে গিয়ে ৫০০ বছরের রাস্তার কথা বলেছেন। কিসের রাস্তা? দুনিয়াতে সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন যে জিনিস আবিষ্কৃত হবে তার ৫০০ বছরের রাস্তা লাগবে আসমানের ঘনত্ব অতিক্রম করতে। তারপর আবার ফাঁকা ৫০০ বছরের রাস্তা সমপরিমাণ। এভাবে সাত আসমান। কল্পনা করতে পারেন কত জায়গা! এবার বলুন বেহেশতে আপনাদের জায়গা হবে তো?

এ দুনিয়াটা হল দোযখের জায়গা। দোযখ দুনিয়ায় কায়েম হবে। কুরআন শরীফের শব্দ থেকে তা বোঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. [61]

এ আয়াতে কারীমায় কুরআনকেই রশি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ اَلْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ

কুরআন শরীফ হল রশি। আমরা সবাই কূপের মধ্যে অবস্থান করছি। কূপ হয় সংকীর্ণ। আর উর্ধ্ব জগত অনেক প্রশস্ত। উর্ধ্ব জগত থেকে কূপের মানুষদেরকে উত্তোলন করার জন্য রশি ফেলা হয়েছে। আল্লাহপাক ঐ রশি ভালো করে ধরতে বলেছেন। সেই রশি হল কুরআন শরীফ।

দোস্ত! এসব মাদরাসা হল কুরআনী মাদরাসা। এখানে কুরআনের শব্দ শিখানো হয়। কুরআন মুখস্থ করানো হয়। কুরআনের অর্থ পড়ানো হয়। কুরআনের কোন আয়াতের কী অর্থ তা এখানে শিখানো হয়। এভাবে এখানে কুরআন কারীম সংরক্ষণ করা হয়।

দোস্ত! বলছিলাম আমাদেরকে আসলে দুনিয়ার জন্য বানানো হয়নি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

خُلِقَتِ الدُّنْيَا لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاٰخِرَةِ

দুনিয়ার সবকিছু তোমাদের জন্য বানানো হয়েছে। আর তোমাদেরকে বানানো হয়েছে আখরাতের জন্য।

আল্লামা জামী (রহ.) বলেন–

৬২. সূরা আলে-ইমরান : ১০৩

چرا زاں آشیاں بیگانہ گشتی
چو دوناں چُغد ایں ویرانہ گشتی

অর্থ : তোমার আসল ঠিকানা থেকে তুমি কেন এমন গাফেল হয়ে গেলে? ঠিকানা কেন ভুলে গেলে? তুমি পেঁচা পাখির মত কেন ছাড়াবাড়ির জন্য পাগল হয়ে রইলে? অনাবাদ জায়গার জন্য মত্ত হলে কেন? এটা তো তোমার আসল জায়গা নয়।

দোস্ত! আমাদের জন্য এ দুনিয়া হল ছাড়াবাড়ি। আমাদের আসল বাড়ি হল আখেরাত। আমরা সে বাড়ির কথা ভুলে গেছি। ছাড়াবাড়িকে আবাদ বাড়ি মনে করছি।

পাখি যদি কাদার মধ্যে পড়ার কারণে তার ডানা মাটির সাথে আটকে যায় তখন সে আর উড়াল দিতে সক্ষম হয় না, তাকে বিড়াল কুকুরে খেয়ে ফেলে। তাই আল্লামা জামী (রহ.) নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, বুঝতে পেরেছি মাটির দেশে থাকার কারণে কাদা মাটি লেগে তোমার ডানাটা ভারী হয়ে গেছে। উড়াল দেয়ার ক্ষমতা তুমি হারিয়ে ফেলেছো। এখন একটি কাজ হল তুমি তোমার ডানাটি একটু ঝাড়া মার তাহলে মাটি সরে যাবে এবং তুমি ডানা তুলে উড়াল দিতে পারবে। তাই বলতে থাক– لااله الا الله محمد رسول الله তাহলে আল্লাহপাক তোমাকে ঠিকানায় পৌঁছে দিবেন।

দুনিয়া কাকে বলে

দোস্ত! আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে আছি। দুনিয়ার মহব্বত আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। এগুলোকে বিসর্জন দিতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বত আর আল্লাহপাকের মহব্বত—দুইটি দুই মেরুতে অবস্থান করে। কোনো দিলে একটা হলে আরেকটা হবে না।

هم خدا خوا هیم وهم دنیا دو ں
ایں خیال ست ومحال است وجنوں

দুনিয়া কাকে বলে? আমরা বলে থাকি দুনিয়ার মহব্বত বর্জন করতে হবে, দুনিয়াকে ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু দুনিয়া কী জিনিস তা বুঝতে হবে। দুনিয়া হল তিন জিনিসের নাম।

১. সম্পদের লোভ।

২. যশ-খ্যাতির মোহ। আমি সভাপতি হব, আমি সেক্রেটারী হব—এসব মোহের নাম দুনিয়া। আজ তো এসব বদ মসজিদের মধ্যেও ঢুকেছে। বলে, অমুককে কে সভাপতি বানিয়েছে? উনি সভাপতি হলে আমি ওখানে যাব না। এই যশ-খ্যাতি ও পদের লোভই হল দুনিয়া।

৩. নারীর লোভ। হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দিলের মধ্যে আরেকটি নারীর প্রতি আকর্ষণ থাকা বা সম্পর্ক রাখা।

প্রয়োজন বনাম লোভ

সম্পদ তো মানুষের দরকার। একটা হলো দরকার হওয়া। আরেকটা হল লোভ হওয়া। এ দু'টা এক জিনিস নয়। দরকার পূরণ হওয়া চাই। এ দরকার পূরণ হওয়ার জন্য আল্লাহপাক হালাল পথ রেখেছেন। যদি হালাল পথে আসে তাহলে আল্লাহপাকের নেয়ামত। আর যদি দুনিয়ার লোভ ভিতরে চলে আসে সেটা দরকার থাকে না, মহব্বতের পর্যায়ে চলে আসে। এটা লোভনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সম্পদের সামান্য লোভ যখন কারো মধ্যে আসে, তখন সে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। অন্যের উপর জুলুম হচ্ছে কিনা এরও তোয়াক্কা করে না। কিভাবে নিজে সম্পদের পাহাড় গড়বে সে ফিকির নিয়ে মত্ত থাকে। এভাবে যশ-খ্যাতি ও পদের লোভ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আজ আমরা দেশে মারামারি হানাহানি, হত্যা, গুম, নাশকতা যা কিছু দেখছি সব কিছুর মূলে রয়েছে এ যশ-খ্যাতি ও পদের লোভ।

আরেকটা হল নারীর লিপ্সা। বিবেচনা করলে দেখব সমাজ ও পরিবারে আমরা যেসব সহিংসতা ও নাশকতা দেখছি তার নেপথ্যে উক্ত তিন জিনিসের কোনো একটা অবশ্যই পাওয়া যাবে। হয়ত সম্পদের লোভে পড়ে কাউকে হত্যা করছে, জুলুম করছে, না হয় পদের লোভে ও যশ-খ্যাতির লোভে এসব করছে, না হয় পরকীয়া প্রেমে পড়ে এসব করছে। এ তিন জিনিস যদি আমাদের সমাজে না থাকে তাহলে বছরের পর বছরও একটি খুন হবে না। এর নামই হল দুনিয়ার মহব্বত।

এক দিকে দুনিয়ার মহব্বত অপর দিকে হল আল্লাহপাকের মহব্বত। আল্লাহপাকের মহব্বত অন্তরে এসে গেলে এ তিন মোহ-এর একটিও থাকবে না। এটা যখন থাকবে তো মানুষ ‘মানুষ’ থাকবে। আর এ তিন মোহ থাকলে তার দিলে আল্লাহপাকের জায়গা হবে না। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে বোঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন! *

---

* ১৭/১২/১৪ ঈ. তারিখে নারায়ণগঞ্জ হাজীপাড়া মাদরাসার বার্ষিক ইসলাহী মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান

মানুষের যোগ্যতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.
اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. [62]

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য

কুরআনে কারীম থেকে একটি আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করা হল। এতে আল্লাহ পাক মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং মানুষ আল্লাহ পাকের কাছে সর্বাধিক প্রিয় হওয়া ও আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. [63]

আমি আমানতকে সপ্ত আকাশ, ভূমি ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম।

আমানত কী?

আমানত কী? আমানত হল **الاستعْدادُ لِقَبُولِ الحَقِ** সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা– যার প্রথম ধাপ হল ঈমান। এরপর সত্য বা ন্যায় বলতে যতকিছু আছে সবই আমানতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতাকে কুরআনের ভাষায় আমানত বলা হয়েছে। যার বাস্তব দিকই হল কুরআনে কারীম। আল্লাহপাক বলেন, এটা আমি আসমানের কাছে পেশ করেছি, আসমান তা গ্রহণ করেনি; যমীনের কাছে পেশ করেছি, যমীনও তা গ্রহণ করেনি; পাহাড়ের কাছে পেশ করেছি, পাহাড়ও গ্রহণ করেনি। এ মাখলুকগুলো দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য হল আল্লাহপাকের যত বড় বড় মাখলুক রয়েছে সবগুলোর কাছে এ আমানত পেশ করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় মাখলুক

---

৬৩. সূরা আহযাব : ৭২
৬৪. সূরা আহযাব : ৭২

আল্লাহপাকের যত মাখলুক আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় মাখলুক হল আরশ। তারপর সবচেয়ে বড় হল আসমান। একেকটি আসমান কত বড়! আর একেক আসমান অপেক্ষা আরেক আসমান, নীচের আসমান অপেক্ষা উপরের আসমান আরো বড়। দ্বিতীয় আসমানের অপেক্ষা তৃতীয় আসমান আরো অনেক বড়। এভাবে সাত আসমান।

আসমানের বিশালতা ও পুরুত্ব

একেকটা আসমান কত বড়? প্রথম আসমানটা গোলাকার। এর ভিতরে আমরা যত কিছু দেখি সবটাই হল দুনিয়া তথা পৃথিবী। পৃথিবী একটি গ্রহ। এরকম আরো অনেক গ্রহ ও উপগ্রহ আছে। সবগুলো প্রথম আসমানের নীচ থেকে ভূমির মধ্যকার বিরাট খালি জায়গার মধ্যে অবস্থিত। এ বিশাল খালি জায়গাটিকে বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। এই মহাশূন্যের মধ্যেই সবগুলো গ্রহ আছে। গ্রহের আবার উপগ্রহ রয়েছে। এরপর আবার গ্যালাক্সি রয়েছে, তারকারাজি রয়েছে। এই সব কিছু যা আমরা দেখছি বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ধরা পড়ছে সবগুলো প্রথম আসমানের এই ভিতরের খালি জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। যেমন সূর্য প্রথম আসমানের খালি জায়গার মধ্যে, চন্দ্রও এখানেই। এই খালি জায়গাটা কত বিশাল? আমাদের এই পৃথিবীর চেয়েও তের লক্ষ গুণ বড় হল সূর্য। এত বড় সূর্যটাও প্রথম আসমানের নিচে এই মহাশূন্যের মধ্যেই। কিন্তু আমরা মহাশূন্যটাকে কতটুকু দেখি এবং সূর্যটাকে কেমন দেখি? সূর্যটাকে আমরা একটি থালার মত দেখি। আর পুরোটাই তো খালি। আর এই পৃথিবীটা ওই মহাশূন্যের মধ্যে কলমের একটি ফোঁটার মত। যেখানে পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় হলো সূর্য। আর সূর্যটা যদি হয় থালার মত। সে অনুপাতে পৃথিবীটা কত বড় হতে পারে। এত বড় বিশালতা! আর এ সবগুলো হলো প্রথম আসমানে। তাহলে বুঝতে পেরেছেন প্রথম আসমানটা কত বড়! দুনিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব চাইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তু হলো আলো। আর এই আলোর গতি হল সবচেয়ে দ্রুতগামী। আওয়াজের চাইতে আলোর গতি অনেক বেশি। এই জন্য দেখবেন, বিদ্যুত লাইনে কোনো গোলযোগ দেখা দিলে আওয়াজ হয়ে লাইন চলে যায়। কিন্তু এই

আওয়াজের আগেই বিদ্যুত চলে গেছে। আগে বিদ্যুৎ চলে যায় তার পর আওয়াজ হয়। তো আলো হলো সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তু। এই আলোর চেয়েও যদি কোনো দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তু আবিষ্কৃত হয় সেটারও পাঁচশত বৎসর অতিক্রম করার দূরত্বে প্রথম আসমান অবস্থিত। এ দ্রুতগতির বস্তুটি আসমান পর্যন্ত পৌঁছতে পাঁচশত বছর লাগবে। এই জন্য যেই সমস্ত বিজ্ঞানীরা কুরআন-সুন্নাহ বিশ্বাস করে না, আসমানী গ্রন্থ বিশ্বাস করে না, শুধু যুক্তি আর বস্তুবাদে বিশ্বাসী; তারা আসমান আছে বলে স্বীকার করে না। তারা আসমান বলতে কোনো কিছু মানে না। তাদের যুক্তি হলো যেটা দেখি না বা আমাদের যন্ত্রে যেটা ধরা পড়ে না সে জিনিসের অস্তিত্ব কীভাবে স্বীকার করব? বিজ্ঞানীরা চন্দ্র-সূর্যসহ অনেক গ্রহ-উপগ্রহের আবিষ্কার করেছে। এও তারা মনে করে যে, আরো অনেক কিছু এখনও আবিষ্কার করার বাকী আছে। যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে তা কিঞ্চিত মাত্র। আসমান তারা এখনও আবিষ্কার করতে পারে নাই। এই জন্য তাকে স্বীকারও করে না। তাদের স্বীকার করা আর না করার দ্বারা কিছু আসে আর যায় না।

এখন কথা হল এই প্রথম আসমানটা কতটুকু মোটা আর পুরু। আমাদের এই মসজিদের ছাদ চার ইঞ্চি বা পাঁচ ইঞ্চি মোটা করে বানানো হয়েছে। আমাদের মাদরাসার ছাদ ছয় বা সাত ইঞ্চি হবে। সাধারণত এরকমই বানানো হয়। প্রথম আসমানটা এত পুরু যে, এই পুরুত্ব অতিক্রম করতে আবার পাঁচশত বৎসর সময় লাগবে। এবার বুঝুন আসমানের ছাদ কত পুরু আর কত মোটা। পাঁচশত বৎসরের রাস্তা অতিক্রম করলে দ্বিতীয় আসমান। দ্বিতীয় আসমানের পরও একটা মহাশূন্য। এরপর তৃতীয় আসমান। আবার ওই আসমানের পুরুত্ব ও গভীরতাও প্রথমটির সমান। এরপর আবার খালি জায়গা বা মহাশূন্য। সেগুলোরও এরকম পাঁচশত বছরের দূরত্ব রয়েছে। এইভাবে সাত আসমান।

এবার অনুমান করুন, আসমান আল্লাহপাকের কত বিরাট মাখলুক! আল্লাহপাক এই বিশাল আসমানের কাছে আমানত পেশ করেছেন।

আর জমিন তো আমরা মোটামুটি বুঝি। এটাকে পৃথিবীও বলা হয়। পৃথিবী একটা মধ্যম ধরনের গ্রহ। পৃথিবীর চাইতে আরো অনেক বড় গ্রহ আছে। আর সূর্যের চাইতে পৃথিবীটা তের লক্ষ গুণ ছোট।

যাই হোক, এই বিশাল মাখলুক তথা সাত আসমান, সাত জমিন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে আমানত পেশ করা হয়েছিল। এগুলো তা গ্রহণ করেনি। জমিনের কাছে পেশ করেছেন। জমিনও গ্রহণ করেনি। পাহাড় খুব বড় মাখলুক। আমরা তো পাহাড় তেমন একটা দেখি না। কুমিল্লায় লালমাই নামে যে পাহাড় সেটাকে পাহাড় নাই দেশের পাহাড় বলা চলে। এগুলো পাহাড় নয়। এগুলোকে টিলা বলা হয়। আল্লাহপাক এসব বিশাল বিশাল মাখলুকের সামনে পেশ করেছেন এ কুরআনকে, এ দীনকে। এগুলোকেই আমানত বলা হয়েছে। আর আমানত সম্পর্কে তো বলা হয়েছে যে, اَلْإِسْتِعْدَادُ لِقَبُولِ الْحَق সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা। সেসব মাখলুক এ আমানত গ্রহণ করেনি।

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ .[64]

আসমানও আমানত গ্রহণ করেনি, জমিনও গ্রহণ করেনি, পাহাড়ও গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করল কে? ক্ষুদ্রকায়ার অধিকারী মানুষ নামের মাখলুক সেটি গ্রহণ করেছে। কোথায় গ্রহণ করেছে? আলমে আরওয়াহ বা রূহজগতে। সেখানে মানুষ এ আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। সেখানে তো তার দেহ ছিল না। ছিল কেবল রূহ। রূহ তো দেখা যায় না। এই দেহহীন রূহই সেটা গ্রহণ করেছে।

যে কারণে সবকিছু মানুষের সেবক

আর এ আমানত গ্রহণ করাই হল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল রহস্য। আর এ কারণেই পৃথিবীর সবকিছুকে মানুষের গোলাম বা খাদেম বানানো হয়েছে। এ মর্যাদা মানুষকে সবগুলোর খেদমত ও সেবা পাওয়ার হকদার বানিয়েছে। দোস্ত! খেয়াল করুন, আমাদের দ্বারা সূর্যের কোনো উপকার হয় না, বরং সূর্যের দ্বারা আমাদের উপকার হয়। গতকাল সূর্য ছিল না তো ঠাণ্ডায় কেমন লেগেছে। আজ সূর্য আছে তো

৬২. সূরা আহযাব : ৭২

কেমন গরম লাগছে। গতকাল সূর্য ছিল না তো ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজকদের মন বিষন্ন ছিল। আজ সূর্য উঠেছে তো সবাই খুশি। তো সূর্য মানুষের উপকার দেয় কিন্তু মানুষ সূর্যের কোনো উপকার দেয় না। চাঁদ মানুষের উপকার করে, মানুষ চাঁদের কোনো উপকার করে না। জমিন মানুষের উপকার করে, মানুষ জমিনের কোনো উপকার করে না। পাহাড়-পর্বত মানুষের উপকার করে, মানুষ তাদের কোনো উপকার করে না। পাহাড় কী উপকার করে? পাহাড় না থাকলে জমিন সারাক্ষণ নড়াচড়া করবে। পাহাড় সৃষ্টির মাধ্যমে জমিনের ভারসাম্যতা রক্ষা করা হয়েছে।

আমানত গ্রহণ করেও জালেম ও জাহেল!

এবার আল্লাহপাক বলেন– إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا মানুষ নামক যে মাখলুক এ আমানত গ্রহণ করল সে বড় জালেম ও জাহেল।

আচ্ছা বলুন তো, আমানত গ্রহণ করে নেয়াটা ভালো হয়েছে, নাকি মন্দ হয়েছে? সকলে বলবেন ভালো হয়েছে। আল্লাহপাকের কাছেও এটা ভালো হওয়ারই কথা। খুবই ভালো হওয়ার কথা। এত বড় আমানত কেউ গ্রহণ করল না, মানুষ গ্রহণ করল। এত ভালো কাজের কারণে প্রশংসামূলক শব্দ আসা উচিৎ ছিল। সেটা না এসে জালেম ও জাহেল দু'টি খেতাব দেয়া হয়েছে। যা শুনতে বদনাম শোনা যায়। কেননা জাহেল অর্থ হল মূর্খ আর জালেম অর্থ অত্যাচারী। দোস্ত! শুনতে এমন শোনা গেলেও আদতে এর অর্থ খারাপ নয়। যে এই হাকীকত বোঝে যে, আল্লাহ মানুষকে কেন বানিয়েছেন এবং আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে কী চাচ্ছেন সে এ শব্দ দ্বারা অনেক মজা পাবে। কারণ, 'মানুষ বড় জালেম' এমন কথা মানুষের বেলায় বলা আল্লাহপাকের জন্যই সাজে। আর এটা দিয়ে আল্লাহ পাক ঐ জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষের মাঝে ঐ যোগ্যতা রয়েছে যে যোগ্যতাটা এ আমানত গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন।

মানুষের যোগ্যতা

এ আমানতটা গ্রহণ করে বাস্তবে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটা জিনিস হল ইনসাফ, অপরটি হল ইলম।

বাংলায় যাকে জ্ঞান বলা হয়। মানুষের মাঝে ইনসাফের যোগ্যতা আছে। এ জন্য তাকে জালেম বলা হয়েছে। একটি মানুষের মাঝে জ্ঞানের বিষয় রয়েছে। এজন্য তাকে জাহেল বলা হয়েছে। একটা গাছকে কি কেউ জাহেল বা মূর্খ বলবে? বলবে না। একটা গরুকে কি কেউ মূর্খ বলবে? বলবে না। কারণ, জাহেল হওয়া বা জালেম হওয়া–এ গুণগুলোর বিপরীত গুণ রয়েছে। আমাদের কিতাবের ভাষায় এটাকে تقابل عدم ملكة বলা হয়।

উদাহরণত কেউ যদি একটা গাছের সাথে গিয়ে ধাক্কা খায়, তাহলে লোকজন কাকে দূষী বলবে? গাছকে, নাকি মানুষকে? মানুষকে। গাছটাকে অন্ধ বলবে নাকি, মানুষটাকে? মানুষটাকে। কেউ গাছকে বলবে না যে, তোর কি চোখ নেই তুই মানুষটির সাথে কেন ধাক্কা খেলি? বরং মানুষটিকে বলবে তুই কি অন্ধ হয়ে গেছিস যে, গাছের সাথে ধাক্কা খেলি? কারণ অন্ধতো ঐ ব্যক্তিকে বলবে যার চোখ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক, দেখে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সে দেখে নেয়নি, অন্ধের মত কাজ করেছে। এ জন্য তাকে অন্ধ বলা হচ্ছে। গাছকে অন্ধ বলা হবে না। عدم البصر من شأنه ان يكون بصيرا এটা হল অন্ধের সংজ্ঞা। ঠিক অনুরূপভাবে এখানে মানুষকে জালেম বলা হয়েছে। গাছ থেকে নারকেল পড়ে কারো মাথা ফেটে গেছে। কেউ নারকেলকে জালেম বলবে না। কিন্তু একজন মানুষ যদি কারো মাথা ফাটিয়ে দেয় তাহলে সকলে তাকে জালেম বলবে। কেন? জুলুমের বিপরীত বস্তু হল ইনসাফ। ইনসাফের যোগ্যতা তার মাঝে আছে। কিন্তু সে ইনসাফের যোগ্যতাটিকে কাজে না লাগিয়ে জুলুম করেছে। মানুষকে জালেম বলে আল্লাহপাক এটা বুঝিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যেই মূলতঃ ইনসাফের যোগ্যতা রয়েছে। মানুষকে জাহেল বলেও এ কথা বুঝিয়েছেন যে, ইলমের যোগ্যতাও মানুষের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষ সম্পর্কে বলেছেন اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا মানুষ জালেম ও জাহেল। যে ব্যক্তি এ কথাটির নিগূঢ় রহস্য জানে তার কাছে বিষয়টি খুবই আনন্দের। এক প্রিয়তম আরেক প্রিয়তমকে অনেক সময় দুষ্ট বলে ফেলে। চোরও বলে ফেলে। হাফেয শিরাযী রহ. বলেন–

بدم گفتی و خرسندم عفاك الله نكو گفتی
جواب تلخ می زیبد لب لعل وشكر خارا

তুমি আমাকে মন্দ বলায় আমি রাগ করিনি বরং খুশি হয়েছি। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। কেননা প্রিয়ের সুমিষ্ট মুখের তিক্ত জবাবেও মিষ্টতা অনুভূত হয়।

আমার বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক মানুষকে অনেক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। লোহা ও ইস্পাতের মধ্যে অনেক যোগ্যতা আছে। যদি লোহা বা ইস্পাতকে ধার দেয়া হয় বা কোনোভাবে কাজে লাগানো হয় তাহলে অনেক দামী বস্তু হতে পারে। অন্যথায় মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো কাজে আসবে না। বরং ক্ষতিকর বস্তুতে পরিণত হবে। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহপাক অনেক যোগ্যতা দিয়েছেন। অন্য কারো ভিতরে এমন যোগ্যতা দেননি। ঐ যোগ্যতার কারণেই মানুষকে আল্লাহপাক দীন-শরীয়তের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন। আর সমস্ত মাখলুককে মানুষের গোলাম বানিয়েছেন। এজন্য দোস্ত সকলে নিজের অবস্থার উপর লক্ষ রাখি। আর এ যোগ্যতাটা কিন্তু দেহের নয়, এ যোগ্যতাটা আমার রুহের যোগ্যতা, আমার দিলের যোগ্যতা, আমার অন্তরের যোগ্যতা। এ জন্য আলমে আরওয়াহতে আল্লাহপাক আমাদের রুহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–الستُ بربكم। আমি আমি কি তোমাদের রব নই? গ্রামে একটি প্রবাদ আছে ঢেকিকে জিজ্ঞেস করে ধান ভানা যায় না। আমাদের দেহ হল ঢেঁকি সমতুল্য। আল্লাহ তাআলা দেহকে জিজ্ঞেস করেননি। জিজ্ঞেস করেছেন রুহকে।

روز اول خود فضولي كردۀ
واں فضولي از جهولی كردۀ

প্রথম দিন তুমিই সীমা লঙ্ঘন করেছ,
আর তা অজ্ঞতার দরুনই করেছ।

খোলাসা কথা হল, মানুষের মাঝে অনেক বড় যোগ্যতা রয়েছে। এ যোগ্যতা দিয়েই মানুষ আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করতে পারবে। মানুষের ভিতরের শক্তিটা আল্লাহপাকের শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং সেটা তার হাত চোখ কান ও মুখ দ্বারা প্রকাশ পেতে পারে। হাদীস

لَاشَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.
اَمَّا بَعْدُ :
عن ابي ذر جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو عَلَيَّ هذِهِ الْاٰيَةِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ أَخَذُوْا بِهَا لَكَفَتْهُمْ (مسند أحمد : 21551)
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

হযরত আবু যর রাযি. বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সামনে **وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। তারপর বলেন, মানুষের সবাই যদি এ আয়াত গ্রহণ করে নেয় তবে তা তাদের সবার জন্যই যথেষ্ট হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-২১৫৫১)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আয়াতটি আবু যর রাযি. এর সামনে তিলাওয়াত করেছেন তার সারমর্ম হল,

'যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সমস্যা উত্তরণের পথ করে দেবেন। আর যে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করবে আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট।

তাকওয়ার অর্থ

তাকওয়া অর্থ হচ্ছে, দীনের পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা। দীনে অপূর্ণতা আসে গুনাহের কারণে। এজন্য বলা হয়, তাকওয়া অর্থ হচ্ছে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আর তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর উপর ভরসা করা। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল এ দু'টি বিষয় অর্জন করতে পারলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যা সমাধান করে দেবেন এবং আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

তাকওয়ার ফায়দা

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রাযি. এর এক ছেলে ছিল। নাম সালেম। দুশমনরা একবার তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তখন দুশমন বলতে কাফেররাই ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমার ছেলেকে কাফেররা

শরীফে এসেছে– বান্দা নফল আমল করতে করতে এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, আল্লাহ তার হাত হয়ে যান। সে ধরে তো আল্লাহর হাত দিয়ে ধরে, বলে তো আল্লাহর যবানে বলে। দেখে তো আল্লাহর চোখ দিয়ে দেখে। শোনে তো আল্লাহর কান দিয়ে শোনে। এবার চিন্তা করুন আল্লাহ পাক আমাদের মাঝে কেমন যোগ্যতা রেখেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন। *

.....

* ২০০৭ ঈ. সালে ফুলছোঁয়া মাহফিলে জুমাপূর্ব বয়ান।

তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের পাথেয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ

অপরহণ করে নিয়ে গেছে। তার মা অস্থির হয়ে শুধু ছেলের খোঁজ করছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অধিক পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পড়তে বললেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বললেন। হাদীসে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পড়া ও তাকওয়া অবলম্বন করা উভয়টিরই নির্দেশ দিয়েছেন এমনও হতে পারে। তারা সে অনুযায়ী বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পড়তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ভেবে দেখলেন, নিজেদের কোন গুনাহের কারণে দীনে অপূর্ণতা আসলো কি না? তেমন কিছু পেলেন না। তবুও আরও সতর্ক হলেন যেন কোনো গুনাহ না হয়।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সালেম দু'টি উট নিয়ে হাজির হলো। সে জানাল, দুশমনরা তাকে বন্দি করে রেখেছিল। এক সময় সকলের অসতর্কতার সুযোগে নিজের বাঁধন খুলে বেরিয়ে পড়লো। সামনে দুটো উট পেল। একটিতে সওয়ার হয়ে অপরটির রশি ধরে টেনে নিয়ে আসলো।

হযরত আউফ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা জানালেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো। তারা তাকওয়া অবলম্বন করার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছেলের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে দুইটা উটও রিযিক হিসেবে দিয়ে দিলেন।

কাফেরের সম্পদ কখন গনীমত হয়

প্রসঙ্গত একটি বিষয় আলোচনা করা জরুরী মনে করছি। কারো মনে সালেম রাযি. এর কাফেরদের উট নিয়ে আসার ব্যাপারটি একটু অন্য রকম মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, কাফের দুই প্রকার। যথা–

এক. এমন কাফের যাদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছে অথবা তাদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সন্ধিচুক্তি হয়নি। তাদেরকে হরবী বলা হয়। যেমন, ইসরাঈল। ইসরাঈলীরা যখন তখন মুসলমানদের উপর হামলা করে। মুসলমানদের বন্দি করে জেলখানায় পুরে রাখে। মুসলমানদের সম্পদ লুট করে। তারা যেমনিভাবে মুসলমানদের ধন-

সম্পদ নিয়ে মালিক বনে যায় তেমনিভাবে মুসলমানরা যদি তাদের সম্পদ নিয়ে আসে তবে তারাও এর মালিক হয়ে যাবে। হযরত সালেম রাযি. হরবী কাফেরদের উট নিয়ে এসেছিলেন। এটা তার জন্য গনীমতের মাল ও হালাল সম্পদ ছিল।

দুই. এমন কাফের যাদের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি হয়েছে। তাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হবে না।

তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের যে ফায়দার কথা বলা হলো তা কুরআনের আয়াত; হাদীস নয়। এটি জাল বা দুর্বল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এর বর্ণনাকারীর অবস্থা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

এর উপর আমল করবে কে? ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও নাস্তিকরা কি এর উপর আমল করতে আসবে? এর উপর আমল করবে তো মুসলমানরা- যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, যাদের কাছে ওহীর ইলম আছে। যাদের ওহীর ইলম নেই তারা তো আমাদের অনেক কিছু বোঝেই না। বরকত কী, তাওয়াক্কুল কী—এগুলো তো ওহীর ইলম ছাড়া বুঝেই আসে না।

তাওয়াক্কুল কী

হযরত থানভী (রহ.)-এর সময় একবার আদমশুমারী হলো। তাঁর কাছে একজন ইংরেজ অফিসার এলো। সে থানভী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করল, আপনার পেশা কী? তিনি উত্তর দিলেন, তাওয়াক্কুল।

ইংরেজ অফিসার বলল, তাওয়াক্কুল আবার কী?

থানভী (রহ.) বললেন, তোমাকে কীভাবে বোঝাব? আচ্ছা একটু বসো।

লোকটি বসে রইল। থানভী (রহ.) নিজের কাজে লেগে গেলেন। কিছুক্ষণ পর থানভী (রহ.) এর কাছে এক লোক আসলো। কথাবার্তা শেষ করে লোকটি বলল, আপনাকে হাদিয়া দিতে মন চাচ্ছে, দয়া করে যদি গ্রহণ করতেন।

থানভী (রহ.) বললেন, ঠিক আছে দাও। এর কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক এলো। সেও হাদিয়া গ্রহণের আবেদন করল। থানভী

(রহ.) গ্রহণ করলেন। ইংরেজ এসব দেখে বলে উঠল, আমি বুঝেছি তাওয়াক্কুল কী জিনিস।

তাওয়াক্কুলের সাথে দীনের কাজে নিয়োজিত হতে হবে

আমরা মুসলমানরাই তো তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করব। আমাদের মাঝে যাদের পূর্ণ কুরআন শরীফ হেফজ করার তাওফীক হয়েছে বা আংশিক হেফজ করা হয়েছে, উস্তাদের সামনে বসে কুরআন শরীফের আদ্যোপান্ত তরজমা ও তাফসীর পড়ার সুযোগ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আয়াতের কী ব্যাখ্যা করেছেন তা হাদীস শরীফে পড়ার সুযোগ হয়েছে। মেশকাত পড়া হয়েছে, দাওরায়ে হাদীসও পড়া হয়ে গেছে– এখন শুধুমাত্র পরীক্ষা দেয়া বাকি- তারা এ সব নেয়ামতের শোকর আদায়ের জন্য ফারেগ হওয়ার পরে আবার এ কাজেই লেগে যাবে।

আমরা ছোটবেলায় মকতবে গিয়ে শুরুতেই এই হাদীস পড়েছি–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

'যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয় সেই সর্বোত্তম।' এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। এ কাজের জায়গা ও ক্ষেত্রের কোনো অভাব নেই। যেখানে মানুষ দীন-ধর্ম সম্বন্ধে জানে না, কুরআন পড়তে পারে না সেখানে গিয়ে এ কাজ করবে। মসজিদের অভাব নেই। মসজিদে সুযোগ না হলে খালি মাঠ আছে। গাছতলা আছে। গাছের নিচে বসে দীন শিখাব, কুরআন পড়াব। আমার বিশ্বাস, কেউ যদি তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলওয়ালা হৃদয় নিয়ে কোনো খোলা ময়দানে বা গাছের নীচে দীনি খেদমতের জন্য বসে পড়ে তাহলে ইনশাআল্লাহ! এ গাছতলা ও খালি ময়দান দশ বছরে জামিয়ায় পরিণত হবে। সাবধান! সাবধান! সাবধান! কখনও যেন এমন না হয়, মানুষ আমাদের কাছে দীন শিখতে এলো আর আমাদের নজর রইল তাদের পকেটের দিকে, বিত্তশালীদের সম্পদের প্রতি!

اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'আমার প্রতিদান তো দেবেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন।'

আমার জীবিকা নির্বাহ হবে কীভাবে? সংসার চলবে কীভাবে? বাবা-মাকে খরচ দিব কোত্থেকে? এসব চিন্তা যেন মাথায় না আসে। আমাদের অবলম্বন হলো, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুলের ফায়দা

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ تَعَالٰى حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

'যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করতে তাহলে তোমাদেরকে পাখির মতো রিযিক দেওয়া হতো। পাখি সকালে খালি পেটে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে পেট পূর্ণ করে।'

পাখি খাদ্য সঞ্চয় করে না। ছয় মাসের জন্য নয়, ছয় দিনের জন্যও নয়। এমনকি ছয় ঘণ্টার জন্যও নয়। আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর তাওয়াক্কুল

বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর খানকায় প্রতিদিন দশ হাজার লোকের মেহমানদারী করা হত। সানজারের বাদশাহ একদিন তাঁর দরবারে আসলেন। আগের যুগে ধনী-গরীব আমীর-ওমারা সবাই ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। আলেম-ওলামাদের নসীহত শুনত। সে অনুযায়ী চলত। তাই সমাজের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। সে হিসেবে বাদশাহও বড় পীরের খানকায় এলেন। খানকার অবস্থা তার মনে রেখাপাত করল। তিনি ফিরে গিয়ে চিঠি লিখলেন, আপনার খানকার এত ব্যয় দেখে তাতে সহয়তা করা আমি আমার দায়িত্ব মনে করছি। আপনি সম্মত হলে আমার রাজ্যের 'নীমেরোয' প্রদেশের যাবতীয় আয় আপনার খানকার জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে চাই।

আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) চিঠি পেয়ে তার অপর পিঠে সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন–

چوں چتر سنجری روخ بختم سیاه باد

درد لم بود هوس اگر ملك سنجرم
زانگه كه يا فتم خبر از ملك نيم شب
من ملك نيمر وزرا بيك جو نمى خرم

সানজারের বাদশাহের মুকুটে একটি কালো ব্যাজ ছিল। বড় পীর (রহ.) কবিতার মাধ্যমে উত্তর দিলেন, আমার অন্তরে যদি নীমেরোযের সামান্যতম লোভ থাকে তাহলে তোমার মুকুটের মতো আমার কপাল কালো হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

(কী কারণে ঐ প্রদেশের নাম 'নীমেরোয' রাখা হয়েছে তা জানা নেই। তবে এর শাব্দিক অর্থ হল, অর্ধ দিন বা দ্বিপ্রহর। এর বিপরীতে আল্লাহওয়ালাদের একটি শব্দ আছে নীমেশব। অর্থাৎ অর্ধ রাত। উদ্দেশ্য হচ্ছে শেষ রাত।) যখন থেকে আমি শেষ রাতের রাজত্বের সন্ধান পেয়েছি তখন থেকে নীমেরোযের রাজত্বের কোনো মূল্যই নেই আমার কাছে।

আমার শায়খ (রহ.) আমাকে যতগুলো চিঠি দিয়েছেন তার সবগুলোতে একথা লিখা ছিল–

امید ھے كه نيم شب كى دعوات صالحه ميں اس بنده كو فراموش نه كرے

'আশা রাখি, শেষ রাতের নেক দোয়ায় এই বান্দাকে ভুলবেন না।'

দাওয়াতের মেহনত চলছে তাওয়াক্কুলের উপর

এখনো টঙ্গী ইজতেমায় বিশেষ ওলামা ও বিদেশী মেহমানদের আপ্যায়ন করা হয়। যাদের সংখ্যা অনেক। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই এসব চলছে।

কওমী মাদরাসাগুলো তাওয়াক্কুলের জ্বলন্ত উপমা

আমাদের দীনি মাদরাসাগুলো যে প্রতিষ্ঠানের অনুসরণে পরিচালিত হয় সে দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি রাখা হয়েছে এর উপর। তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও শেষ রাতের নামায ও দোয়াই এ মাদরাসাগুলোর সম্বল। দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি যে তাকওয়া ও

তাকওয়াক্কুলের উপর তা এ পঙক্তিতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–

اس كے بانى كى وصيت ھے كه جب اس كے ليے
كوئى سرما يه بهروسه كاذرا هو جائے گا
پهر يه قنديل معلق اور توكل كا چراغ
يه سمجھ لينا كه بے نور وضياء هوجائے گا
ھے توكل پر بنا اس كى تو بس اس كا معين
اك اگر جائے گا، پيدا دوسرا هوجائے گا

'এ প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর ওসিয়ত হল, এ প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য যদি কোন প্রকারের পুঁজি ও সম্পদের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভরতা থাকে তাহলে স্মরণ রেখো, এ ঝুলন্ত আলোকবর্তিকা ও তাওয়াক্কুলের প্রদীপ আলোহীন ও নিস্প্রভ হয়ে পড়বে। এর ভিত্তি তো একমাত্র তাওয়াক্কুলের উপর। এর একজন সহযোগী যদি চলে যায় তবে তার স্থলে দ্বিতীয় কেউ চলে আসবে।'

চাঁদা করা হয় কেন

প্রশ্ন হতে পারে—তাহলে জনসাধারণের কাছে মসজিদ মাদরাসার সহযোগিতার জন্য যাওয়া হয় কেন? তাদের দাবী আছে বলেই যায়। মাদরাসা-মসজিদ দান করে যদি জান্নাতে যাওয়া যায় তাহলে সবাইকে নিয়ে যেতে হবে না? কেউ কেউ এতে বিরক্ত হলেও বেশির ভাগই এমন যে, তাদের কাছে না গেলে তারা অনুযোগ করে।

যারা মসজিদ মাদরাসায় দান করেন তারা দান করা বন্ধ করে দিলে মাদরাসা বন্ধ হবে না। আরও ভালো চলবে। মনে চাইলে কেউ বন্ধ করে দিতে পারেন। কীভাবে চলবে সে পথ তাদের জানা আছে। শেষ রাতের আহাজারী কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। এতে কেউ বাধা দিতে পারেনি, পারবে না। দারুল উলূম দেওবন্দের উপর কম বাধা আসেনি। তখন ব্রিটিশ সরকার ছিল। এরপর আরও কত সরকারের উত্থান-পতন হলো কিন্তু কেউ একে দমাতে পারেনি। প্রথম প্রথম কিছু অভাব, দরিদ্রতা ও সঙ্কট থাকেই। এখন তার অবস্থা দেখলে আশ্চর্য

হবেন। ইসলামের প্রথম যুগেও অভাব ও সঙ্কট ছিল। এর দ্বারা খাঁটি থেকে ভেজাল দূর করা হয়। কেমন পরীক্ষা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَزُلْزِلُوْا অর্থাৎ তাদেরকে ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছে। এসব দরিদ্র ও সঙ্কটাপন্নদের আল্লাহ তা'আলা সত্যায়ন করেছেন। বলেছেন,اُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ। اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তারাই সত্যপন্থী। তারাই সফল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى। আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার জন্য তাদের অন্তরকে বাছাই করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এসব আয়াত ও হাদীসের সঠিক বুঝ দান করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন। এ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ও তাখাস্সুস পড়ে যারা ফারেগ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকেও এ তাওফীক দান করেন। আমীন! *

.....

* তোহফায়ে ফুলছোঁয়া স্মারক থেকে নেয়া

ঈমানের স্বাদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ أَنْ يَّكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهٗ إِلاَّ لِلّٰهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ .

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

তিনটি গুণ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার মাঝে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অন্যসব কিছুর তুলনায় বেশি ভালোবাসা, ২. কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোাবাসা, ৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা।[৬৫]

হযরত মুয়ায (রা.)-কে নবীজির অন্তিম উপদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর একজন ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় সাহাবী হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থাভাজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। গভর্নর হিসেবে ইয়েমেন যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৬৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৫

ওয়াসাল্লামের সুন্নত। তিনি কাউকে বিদায় দেয়ার সময় বেশ কিছু দূর এগিয়ে দিতেন। আমরা সবাই এই সুন্নত পালন করব ইনশাআল্লাহ।

অনেকক্ষণ চলার পর পাহাড়ী পথ শুরু হল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান থেকে মদীনা ফিরবেন। হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে বললেন, মুআয! হয়ত আগামী বছর আমার দেখা পাবে না, তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এ কথা শুনে হযরত মুআযের যে কী অবস্থা হয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝবে না। সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে কেমন ভালোবাসতেন, তা বুঝতে হলে আরেকজন সাহাবী হতে হবে। আমাদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

নবীজির ইন্তেকালের কয়েকদিন পর একজন সাহাবী এক পথে হাঁটছিলেন। তিনি দেখলেন, বাগানে একজন সাহাবী কাজ করছেন। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রাব্বিহী। পথিক সাহাবী ভাবলেন, হয়ত এই সাহাবী নবীজির ইন্তেকালের সংবাদ পায়নি। তাকে ডেকে বললেন, নবীজি ইন্তেকাল করেছেন। এটা কি আপনি জানেন?

সাহাবী বললেন, কী বলছেন আপনি?

বলছি, আপনি কি নবীজির ইন্তেকালের খবর শুনেছেন?

না, শুনিনি তো। সত্যিই কি এমন হয়েছে?

হ্যাঁ, বাস্তবেই নবীজি ইন্তেকাল করেছেন।

একথা শোনা মাত্র আব্দুল্লাহ আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুললেন। হে আল্লাহ! আমার দুই চোখ দিয়ে নবীজির যিয়ারত করিয়েছেন। আপনি নবীজিকে নিয়ে গেছেন। যে চোখ দিয়ে আর নবীজিকে দেখতে পাবো না সে চোখের আমার দরকার নেই। আমার চোখও নিয়ে যান। সাথে সাথে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। এমনভাবে ভালোবাসতেন তাঁরা নবীজিকে।

নবীজির ঐ কথা শুনে হযরত মুআয রাযি. ডুকরে কেঁদে ওঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাযি. থেকে নিজের অশ্রু লুকাতে মদীনা শরীফের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন–

اِنَّ اَولَى النَّاسِ بِى يَوْمَ القِيَامَةِ اَلْمُتَّقُوْنَ مَنْ كانُوا وَحَيْثُ كَانُوا ..

অর্থাৎ মুআয, তুমি যদিও দূরে চলে যাচ্ছ, হয়ত ইহজীবনে তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে না, তবে জেনে রেখ! 'নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে মুত্তাকীগণ। মুত্তাকী যে-ই হোক এবং যেখানের অধিবাসী-ই হোক।'

রাসূলের নিকটবর্তী ও প্রিয় হওয়ার উপায় হচ্ছে তাকওয়া। যার তাকওয়া যত বেশি সে তত বেশি নিকটবর্তী হবে। সে যেই হোক, দুনিয়ার যেখানেই থাকুক। একজন যদি মদিনায় থেকেও তাকওয়া অবলম্বন না করে, অন্যজন যদি বাংলাদেশে থেকে তাকওয়া করে, নিঃসন্দেহে এই বাংলাদেশী কেয়ামতের দিন রাসূলের বেশি নিকটবর্তী হবে।

তাকওয়ার প্রথম স্তর

তাকওয়ার অনেক স্তর আছে। এক নম্বর স্তর হচ্ছে,

اِمْتِثَالُ الاَوَامر وَاجْتِنابُ الْمَنْهِيَات

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যিনি এভাবে চলবেন নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ তা'আলার ওলী।

দীনি আলোচনার ফায়দা

হযরত মু'আয রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত প্রিয় সাহাবী ছিলেন। কত পূর্ণ ছিল তাঁর ঈমান। যেন ঈমান উপচে পড়বে। এই মুআয রাযি. তাঁর শিষ্যদেরকে বলতেন–

اِجْلِسْ بِنَا نُؤمِنْ سَاعَةً

'আমাদের সাথে বসো; কিছুক্ষণের জন্য ঈমান আনি।'

তিনি এত পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনার অর্থ কী? এর অর্থ হল, দীন ও ঈমানের আলোচনা করা। এর দ্বারা ঈমান তাজা হয়, ঈমানের নবায়ন হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ

'তোমাদের ঈমান নবায়ন করতে থাকো।'

মোটকথা, দীনী আলোচনার গুরুত্ব ও ফায়দা অনেক। তাই এগুলোতে অংশগ্রহণ করা উচিত। মসজিদে মসজিদে প্রতি দিন তা'লীম হয়। এগুলোতে শরীক হওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলে, এসব তো আমি জানি। ভালো করে মনে রাখবেন, যে বলল, আমি জানি, সেই ধ্বংস হল। আমার শায়খ, নানুপুরের আ'লা হযরত; আল্লামা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-কে একজন বলেছিল, অমুকের ভিতর অনেক ওয়াজ আছে। হুজুর বললেন, ওবা, সে ওয়াজের ভিতরে আছেনি?'

নিজের ভিতর ওয়াজ ভরা সহজ। কিন্তু নিজে ওয়াজের ভিতর প্রবেশ করা অনেক কঠিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বিশেষ করে আমাকে আমার ওয়াজের ভিতরে আসার তাওফীক দান করুন।

শুরুতে একটি হাদীস তেলাওয়াত করা হয়েছিল, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার মাঝে তিনটি গুণ আছে সেই ঈমানের স্বাদ পাবে।

ঈমানের স্বাদ কী

ঈমানের স্বাদ হল–

اِسْتِلْذَاذُ الطَّاعَاتِ عَلَى الْمَعْصِيَاتِ وَ تَجَرُّعُ الْمَرَارَاتِ فِى الْبَلِيَّات وَالرِّضَا بِالْقَضَا فِى جَمِيْعِ الْحَالَاتِ

অর্থাৎ, ঈমানের স্বাদ তিন জিনিসের নাম–

এক. গোনাহের তুলনায় ইবাদতে স্বাদ অনুভব করা।

দুই. বিপদাপদের তিতা ঢোক গিলে নেয়া। অর্থাৎ বালা-মুসিবতে কষ্ট সহ্য করা।

তিন. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

এক. ইবাদতের স্বাদ

গোনাহে স্বাদ আছে, মজা আছে; যদিও তা সাময়িক। মজা না লাগলে কেউ কোনো গোনাহ করত না। হাদীসে এসেছে, **حُجِبَتْ النارُ بِالشَّهوات** জাহান্নামকে মজার বিষয় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। মজার লোভে কেউ এগুলোতে লিপ্ত হলে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে। ঈমানের স্বাদ হল, ইবাদতে স্বাদ লাগা, গোনাহ বিস্বাদ হওয়া। গোনাহগার গোনাহে যে স্বাদ পায়, একজন মুমিন ইবাদতে এর চেয়ে শত কোটি গুণ বেশি স্বাদ পায়।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

اَهْلُ اللَّيْلِ فِى لَيْلِهِمْ اَ لَذُّ مِنْ اَهْلِ اللَّهْوِ فِى لَهْوِهِمْ

অর্থাৎ, পাপাচারীরা রাতে ক্লাবে নর্তন-কুর্দনে যে মজা পায় আল্লাহ ওয়ালাগণ শেষ রাতে তাহাজ্জুদ, যিকির ও তেলাওয়াতে এর চেয়ে শত কোটি গুণ বেশি মজা পান।

গোনাহ বর্জনেও মজা রয়েছে

গোনাহ ছেড়েও যে মজা পাওয়া যায় এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বলি। এক দেশে ঘুষের লেনদেন খুব বেড়ে গেল। মন্ত্রী-আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই ঘুষে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। যে জাতি ঘুষে জড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে দেন। তারা সব সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। অন্যায় আক্রমণের শঙ্কায় থাকে। বাংলাদেশের অবস্থাও এখন এমন। এটা তাঁর কুদরতী নেজাম। বিভিন্ন পাপের কারণে তিনি বিভিন্ন শাস্তি চাপিয়ে দেন।

সে দেশের রাষ্ট্রপতি ভাবলেন, ঘুষখোরদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত। কিন্তু কাকে দিয়ে চিহ্নিত করবেন? সম্পদের লোভ এমন জিনিস, এর লোভে সরষেতেও ভূত আসে। একমাত্র তাকওয়াই পারে মানুষকে এ লোভের টোপ থেকে পবিত্র রাখতে। রাষ্ট্রপতি চিহ্নিত কিছু মুদ্রা দিয়ে নিজের আস্থাভাজন কয়েকজনকে সেবাপ্রার্থী বেশে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠালেন। বলে দিলেন, কেউ ঘুষ চাইলে চিহ্নিত মুদ্রাগুলো দিতে। সব দপ্তরেই ঘুষ চাইল। তারাও দু'হাত উজাড় করে চিহ্নিত মুদ্রাগুলো দিল। চকচকে নোট পেয়ে তারা দারুণ আনন্দ পেল। রাষ্ট্রপতি মোবাইলকোর্ট বসালেন। আমলারা যখন অফিস থেকে ফিরছে, তাদের গাড়ি থামিয়ে চেক করতে লাগলে। যার কাছে নোট পাওয়া গেল, তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হল। অবস্থা টের পেয়ে তাদের আনন্দ মুহূর্তে পেরেশানীতে পরিণত হল। এখন সবাই চিহ্নিত মুদ্রাগুলো কোন ফাঁক-ফোকরে ফেলে দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। যারা কোন ফাঁকে গাড়ি থেকে চিহ্নিত মুদ্রা ফেলে পবিত্র হতে পারল তারা এত আনন্দ ও স্বাদ পেল যে, এর সামনে ঘুষ নেওয়ার আনন্দ কিছুই না। এমনিভাবে গোনাহ বর্জন করা ও গোনাহ থেকে তওবা করার মাঝে যে স্বাদ রয়েছে, গোনাহ করার স্বাদ এর সামনে কিছুই না।

দুই. ঈমানের স্বাদ পেতে হলে বিপদাপদে ধৈর্য ধরতে হবে

ঈমানের স্বাদের দ্বিতীয় বিষয় হল বিপদাপদের তিতা ঢোক গিলে নেয়া। অর্থাৎ বালা-মুসিবতে কষ্ট সহ্য করা।

অনেকে হয়ত চিরতা খেয়েছেন, আমিও খেয়েছি। খুব তিতা! তারপরেও মানুষ খায়। একটু কষ্ট করে এটি খেয়ে অনেক কষ্টের রোগ ভালো হবে, এই চিন্তা করে তিতা চিরতাকে মহব্বত করে গলাধঃকরণ করে।

বিপদাপদের কষ্টকে কীভাবে মানুষ আপন করে নেয়, আমার চোখের সামনের একটি ঘটনা বলি, কিছু দিন আগে ইন্তেকাল করলেন আমার মামা, উজানীর পীর সাহেব; হযরত মাওলানা মুবারক করীম সাহেব (রহ.)। তাঁর আব্বা, আমার নানা, মাওলানা শামসুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে মেট্রিক পাস করা এক লোক থাকত। আমি তখন ছোট। বয়স ১০/১১ হবে। একদিন কোন কারণে নানা রাগ হয়ে হাতের লাঠি দিয়ে তাকে একটি আঘাত করলেন। সে ঠায় বসে রইল। নানা যাওয়ার পর আমি তাকে বললাম, ফজর আলী ভাই, আপনাকে নানা গাল-মন্দ করলেন, লাঠি দিয়ে মারলেন। আপনি চুপচাপ বসে রইলেন?

সে বলল, কী যে বলেন আপনি! আহা! হুযুর যদি আমাকে আরো মারতেন! সে বুঝতে পেরেছিল, তার ভালোর জন্য হুযুর তাকে মেরেছেন। তাই পিটুনি খেয়েও সে খুশি।

এমনিভাবে বান্দা যখন বিপথে চলে আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে সতর্ক করেন। সে হয়ত কোন পাপ কাজের পরিকল্পনা করছে, নাজায়েয কাজে হাত দিচ্ছে, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কোন বিপদে ফেলেন। ফলে সে পাপকাজ থেকে পিছু হটে। এজন্য বিপদাপদে শেকওয়া-শেকায়েত না করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিতা লাগলেও নিজের জন্য উপকারী ভেবে মহব্বত করা উচিত। কবি বলেন–

بهار من خزاں صورت گل من شکل خار آمد
چوں از یارِ من آمد همی دانم بهار آمد

আমার বসন্ত দেখতে হেমন্তের মত, আমার ফুল দেখতে কাঁটার মত। হেমন্তই আমার বসন্ত। কারণ, এ যে আমার প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে উপহার।

তিন. সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

আল্লাহ পাক আমাকে সুখে, দুঃখে যে হালতেই তিনি রাখেন তাতেই আমি রাজি আলহামদুলিল্লাহ, এ মনোভাব অন্তরে পোষণ করা। হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব পীরজী হুজুরের নাম অনেকে শুনেছেন। ঢাকা ও তার আশপাশে দীন ও দীনি শিক্ষার প্রচার-প্রসারের তাঁর অবদান অনেক। পীরজী হুজুর একটি শের খুব বেশি বলতেন–

زنده کنی عطاء تو ... وربکشی فداے تو
دل شده مبتلاے تو ... هر چه کنی رضاے تو

হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে জীবিত রাখেন, তবে তো আপনার অনুগ্রহ ও দান। যদি মৃত্যু দেন, তাতেও সমস্যা নেই; আমি তো আগে থেকেই আপনার কুরবান। আমার দিল আপনার প্রতি আসক্ত; আপনি যা করেন তাতেই আমি রাজি।

মোটকথা, গোনাহের তুলনায় ইবাদতে স্বাদ পাওয়া, বিপদাপদের তিতা ঢোক গিলে নেওয়া এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, এই তিন বিষয় হচ্ছে ঈমানের স্বাদ।

ঈমানের স্বাদ পেতে হলে

ঈমানের এই স্বাদ সেই পাবে, যার মাঝে তিনটি গুণ আছে।

প্রথম গুণ হল–

اَن يَّكونَ اللهُ ورَسولُه اَحَبَّ اليه مِمَّا سِوَاهُما

অর্থাৎ. দুনিয়ার সব কিছু- বাবা, মা, ছেলে, স্বামী-স্ত্রী সবার চেয়ে আল্লাহ ও রাসূলকে বেশি ভালোবাসা। আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সব ভালোবাসা ও প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ .[66]

ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

বদর যুদ্ধের কথা। এই যুদ্ধে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলে আব্দুর রহমান এসেছিলেন রাসূলের বিরুদ্ধে ইসলাম মিটাতে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলেন রাসূলের সঙ্গী হয়ে ইসলামকে হেফাজত করতে। যুদ্ধের কিছুদিন পর আব্দুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করলেন। আসলে ইসলাম এমনই, একে আইন-কানুন, জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন কোন উপায়েই রুখা যায়

৬৭. সূরা বাকারাহ : ১৬৫

না। গতকাল যারা এর বিরোধিতা করেছে আজ সে নিজে কিংবা তার ছেলে ও নিকটের লোকেরা একে গ্রহণ করছে। এক সময় খ্রিস্টানরা স্পেন দখল করে মুসলমানদেরকে আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে নানাভাবে মেরেছে। মুসলমান শূন্য করে ফেলেছিল স্পেনকে। কিন্তু এই স্পেন কি এভাবেই রয়ে গেছে? আলহামদুলিল্লাহ! দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের ফলে এখন স্পেনের খ্রিস্টানরা মুসলমান হতে শুরু করেছে।

মদীনা শরীফে আসার পর একদিন আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আব্বাজান, আমি বদর যুদ্ধে এসেছিলাম। আপনাকে কয়েকবার আমার নাগালে পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার বাবা তাই আপনার উপর কোন আঘাত না করে সরে পড়েছি।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বেটা! ঘটনাটি যদি উল্টা হত, আমি যদি জানতাম, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তুমি এসেছ, তোমাকে দেখতে পেতাম। তাহলে আমি সর্বপ্রথম তোমাকেই হত্যা করতাম। তুমি আমার ছেলে, তোমার প্রতি আমার মহব্বত আছে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত এর চেয়ে অনেক বেশি। তাই আল্লাহর জন্য তোমাকে হত্যা করা থেকে আমার পিতৃস্নেহ বাঁধা দিতে পারত না।

দ্বিতীয় গুণ হল–

اَن يُّحِبَّ المَرْءَ لَايُحِبُّه اِلَّا لله

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসলে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর আদেশ পালনার্থেই ভালোবাসা।

বাবা-মাকে এজন্যে ভালোবাসা যে, আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশ দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীকে ভালোবাসবে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে- তাও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে। আলেম-ওলামা, আল্লাহওয়ালা-বুযুর্গদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে।

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন, মানুষ আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসার নিয়তে ভুল করে। কেউ এই নিয়তে সম্পর্ক রাখে ও ভালোবাসে যে, তিনি দু'আ করে দিলে আয় রোজগারে বরকত হবে। পানিতে ফুঁ দিয়ে দিলে রোগ ভালো হবে। এই ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার জন্য হল

না। এটা হল ডাক্তারকে ভালোবাসার মত। এটা নিরেট ব্যক্তি স্বার্থের ভালোবাসা।

কেউ নিয়ত করে, আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখলে পরকালের নাজাতের কোনো উপায় হতে পারে। কারণ, হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা নেক লোকদের উছিলায় অনেক পাপীকে ক্ষমা করবেন। এই নিয়ত খারাপ নয়। কেননা, জাহান্নাম থেকে নাজাত পেলে জান্নাত মিলবে। জান্নাতে যাওয়া মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া। তাই এটা খারাপ নয়। তবে একেবারে ভালোও নয়। কারণ, এতে প্রথম নজর নিজের স্বার্থের প্রতি, পরে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি। তাই এটা নিঃস্বার্থ আল্লাহর জন্য হল না। তবে এটা বাস্তব যে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক বিফলে যায় না।

হাদীসে আছে–

هُمْ قَومٌ لَايَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

অর্থাৎ তাঁরা এমন, তাদের সাথে যে বসে সে বঞ্চিত হয় না।

পিস্তলের গুলি বিফল হতে পারে। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্ক বিফল হয় না। কতভাবে যে এটা কাজে আসে!

আমার দাদা শায়েখ, পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা; মুফতী আযীযুল হক সাহেব (রহ.)-র সাথে চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী সম্পর্ক রাখত। সে ব্যবসায়ী একবার ইউরোপ গেল। রাতে এক হোটেলে উঠল। সেখানকার হোটেলে রাতে খারাপ উদ্দেশ্যে মহিলারা আসে। ব্যবসায়ীর কাছেও এক মহিলা আসল। তার মনে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল। এমন সময় দেখল, ঘরের দরজায় পটিয়ার মুফতী সাহেব (রহ.) আঙ্গুলে কামড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এ দৃশ্য দেখার পর তাঁর অন্তর থেকে গোনাহের সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজত করলেন।

আমরা কয়েকজন একবার গাড়ি ভাড়া করে নানুপুর মাহফিলে যাচ্ছিলাম। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ। শত শত ফুট উঁচু পাহাড়। উপর থেকে পড়লে উপায় নেই। এই পথে আমাদের গাড়ি চলছে। আল্লাহ তা'আলাই জানেন কয়শত ফুট উপরে গাড়ি চলছিল। হঠাৎ গাড়ি প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেল। কী হল, ড্রাইভারের কাছে সবার জিজ্ঞাসা। ড্রাইভার বলল, আমার চোখ লেগে গিয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় জোরে জোরে যিকিরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। নইলে উপায় ছিল না।

আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্কের ফায়দা তো অনেক। তবে এ নিয়তে সম্পর্ক করব না। নিঃস্বার্থভাবে শুধু আল্লাহর জন্য তাদেরকে ভালোবাসব। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা হল, আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসি। আর এই হাফেজ, আলেম আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়; তাই আমি এই হাফেজ, আলেমকেও ভালোবাসি। সে আল্লাহর প্রিয় তাই আমারও প্রিয়। এ ভালোবাসাই হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

আজ আমাদের সমাজের কী অবস্থা! হায়! হায়! বেগানা যুবক বেগানা যুবতীকে ভালোবাসে। আফসোস! হৃদয় কে দিলেন?

হৃদয়ে ভালোবাসার যোগ্যতা কে দিলেন?

কী জন্য দিলেন? আর ভালোবাসছে কাকে?

অথচ আল্লাহ তা'আলা হৃদয় দিয়েছেন আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসার জন্য। আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে ভালোবাসার জন্য। অথচ এই হৃদয় দিয়ে নিমকহারাম ভালোবাসছে বেগানাকে।

কে চোখ দিলেন? কী জন্য দিলেন?

কিন্তু চোখ দিয়ে বান্দা কোথায় তাকায়? কী দেখে?

এ যেন এমন হল, এক ব্যক্তি টক বরই খাবে। একজনকে বলল, লবন আনতে। সে পরিষ্কার বাটিতে সুন্দর করে লবণ এনে দিল। লবণ দিয়ে মজা করে বরই খেল। খাওয়া শেষে যে লবণ এনে দিয়েছিল লবণের বাটিটা তার নাকে সজোরে নিক্ষেপ করল। এমনই তো করছি আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا .[67]

'নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর সবগুলোর ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হবে। কী জন্য এগুলো দেয়া হয়েছে আর কী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে?

তৃতীয় গুণ হল–

اَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ

'কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা ও খারাপ জানা।'

আলহামদুলিল্লাহ! এ গুণ আমাদের মাঝে আছে। আমরা কেউ কাফের হতে রাজি নই। সবাই একে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত

৬৮. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬

অপছন্দ করি। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় গুণটির মাঝে আমাদের যথেষ্ট কমতি রয়েছে। এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। *

* কাঁচপুর মারকাযুল কুরআন মাদরাসায় প্রদত্ত বয়ান। অনুলিপি- মাও. যুবাইর আহমদ, ফরিদাবাদ

কুরআনী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سورة الحجرات : 9)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمْنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمِىْ وَاَدِّبْنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبِىْ

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ . سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

মানুষের আসল প্রাণ

মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতই প্রাণী। প্রাণীর যেমন প্রাণ আছে, মানুষেরও প্রাণ আছে। পানির অপর নাম জীবন। চতুস্পদ জন্তু হোক বা মানুষ- বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীই পানির মুখাপেক্ষী। মানুষ নাস্তিক হোক বা আস্তিক—সবাই পানি নির্ভর। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান, যাদেরকে আল্লাহ পাক ইসলামের দৌলত দান করেছেন। তাদের ভিন্ন আরেকটা প্রাণ আছে; যেই প্রাণ থাকার কারণে আমরা

মুসলমান। এটা চলে গেলে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা যায়; কিন্তু মুসলমান হিসেবে নয়। কিছু কিছু লোক মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে প্রাণী হিসেবে বেঁচে আছে ঠিক, তবে মুসলমান হিসেবে বেঁচে নেই। যেমন- তাসলিমা নাসরিন ও তার মতো নাস্তিকরা। গরু-ছাগল যেমন বেঁচে আছে, তারাও তেমনি বেঁচে আছে; কিন্তু মুসলমান হিসেবে নয়, নাস্তিক হিসেবে।

কেন তাদের এই বিপর্যয় হলো? মুসলমান বাবা-মার ঘরে জন্ম নিল। নামটাও কত সুন্দর 'তাসলিমা নাসরিন।' অর্থবহ নাম। এরপরও কেন তার এই বিপর্যয় হলো?

এই বিপর্যয়ের কারণ হলো, প্রাণীর যেমন প্রাণ আছে, যে প্রাণের জন্য পানি প্রয়োজন। পানি ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। মানুষের এই প্রাণ ছাড়াও আরেকটি প্রাণ আছে। যতক্ষণ প্রাণ সচল থাকবে ততক্ষণ সে মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকবে। এই প্রাণের মৃত্যু ঘটলে মুসলিম সত্তারও মৃত্যু ঘটে।

এই মুসলমানী প্রাণের পানি সরবরাহ হয় দীনের আলোচনা দ্বারা। যতক্ষণ দীনি কথা আলোচনা করা হয় ততক্ষণ এই প্রাণ সতেজ থাকে।

সাহাবারা যখন পরস্পর একত্রিত হতেন তখন একে অপরকে বলতেন–

تَذَاكَرُوا الْحَدِيْثَ فَإِنَّ ذِكْرَ الْحَدِيْثِ حَيَاةٌ

অর্থ : তোমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের আলোচনা করো। কারণ, হাদীসের আলোচনা প্রাণ সঞ্চার করে।

আর হাদীসের আলোচনার মাধ্যমেই ঈমানের উন্নতি হয়, রূহানিয়্যাত তাজা হয়। পক্ষান্তরে হাদীসের আলোচনা না করলে অন্তর মরে যায়, ঈমানের আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কেননা ইলম হল নূর। নূর না থাকলে তো অন্তর আলোহীন হবেই।

সম্ভবত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اَلْعِلْمُ نُوْرٌ فِى الْقَلْبِ، يَهْدِىْ اللهُ بِه مَن يَّشَاءُ ، وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ، وَلٰكِنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ وَهِىَ اَلتَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْإِنَابَةُ اِلَى دَارِ الْخُلُوْدِ

অর্থ : ইলম হল নূর। যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে খুশি হেদায়াত দান করেন। অধিক মাসআলা জানার নাম ইলম নয়; বরং এটি যার মধ্যে আসবে তার বাহ্যিক অবস্থা হবে, সে প্রতারণাপূর্ণ দুনিয়ার মোহে না

পড়ে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাতমুখী থাকবে। এটা সাধারণ ইলম নয়- এতো ঐ ইলম যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمِىْ وَاَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبِىْ

অর্থ : আমার মালিক আমাকে এলেম শিখিয়েছেন, কতই না সুন্দর শিখিয়েছেন। আমার রব আমাকে আদব শিখিয়েছেন, কতইনা সুন্দর আদব শিখিয়েছেন।

ইলমে অহীর স্থান

এটা মস্তিষ্কপ্রসূত কোন জ্ঞান নয়; বরং এটি সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলামীন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের বক্ষে আসে। এর জায়গা বক্ষ, মস্তিষ্ক নয়। মস্তিষ্ক জাগতিক জ্ঞানের স্থান।

হাশরের দিন আল্লাহ কলবের অবস্থা দেখবেন। এর হিসাব নিবেন। আকলের অবস্থা দেখবেন না। এর উপর ভিত্তি করে হিসাব নিবেন না।

সুতরাং জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা জরুরী হলে, যেটা ঐশী ইলম তা অর্জন করার কি প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে; বরং জাগতিক জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ঐশী জ্ঞান অর্জন করা অনেক বেশি জরুরী। কারণ, এটা আল্লাহ প্রদত্ত আর ওটা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সব সমস্যার সমাধানের জন্য বিবেক তো যথেষ্ট। ঐশী এলেম তথা, ওহীর কী প্রয়োজন?

এর উত্তর হল, সব সমস্যা সমাধান করতে মস্তিষ্ক ও পঞ্চেন্দ্রিয় যথেষ্ট নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো মস্তিষ্ক সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না অথবা সিদ্ধান্ত দেয় যা শুধু ভুল নয়; বরং মহা ভুল হিসেবে বিবেচিত হয়।

এর মাত্র দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১. নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা মহাপাপ সবাই জানি। সুতরাং যে সব অস্ত্র দ্বারা গণহারে মানুষ মারা সম্ভব সেসব মারণাস্ত্র বানানো কি কোনো ভালো কাজ হতে পারে? কখনোই না।

তাহলে বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতার ধ্বজাধারী মোড়ল দেশগুলো প্রতিযোগিতা করে যে মারণাস্ত্র তৈরি করছে তা কি কোনো

ভালো কাজ, নাকি জঘন্য খারাপ কাজ? কেউ বলতে পারবে, তারা কী পরিমাণ অস্ত্র মজুদ করেছে? কিসের নেশায় এসব মজুদ রেখেছে?

আশ্চর্যের বিষয়! যেখানে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মরছে, চরম দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে বিশাল জনগোষ্ঠী, সেখানে সবচেয়ে বড় বাজেট কী করে মানুষ ধ্বংসের সরঞ্জাম বানানোর কাজে ব্যয় হয়?

আমেরিকা ও রাশিয়া যে পরিমাণ মারণাস্ত্রের মজুদ করেছে তা দিয়ে পৃথিবীকে একবার নয় অর্ধশত বার ধ্বংস করলেও অস্ত্র শেষ হবে না। এসব প্রাণঘাতি অস্ত্র বানানোর সিদ্ধান্ত কে দিল তাদের? নিশ্চয় তাদের মস্তিষ্কই এ দুর্বুদ্ধি তাদেরকে সরবরাহ করেছে। মস্তিষ্কের এ সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল তাতো স্পষ্ট। বাহ্যত ভুল তারাও স্বীকার করছে (তবে মন থেকে স্বীকার করছে কিনা এতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে)। তাইতো মোড়লদেশগুলো নিজেরা পারমানবিক অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারের মালিক হয়ে এখন জোটবদ্ধ হয়েছে, যেন এমন ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র কেউ আর বানাতে না পারে।

২. দুনিয়ার মধ্যে সভ্যতার নামে অনেক অসভ্যতা চলে। তার মধ্যে এটাও যে, যুক্তির নিরিখে যে কাজ ভালো মনে হবে, তাই সঠিক বলে গণ্য হবে। বিষয়টা একটু খোলাসা করে বলি- একটা ছেলে বা মেয়ে যখন বালেগ হয়, তখন তাদের মধ্যে নতুন এক ধরনের চাহিদা সৃষ্টি হয়, তা হল যৌন চাহিদা। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মানুষ তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। আর এ চাহিদা পূরণের জন্য যে বিধান রয়েছে তা হলো বিবাহ। কিন্তু সভ্যতার দাবীদাররা বলে বেড়ায়—বিবাহ-শাদীর কী প্রয়োজন? যার সাথে খুশি, যখন খুশি জৈবিক চাহিদা মেটাবে- বাধা কিসের? অযথা বিবাহের ঝামেলায় জড়ানোর কী প্রয়োজন? নাউযুবিল্লাহ!

আর যদি বিবাহ-শাদী করতেই হয়, তাহলে সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী হল আপন ভাই-বোন। কেননা বিবাহ হলো স্থায়ী একটি চুক্তি। আর একসাথে থাকতে হলে তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে ভালোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবন টিকবে কী করে? এক্ষেত্রে ভাই-বোনই অধিক যোগ্য। কেননা ভাই জানে তার বোনের ভালো-মন্দ দিকগুলো। তার মেজাজ কেমন তাও ভাই অন্যদের

তুলনায় ভালো জানে। তেমনি বোনও ভাই সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের তুলনায় ভালো জানে। সুতরাং অপরিচিত দু'জন ছেলে-মেয়ের তুলনায় ভাই-বোনই তো যোগ্য পাত্র-পাত্রী। নাউযুবিল্লাহ!

এ সিদ্ধান্তটাও কিন্তু মস্তিষ্কের এবং কিছুটা যুক্তিসঙ্গতও; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে মারাত্মক ভুল তাতো বিবেকবান মানুষ মাত্রই বোঝে।

বোঝা গেল, মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত ভুল হয়। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো মস্তিষ্ক দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। তাই বলে সেটা অস্বীকার করা যাবে? কখনোই না।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। নেককার মানুষের মর্যাদা ফেরেশতার চেয়ে বেশি। আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসাবে বানালেন, আর মানুষের ভালো-মন্দ বাছ-বিচারের দায়িত্ব শুধু তাদের অপরিপক্ব মস্তিষ্কের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিবেন তা কী করে হয়! যদি মস্তিষ্কের উপরই ছেড়ে দেন মানুষের ভালো-মন্দ যাচাইয়ের বিষয়- তাহলে তো মানুষ সারা জীবন অজ্ঞতার সাগরে হাবুডুব খাবে। কোনো কূল-কিনারা পাবে না। তাই মানুষ যেন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা বিপথগামী না হয় সে জন্য আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে 'অহী' অবতীর্ণ করেছেন। যার সর্বশেষ সমষ্টি হল কুরআন মাজীদ। এ 'অহী' সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .[68]

অর্থ, নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর আমিই এর সংরক্ষণকারী।

সুতরাং বোঝা গেল, মানুষ তার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শক্তির যতটুকু না মুখাপেক্ষী, তার চেয়ে অহীর মুখাপেক্ষী আরো অনেক বেশি। কারণ, 'অহীর' ইলম ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মানবতার অর্জন কখনোই সম্ভব নয়।

---

৬৯. সূরা হুজরাত : ৯

মাদরাসাগুলোতে এ এলেমই শিক্ষা দেয়া হয়। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে আসে। ফলে এর আলোয় মুমিনের অন্তর আলোকিত হয়।

অহীর এলেম ছাড়া অন্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের জায়গা হল মস্তিষ্ক। আর এসব জ্ঞান অর্জনের জন্য 'অহী'র প্রয়োজন নেই। বুদ্ধি ও মেধাই যথেষ্ট। 'অহী' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের বক্ষে আসে; পক্ষান্তরে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মস্তিষ্কপ্রসূত এবং এর স্থান মস্তিষ্ক বা ব্রেইন।

এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা সম্বলিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আসা যাক।

কুরআন সংরক্ষণকারী বাহিনী

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য যেমন প্রতিরক্ষা বাহিনী তথা স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রয়োজন। যেন কোনো শত্রুদেশ সে দেশের ত্রি-সীমানা নৌ, স্থল ও অন্তরীক্ষ আক্রমণ করার সাহস না করে। শত্রুদেশের আক্রমণের শিকার হলে সামরিক বাহিনী জীবনবাজি রেখে তাদের প্রতিহত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা হল একটা দেশের সামরিক প্রস্তুতি।

এমনিভাবে আমাদের দীনের উৎস হল কুরআন। আর হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআন হল "থিওরি" আর হাদীস হল তার 'প্রাক্টিক্যাল রূপ"। ফেকাহশাস্ত্রের উৎস হল কুরআন-সুন্নাহ। কুরআনের উপরও তিন পথ দিয়ে আক্রমণের আশংকা আছে। তা প্রতিহত করার জন্যও রয়েছে কুরআন তথা দীন রক্ষাকারী তিন বাহিনী।

আজ থেকে বিশ/পঁচিশ বছর আগে আমেরিকা প্রবাসী এক ব্যক্তি আমার কাছে একটি চিঠি লিখেছিল। চিঠির বক্তব্য ছিল এমন– বাংলাদেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী আমেরিকায় আসে পড়াশুনা করার জন্য। কিন্তু যে সমস্যাটা দেখা দেয় তা হলো, এখানকার অধিকাংশ মানুষ খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের সাথে এক সাথে চলা-ফেরা, উঠা-বসা হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক বিষয়েই তাদের সাথে বাংলাদেশীদের কথাবার্তা হয়। তারা একটা কথা প্রায় বলে যে, তোমরা জন্মসূত্র

মুসলমান, আমরা জন্মসূত্র খৃস্টান। তোমরা তোমাদের ধর্মকর্ম করলে জান্নাতে যাবে। আর আমরাও আমাদের ধর্মমতে চলে জান্নাতে যাবো। তোমাদের কুরআনও সঠিক আমাদের বাইবেলও সঠিক। এখন তোমরা যেহেতু খ্রিস্টান দেশে আছো, তাই খ্রিস্টান ধর্ম পালন করাইতো তোমাদের জন্য সহজ। অধিকন্তু পরকালে নাজাতও পেয়ে যাবে। তাহলে তোমাদের খৃস্টান হতে আপত্তি কোথায়? এ প্রশ্নের কোন উত্তর আমরা দিতে পারি না। এখন আমাদের করণীয় কী?

চিঠির উত্তরে লিখেছিলাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য সব মতবাদ বাতিল হয়ে গেছে। এখন একমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নেই। সুতরাং খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদী ধর্ম পালন করলেও মুক্তি পাওয়া যাবে এ ধারণা সম্পূর্ণ গলদ। কারণ, আজ থেকে চৌদ্দশত বছরেরও আগে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। দুনিয়ার কোনো বিদ্বান-পণ্ডিত তাঁর একটি নুকতারও ভুল ধরতে পারেনি। কেয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। কুরআন লৌহে মাহফুজ থেকে যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবেই আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে। এটা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন।

খৃস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ তারা তাদের গ্রন্থের একজন মাত্র হাফেজ দেখাক, যে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর যে বাইবেল অবতীর্ণ হয়েছিল হুবহু তা মুখস্থ করেছে। পারবে? কখনও পারবে না।

পক্ষান্তরে কুরআন সংরক্ষণের জ্বলন্ত প্রমাণ, অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত একে অগণিত হাফেজ সিনায় সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ! কুরআন ছাড়া অন্য কোনো আসমানি কিতাব সংরক্ষিত নেই। তাই সে সব ধর্মও সঠিক অবস্থায় নেই।

মূল কথায় ফিরে আসি, কুরআনের উপর আঘাত তিন পথে আসতে পারে। তাই ঐ তিন পথকে সুরক্ষিত করা হয়েছে কুরআন সংরক্ষণকারী তিন বাহিনী দ্বারা।

প্রথম বাহিনী হল 'ক্বারী বাহিনী'। যাঁরা কুরআনের শাব্দিক উচ্চারণের সংরক্ষক। কেননা কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমষ্টির নাম। শুধু অর্থের নাম কুরআন নয়। আর এ কারণেই কুরআন শরীফ অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলেও সওয়াব পাওয়া যায়। এটা একমাত্র কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থের এ বৈশিষ্ট্য নেই। সুতরাং কুরআনের শাব্দিক উচ্চারণও সংরক্ষিত। আর এ জন্যই আরবী ভাষা ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষায় আরবী উচ্চারণ রূপান্তরিত করে কুরআন ছাপানো, পড়া ও বিক্রি করা হারাম। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। কারণ, আরবী ব্যতিত অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের সঠিক উচ্চারণ কখনো সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বাহিনী হল, 'হাফেজ বাহিনী'। তাঁরা কুরআনের আদ্যোপান্ত শব্দের সরংক্ষক। কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো আসমানী গ্রন্থের এত হাফেজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র কুরআনেরই রয়েছে কোটি কোটি হাফেজ।

তৃতীয় বাহিনী হল, 'আলেম বাহিনী'। তাঁরা কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যার সংরক্ষক। কেননা এ কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। নচেৎ মানুষ তার বুঝমত কুরআনের অর্থ করতো। কেউ মু'জেযা অস্বীকার করতো। কেউ মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতো। কেউ বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেরাজ অস্বীকার করতো। আল্লাহ সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কুরআনের সঠিক অর্থ এবং কোন আয়াতের কী উদ্দেশ্য আলেমগণ তার সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ মনগড়া অর্থ করতে পারেন না। করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সঠিক বলে গণ্য হবে না।

এ হল কুরআন তথা দীন সংরক্ষণকারী বাহিনী।

সামরিক বাহিনী যেমন তৈরি হয় সামরিক একাডেমীতে বা ক্যান্টনম্যান্টে। তেমনি কুরআন রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি হয় দীনী মাদরাসায়। এসব মাদরাসাতেই এ বাহিনী সঠিকভাবে তৈরি হয়। সুতরাং এ মাদরাসাগুলো দীনের ক্যান্টনম্যান্ট। এসব মাদরাসা ঠিক

থাকবে তো দীন ঠিক থাকবে অন্যথায় দীনের নামে বদদীন জায়গা করে নিবে।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ كُتِبَتْ لَهُ الْأَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ بِهٖ وَهُوَ صَحِيْحٌ .

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ كُتِبَتْ لَهُ الْأَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ

অর্থ, বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সুস্থ অবস্থার নেক আমলের সমপরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়।

অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে শরীয়তের বিভিন্ন বিধানাবলি পালনে কিছু ছাড় রয়েছে। যেমন কেউ ৭৭.২৫ কি.মি. বা ৪৮ মাইল সফরের উদ্দেশ্যে নিজ বসতি থেকে বের হলে, চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত পড়বে। অবশ্য মুকীম ইমামের পেছনে পড়লে চার রাকাতই পড়তে হবে। এমনিভাবে অসুস্থতার দরুন নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে পড়বে। তাও না পারলে শুয়ে পড়বে।

তবে সফরের কারণে কম নামায পড়লে অথবা অসুস্থতার কারণে বসে বা শুয়ে নামায পড়লে সাওয়াব কম হবে- এ ধারণা ভুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সফর বা অসুস্থতার কারণে কেউ ইবাদত কম করলে, আল্লাহ তার সাওয়াব কম দেন না; বরং সুস্থ বা মুকীম অবস্থায় যেমন সাওয়াব হত, সফর ও অসুস্থাবস্থায় কম ও বসে নামায পড়লে তেমনই সাওয়াব হবে। বান্দার প্রতি এটা আল্লাহর দয়া।

আল্লাহপাকের মর্জি বুঝতে হবে

আসল বিষয় হল আল্লাহপাকের মর্জি উপলব্ধি করতে পারা। আল্লাহপাকের মর্জি যে যতটুকু বুঝতে পারবে সে ততটুকু কামিয়াব।

হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে এক লোক এসে বলল, 'আমার জন্য দোয়া করবেন, যেন দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারি'। লোকটা চলে গেলে থানবী (রহ.) বললেন, এই লোকটি যদি আল্লাহর মর্জি বুঝতো তাহলে এ কথা বলত না। কারণ, রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই এক্ষেত্রে সুন্নত হল, ধৈর্য ধারণ করা, সাথে সাথে সুস্থতার জন্য দোয়া করা। কিন্তু সে ভেবেছে অসুস্থতার কারণে তাকে সাওয়াব কম দেওয়া হয়েছে। তাই সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার জন্য দোয়া চেয়েছে। অথচ তার উচিত ছিল, সুস্থতার জন্য দোয়া চাওয়া। লোকটা আল্লাহর মর্জি বুঝতে না পারায় এ কথা বলেছে। তাসাওউফের পরিভাষায় একেই বলে 'তাসলিম' বা 'রেযা'।

হযরত পীরজি হুজুর (রহ.) শে'র (কবিতা) বলতেন–

زنده کنی عطائے تو وربکشی فدائے تو
دل شده مبتلائے تو هر چه کنی رضائے تو

হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে জীবিত রাখেন এটা আপনার অনুগ্রহ। আর যদি আমাকে মৃত্যু দেন; তাহলে আমি তার জন্য প্রস্তুত। আমার সবকিছুই আপনার জন্য উৎসর্গিত।

আল্লাহর আরেক আরেফ বলেন–

بهار من خزاں صورت گل من شکل خار آمد
چوں از یار من آمد همی دانم بهار آمد

অর্থ, আমার হেমন্তটা বসন্তের মত। দেখতে হেমন্ত দেখা যায়; কিন্তু এটাই আমার বসন্ত। আমার বিপদ-আপদ আমার কাছে প্রিয়। কারণ, এ যে আমার প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে উপহার।

বিপদ-আপদ দেয়ার কারণ

আল্লাহ বিপদ-আপদ কয়েকটা কারণে দেন–

১. গুনাহ মাফের জন্য।
২. বিপথগামী বান্দার সংশোধনের জন্য।
৩. মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে–

اَنَا عِنْدِ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

অর্থ, আমি আল্লাহ ভগ্ন হৃদয়ের অতি নিকটে।

হযরত যাকী কাইফী (রহ.) একজন কবি ছিলেন। তিনি বলেন,

تو بچابچا کر نه رکھ که یه آئینه هے وه آئینه
جو شکسته عزیز تر هے نگاه آئینه ساز میں

'তোমার দিল একটা আয়না। একে ভেঙে যেতে দাও, হেফাজত করে রেখো না। কারণ এ ভাঙা আয়নাটাই আল্লাহর কাছে প্রিয়।'

বাস্তবেও ভাঙা মন আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। মন ভাঙ্গার অনেক কারণ হতে পারে। যেমন,

১. ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে।
২. আল্লাহর দীনের অবমাননা দেখে।
৩. আল্লাহকে না পাওয়ার কারণে।

অথবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে। মোটকথা, সব ধরণের ভাঙা মন আল্লাহর কাছে প্রিয়। তবে শর্ত হল, সবর করতে হবে।

حقیقت میں وہی کامل شکستہ دل جسے حاصل
بہت طالب خدا ملتا شکستہ دل نہیں ملتا

'ঐ ব্যক্তিই কামেল, যে লাভ করেছে ভাঙা হৃদয়। মাওলাকে খোঁজার লোক তো অনেক আছে, কিন্তু ভগ্নমনা ক'জন আছে?'

আমাদের অবস্থা হল, আমরা আয়েশে থেকে আল্লাহকে পেতে চাই।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর ঘরে একবার রাতে চোর ঢুকে সব আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে গেল। সকাল বেলা তাঁর কাছে এ সংবাদ দেওয়া হল, তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন। পরে চোরটা ধরা পড়ল। মালামালও সব পাওয়া গেল। এ সংবাদ শুনেও তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন।

সকলেই অবাক। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যখন সবকিছু নিয়ে যাওয়ার সংবাদ পেলাম তখন আলহামদুলিল্লাহ এজন্য বলেছি যে, আমাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন হেফাজতের জন্য। তিনিই যখন আমাকে এ গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন এ শোকরিয়াস্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। আবার যখন মাল ফেরত পেলাম, তখন হারানো মাল ফেরত পাওয়ায় আলহামদুলিল্লাহ বলেছি।

কবি হাফেয সিরাজী (রহ.) বলেন–

میل من سوئے وصال ومیل او سوے فراق
ترکِ کامِ خود گرفتم تا بر آید کام دوست

'আমি তো চাই মাওলার সাথে মিলিত হতে, কিন্তু তিনি হয়ত তা চান না। তাই আমার চাওয়া তার ইচ্ছার কাছে বিলীন করে দিলাম।'

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) বলেন, আমার কোন ইচ্ছা নেই, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

মোটকথা, দীনের হাকিকত হল তাসলিম ও রেযা অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি।

মির্জা মাজহার জানেজানা (রহ.) বাদশাহ আলমগীর (রহ.)-এর খালাতো ভাই ছিলেন। শাহী বংশের এ বুযুর্গের নামেই তাফসীরে মাযহারী নামকরণ করা হয়েছে। যার লেখক কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)। তখন ফ্রিজ ছিল না, তাই মানুষ পানি ঠাণ্ডা রাখতে মাটির কলস ব্যবহার করত।

একদিনের ঘটনা। মির্জা জানেজানা (রহ.) বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। ঘুম আসছে না। কেন ঘুম আসছে না দেখার জন্য আলো জ্বালালেন। তেমন কিছু নজরে পড়ল না। হঠাৎ নজর পড়ল কলসের উপর। দেখেন, গ-াস বাঁকা করে রাখা। ঘুম না আসার কারণ বুঝে ফেললেন।

আরেকটা ঘটনা। মির্জা মাজহার (রহ.) বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘুম আসছে না। শোয়া থেকে উঠে ঘর দেখলেন, বিছানা-চাদর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সমস্যা খুঁজে পেলেন না। অতঃপর চাদর উল্টে দেখেন একটা সুতা বের হয়ে আছে। তখন বললেন, এই জন্য ঘুম আসছে না। আল্লাহ আকবার! কেমন শাহী মেজাজ! এতদ্বসত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনেক বড় বুযুর্গ। তাঁর কাছে বাইয়াত হয়েছিলেন কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) যার লেখা কিতাব 'মা-লা-বুদ্দা মিনহু' দরসে নেজামির নেসাবভুক্ত। এত স্পর্শকাতর মানসিকতা সত্ত্বেও ছিলেন আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অসম্ভব রাগী মেজাজের। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালার উপর তাঁর এতটা সন্তুষ্টি ছিল যে, স্ত্রীর অসংলগ্ন আচরণ তিনি সানন্দে মেনে নিতেন। একেই বলে, তাসলিম বা রেযা। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজ ইচ্ছার জলাঞ্জলী দেয়া।

তবে নিজের কষ্টের কথা আল্লাহর কাছে বলা তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়; বরং এটা হল সবচেয়ে আপনজনের কাছে নিজের কষ্ট ব্যক্ত করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ইবরাহীম (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি খুব কেঁদেছিলেন। তবে তা ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায়।

কবির ভাষায়–

شرح حال خود نمودن شکوۂ تقدیر نیست
نالہ بر سنت نمودن نوحہ وفریاد نیست

'নিজের 'আপনজনের; কাছে মনের ব্যথার কথা খুলে বলা তাকদিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। সুন্নত মোতাবেক অশ্রু বর্ষণ করা মাতম বা মর্সিয়া নয়।'

মোটকথা, আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকাই হল কামেল মুমিনের নিদর্শন।

হাদীস শরীফে আছে–

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন।

মুমিনের আরেকটি আলামত হল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে ইবাদতের মজা পাওয়া, বিপদ-আপদের তিক্ততা সহ্য করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

আমাদের ব্যবহারিক শব্দগুলোও ইসলামী ভাবধারার হওয়া উচিৎ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : وَمِنْ اٰيَاتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ .[69]

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ . سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

ভাষা মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

৭০. সূরা রুম : ২২

দুনিয়াতে যত প্রাণী রয়েছে সমস্ত প্রাণীর ভাষার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। মানুষ যেমন তার মনের ভাবকে মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে ধ্বনি ও আওয়াজটাকে টুকরা টুকরা ও খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করতে পারে অন্য প্রাণী এভাবে পারে না। ফেরেশতা, জিন ও মানুষ এ তিন মাখলুক পারে। এ তিন মাখলুক ছাড়া যত পশু-পাখি রয়েছে তাদেরও যবান রয়েছে কিন্তু তারা বলতে পারে না। মানুষ যেমন ঠাণ্ডা লাগলে বলে আমাকে লেপ-কম্বল দাও, গরম লাগলে বলে আমাকে পানি দাও, বাতাস কর–অন্যান্য প্রাণী তা বলতে পারে না। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা একটা ডাক আছে। সর্বক্ষেত্রে ঐ একটি ডাকই উচ্চারণ করে। গরমের জন্যও ওটা, শীতের জন্যও ওটা, সুখের ক্ষেত্রেও ওটা, দুঃখের ক্ষেত্রেও ওটা। মানুষ এর ব্যতিক্রম।

নানা রকম ভাষা মানুষের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর মধ্যে শত শত ভাষা চালু আছে। বাংলা, আরবী, ইংরেজী, উর্দূ, ফারসী, চাইনিজ ইত্যাদি। প্রতি অঞ্চলের মানুষের ভাষায় খুব ব্যবধান রয়েছে। প্রতি আট মাইল অন্তর অন্তর ভাষার ব্যবধান রয়েছে। আমাদের এখানে আঞ্চলিক যেসব শব্দ রয়েছে আট মাইল দক্ষিণে গেলে বেশ অনেকটা পরিবর্তন দেখা যাবে। এমনিভাবে আট মাইল উত্তরে কিংবা পশ্চিমে গেলেও অনেক পরিবর্তন দেখা যাবে। আর যদি কষ্ট করে ওখান থেকে চট্টগাম পর্যন্ত যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে বিশাল পরিবর্তন। আর চট্টগ্রামের মানুষ যদি কষ্ট করে সিলেট যায় তাহলে দেখা যাবে পরিবর্তনের কী অবস্থা! চট্টগ্রাম ও সিলেটের মানুষ যদি ঝগড়া লাগে তাহলে তারা নিজেরাও কিছু বুঝবে না, তৃতীয় পক্ষও কিছু বুঝবে না।

ভাষার এ ব্যবধানটা শুধু মানুষের জন্য। অন্য কোনো পশু-পাখির ভাষায় ব্যবধান নেই। আমাদের বাংলাদেশের কাক যে ধরনের ডাক দেয়, সৌদি আরবের কাকও একই ধরনের ডাক দেয়। বাংলাদেশের কবুতরের যে ডাক, আমেরিকা, জাপান ও সৌদি আরবের কবুতরেরও একই ডাক। মানুষ আর পশু-পাখির মাঝে বিশাল এক ব্যবধান রয়েছে, যা আমরা কল্পনাও করিনি। ভাষার ব্যবধানের বৈশিষ্ট্য কেবল মানুষের মধ্যে রয়েছে। এ ব্যবধানটা দুইভাবে রয়েছে। প্রথমতঃ মানুষের যে কোনো ভাব ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও ধ্বনির ব্যবহার।

দ্বিতীয়তঃ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার। আর পশু-পাখি প্রতিটি বিষয়ের জন্য যেমন একই আওয়াজ করে, তেমনি প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যও একই ধ্বনি উচ্চারণ করে।

ভাষার ভিন্নতার এ বিশেষত্ব মানুষের উপর আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত এবং এটা তাঁর কুদরতের অনেক বড় নিদর্শন। বিষয়টি আল্লাহ পাক নিজেই কুরআন শরীফে ব্যক্ত করেছেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ.[70]

–তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা।

ভাষা ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা

আল্লাহপাক যে আমাদেরকে ভাষা দান করলেন এ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহপাক আমাকে হাত-পা, কান ও চোখসহ অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। সেই সাথে এগুলো ব্যবহারের জন্যও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এসব বস্তুর ক্ষেত্রে যদি দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে কথা বলার শক্তি ও মনের ভাব প্রকাশের যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা থাকাও যৌক্তিক বিষয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের উপর গবেষণা করলে দেখা যায় ভাষা ব্যবহারেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

ভাষা মানুষের মর্যাদাপ্রকাশক

একজন মানুষের ইজ্জত-সম্মান, মান-মর্যাদা সবই তার ভাষা ও কথার দ্বারাই নির্মিত হয়।

মানুষের যবান এবং যবান থেকে উচ্চারিত শব্দ কী জিনিস, তা বোঝার জন্য প্রথমে একটি ঘটনা শোনাই। তাহলে বিষয়টি সহজে অনুধাবন করতে পারবেন। এক বাদশা শিকারে যাবেন। হরিণ শিকার করবেন। যে বনে হরিণ পাওয়া যায় সে বনে গেলেন। সঙ্গে বন্দুক নিয়ে গেলেন। বাদশা যেহেতু শিকারে যাবেন তাঁর সাথে উজির, কোতোয়াল

৭১. প্রাগুক্ত

(পুলিশপ্রধান), চাপরাসীও চলল শিকারে। বাদশাসহ মোট চারজন। তারা হরিণ শিকার করার জন্য বনে গেছেন। হঠাৎ বাদশার নজরে একটি হরিণ ভেসে উঠল। বাদশা দ্রুতবেগে হরিণের দিকে ছুটে চললেন। চলতে চলতে এক পর্যায়ে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে পড়লেন। উজির, কোতোয়াল আর চাপরাসী পিছনে রয়ে গেলেন। তারা তিনজন বাদশাকে খুঁজতে শুরু করলেন। বাদশাকে তালাশ করতে করতে এক সময় এরা তিনজনও একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। চারজন চার দিকে। বাদশা তো হরিণের অন্বেষণে ছুটছেন। বনের এক পথের মোড়ে একজন অন্ধ লোক বসা ছিল। বাদশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শাহজী! হরিণ কোন দিকে গেছে? অন্ধ লোকটি যে কোনোভাবে অনুমান করে উত্তর দিলেন, হরিণ এই দিকে গেছে। বাদশা সামনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর উজির এসেছেন এ পথে। তিনিও অন্ধ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরতজী! হরিণ কোন দিকে গেছে? অন্ধ লোকটি জবাব দিলেন, হরিণ এ দিকে গেছে, বাদশাও এদিকে গেছেন। উজির ঐ পথে অগ্রসর হলেন। কিছুক্ষণ পর কোতোয়াল (পুলিশ সুপার) এসে অন্ধ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, হাফেজ্জী! হরিণ কোন দিকে গেছে? অন্ধ বেচারা উত্তর দিলেন, হরিণ, বাদশা, উজির ও কোতোয়াল সকলেই এই দিকে গেছেন। তারপর এলো চাপরাসী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অন্ধ! হরিণ কোন দিকে গেছে? অন্ধ লোকটি জবাব দিলেন, হরিণ, বাদশা, উজির এবং কোতোয়াল সকলেই এই দিকে গেছেন। সেও সামনে অগ্রসর হল। এক পর্যায়ে সকলেই একত্রিত হয়ে গেলেন।

এবার তারা পরস্পরে আলাপ করলেন যে, আমরা তো চারজন চারদিকে চলে গিয়েছিলাম। পৃথক হওয়ার পর আমরা আবার একত্রিত হলাম কিভাবে? তখন বাদশা বললেন, রাস্তার মোড়ে একজন অন্ধ লোক বসা ছিল। সে আমাকে এদিকে হরিণের সন্ধান দিয়েছে তো আমি এদিকে এসেছি। উজির বলল, আমাকেও তো ঐ অন্ধ লোকটিই বলল যে, বাদশা এদিকে গেছেন, তাই আমি এদিকে এসেছি। কিন্তু কিভাবে সে জানল যে, আপনি এদিকে এসেছেন? কোতোয়াল বলল- আশ্চর্য! আমাকেও তো ঐ অন্ধ লোকটিই সংবাদ দিল যে, আপনারা দু'জন এখানে আছেন। চাপরাসী বলল, আমাকেও তো অন্ধ লোকটিই

আপনাদের সকলের এই দিকে আসার সন্ধান দিল। সবার মাঝে বিরাট বিস্ময় ও কৌতূহল কাজ করছে। আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদেরকে সে চিনে না। চিনার প্রশ্নও ওঠে না। কারণ সে একজন অন্ধ লোক। অন্ধ হয়েও এসব পারল কিভাবে?

এবার সবাই মিলে অন্ধ লোকটির কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে জানলেন যে, আমরা ঐ দিকে গিয়েছি? সঙ্গে সঙ্গে কে বাদশা, কে উজির, কে কোতোয়াল তাও বলে দিলেন। অন্ধ লোকটি বলল, আমি আপনাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের ভাষা থেকে অনুধাবন করেছি আপনারা কে কোন পদমর্যাদার মানুষ। প্রথম যে ব্যক্তি আমাকে হরিণের কথা জিজ্ঞেস করেছেন তিনি আমাকে সম্বোধন করেছেন 'শাহজী' বলে। বলেছেন শাহজী! হরিণ কোন দিকে গেছে? শাহজী শব্দটি ঐ ব্যক্তির মুখে শোভা পায় যিনি খুব উন্নত মানসিকতার অধিকারী। যিনি একজন সাধারণ মানুষকেও শাহজী বলার হিম্মত রাখেন আমি তার শব্দ দ্বারাই বুঝেছি যে, তিনি বাদশা হবেন। আর দ্বিতীয় জন যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তখন তিনি আমাকে 'হজরতজী' বলে সম্বোধন করেছেন। বলেছেন, হজরতজী! হরিণ কোন দিকে গেছে? আমি তার ঐ শব্দ থেকেই বুঝে গিয়েছি যে, এ শব্দ কেবল একজন উজিরের মুখেই শোভা পায়। সুতরাং তিনি উজির হবেন। তৃতীয় ব্যক্তি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন 'হাফেজ্জী' বলে। (এটা অন্ধদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক শব্দ। অন্ধদের যেহেতু স্মরণশক্তি বেশি থাকে তাই তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।) শব্দটি আগের দুই শব্দের চেয়ে মানগতভাবে নিম্নস্তরের। আর বাদশা ও উজিরের পরের স্তরের হলেন কোতোয়াল বা পুলিশ সুপার। এ হিসেবে আমি ধরে নিয়েছি তিনি কোতোয়াল হবেন। আর সর্বশেষ যিনি এসেছেন তিনি আমাকে সম্বোধন করেছেন, আরে আন্ধা! হরিণ কোন দিকে গেছে? তার কথা থেকেই আমি বুঝে নিয়েছি এ লোকটি চাপরাসী হবে। এর মানসিকতা থেকে এটা বোঝা যায়।

এর নামই হল ভাষা ও পরিভাষা। আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় এটাই। কাকে কী বলব, কোন জায়গায় কী বলব, হিসাব করে বলতে হবে। এর উপর মানুষের মান-সম্মানসহ অনেক কিছু নির্ভর করে। পারস্যের কবি শেখ সাদী (রহ.) বলেন–

کمال است در نفس انسان سخن
تو خود را بگفتار ناقص مکن

কথা বলার সক্ষমতা মানুষের জন্য বিরাট গুণ। সুতরাং অসঙ্গত কথা বলে তুমি নিজের মর্যাদা হ্রাস করো না।

ভাষা ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের সাথে সভ্যতার আমদানী হয়

প্রতিটি দেশের যেমন নিজস্ব ভাষা রয়েছে, তেমনি সে দেশের কিছু উৎপাদন রয়েছে, যাকে আমরা উৎপাদিত পণ্য বলে থাকি। ভাষা এবং উৎপাদিত পণ্যের সাথে সে দেশের কৃস্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকে। ভাষা এবং পণ্যের সাথে সে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও অন্য দেশে রফতানী হয়। তাই কোনো দেশের ভাষা গ্রহণ করতে খুব সতর্ক ও সাবধানী হতে হবে।

মিশকাত শরীফের একটি হাদীসে এ প্রসঙ্গটির প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি এই–

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ قَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهَا يُؤَيِّدُ اللهُ لَكُمْ بِهَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي البِلَادِ .[71]

হযরত আলী রা. বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছিল একখানা আরবী নমুনার তৈরি ধনুক। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, অন্য আরেক লোকের হাতের একখানা পারস্যের ধনুক। তখন তিনি বললেন, তোমার হাতে এটা কী? ওটা ফেলে দাও। তোমাদের উচিত যে, তোমরা এই জাতীয় আরবী ধনুক ব্যবহার কর। আর উন্নতমানের বর্শা ব্যবহার কর। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দীনের রাস্তায় মদদ করবেন এবং বিভিন্ন শহরে-নগরে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ভাষার ক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহপাক মানুষকে কথা বলার জন্য মুখ দিয়েছেন। তাই বলে সে যা ইচ্ছা তাই বলবে—এমন স্বাধীনতা আল্লাহপাক তাকে দেননি; বরং

---

৭২. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৯১

যবান হেফাজতের ব্যাপারে খুব কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। এ যবানের দ্বারাই মানুষ জাহান্নামে যাবে—এটাও সুস্পষ্ট। বিভিন্ন কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে। তন্মধ্যে একটি বড় কারণ হল যবান। যেসব কথা আমরা ভালো মনে করেই বলি এবং ভালো উদ্দেশ্যেই বলি, ওখানেও কথা বলার ক্ষেত্রে, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন ও কিছু সভ্যতার বিষয় রয়েছে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের ব্যবহৃত শব্দের উপর আপত্তি করেছেন, বাধা দিয়েছেন। বলেছেন, এটা বলবে না। অনেকের নাম শুনে নাম বদলে দিয়েছেন। গোত্রের নাম, কবীলার নাম, পাড়া-মহল্লার নাম বদলে দিয়েছেন। কারণ, ঐ নামগুলো ইসলামী সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব ব্যাপারে আমাদের ফিকির নেই।

শব্দের উপর শরীয়তের অনেক হুকুম জারী হয়

শব্দের উপর শরীয়তের অনেক হুকুম জারী হয়। নিয়ত না থাকলেও হুকুম বর্তায়। যেমন- এক ভদ্র লোক একদিন আমার কাছে এসে বললেন, হুজুর! আমি আমার স্ত্রীকে এ পর্যন্ত কয়বার তালাক দিয়েছি—তা আমিও বলতে পারব না, আমার স্ত্রীও বলতে পারবে না। কারণ আমি মনে করতাম মানুষকে গালি দেওয়া যেমন নিষেধ, তালাক দেওয়াও এমন পর্যায়ের নিষেধ। অন্যান্য গালির মত তালাককেও গালি মনে করতাম। কিন্তু এর দ্বারা যে বিবি হারাম হয়ে যায়–বিষয়টি এত গভীরে গিয়ে চিন্তা করিনি বা বুঝতে পারিনি। শুধু এতটুকু জানা ছিল যে, এ শব্দটি বলা যায় না বা বলা ঠিক না। কিন্তু এটা বললে বিবাহই থাকে না, এমনটা জানতাম না। এখন 'বেহেশতী যেওর' কিতাব পড়ে দেখি অবস্থা খুবই খারাপ। এখন ফায়সালা কী হবে? আমি বললাম, ফায়সালা তো শব্দের উপরই হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়তের ধর্তব্য হবে না। আপনি *বেহেশতী যেওর* পড়ে যেমনটি বুঝেছেন, আমি কি এর ব্যতিক্রম বলতে পারব? বিষয় এটাই।

এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে শব্দের সাথে সম্পৃক্ত।

মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন আদর্শ হিসেবে। একজন মানুষ 'মানুষ' হতে হলে কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয়, কিভাবে 'মানুষ' হওয়া যায় এর নমুনা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেসালাতের তেইশ বছর জীবনের মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোকে আমরা গুরুত্ব দেই না। অথচ সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এখন এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী মনে করছি। এজন্য আমাদের আলোচ্যসূচির মধ্যে এমন কিছু বিষয় দেয়া হয়েছে যেগুলো সাধারণত ওয়াজ-মাহফিলে আমরাও বলি না এবং বলার পরিবেশও হয়ে উঠে না। অথচ বিষয়গুলো মানুষের জন্য খুব বেশি প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে একটি বিষয় হল পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার। বিষয়টি হয়ত আপনাদের কাছে নতুন ও অদ্ভূত মনে হবে। অদ্ভূত হলেও খুবই জরুরী। তাই ধৈর্য সহকারে শুনুন।

কিছু উপমা

কিছু কিছু শব্দ এমন রয়েছে যেগুলোর অর্থ তেমন খারাপ নয়, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সেগুলো বলতে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া কিছু শব্দ এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসেনি কিন্তু ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও শরঈ নীতিমালার আলোকে সেগুলো ব্যবহার করা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। এখন এ জাতীয় কিছু শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে–

১. ইহুদীদের ছলচাতুরী : মদীনার ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে যেত, কথা-বার্তা শুনত। আরবীতে একটি শব্দ আছে اُنْظُرْنا যার অর্থ হল আমাদের প্রতি লক্ষ রাখুন। এ ভাবটি প্রকাশ করার জন্য আরেকটি শব্দ রয়েছে رَاعِنَا যার অর্থও আমাদের প্রতি লক্ষ করুন। কিন্তু এ শব্দটির মাঝে আরেকটি খারাপ অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি হল আমাদের রাখাল। ইহুদীরা নবীর দরবারে এসে মুখে رَاعِنَا শব্দটি বলত কিন্তু মনে মনে খারাপ অর্থটির নিয়ত করত। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত তোমরা যে অর্থে ব্যবহার কর আমরাও সে অর্থেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল নবীকে ব্যঙ্গ করা। যেহেতু

এ رَاعِنَا শব্দের মধ্যে একটি খারাপ অর্থের সুযোগ রয়েছে, তাই আল্লাহ পাক সেটি ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا [72]

হে মুমিনগণ! তোমরা 'রাঈনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো।

যদিও দু'টি শব্দের একই অর্থ এবং কোনো একটি অর্থ বাহ্যত অসুবিধাজনকও নয় তারপরও যে কোনো একটির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ, উক্ত শব্দটি ব্যবহারে অন্তরে কোনো দুষ্টামী জন্ম নিতে পারে। ভিতরে নেফাক জন্ম নিতে পারে। নেফাক মানে উপরে একটা ভিতরে আরেকটা। ঐ শব্দটি ব্যবহারে এ ধরনের ভাব সৃষ্টি হতে পারে, যা দ্বারা একজন মানুষ মানুষের কাতার থেকে ছিটকে পড়ে।

২. মানুষের মন্দ নাম : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের নাম জিজ্ঞেস করতেন। নামটি সুন্দর অর্থবোধক হলে কিছু বলতেন না। আর যদি অসুবিধাজনক হত তাহলে নাম পাল্টে দিতেন। কারণ, নামের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামগুলো পরিবর্তন করেছেন সেগুলো দুই ধরনের। জাহেলী যুগে নাম রাখার ক্ষেত্রে মানুষের দুই রকমের দর্শন ছিল। কেউ কেউ মনে করত আমার সন্তানের নাম রাখব খুব খারাপ, তবে সে কাজ-কর্মে নিজেকে ভালো প্রমাণ করবে। তাই নাম রাখত- কালব (কুকুর) গোরাব (কাক) ইত্যাদি। হাদীসে এ ধরনের অনেক নাম পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের এ ধরনের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তো জাহেলী যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সন্তানের নাম রাখব খারাপ কিন্তু কাজে-কর্মে সে নিজেকে ভালো প্রমাণিত করবে। নামে নয়, গুণে পরিচয়। আবার অনেকের নাম রাখা হত ভালো, কিন্তু তাতে শিরকের মিশ্রণ থাকত কিংবা সেটি দ্বারা অহংকার প্রকাশ পেত। যেমন- মালিকুল মুলুক, শাহেনশাহ, রাজাধিরাজ, বাররা (পবিত্র)। এ ধরনের অনেকে নামও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন করেছেন।

৭৩. সূরা বাকারাহ : ১০৪

মানুষ 'মানুষ' হতে হলে তার মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা ভালো হতে হবে। মানুষের নাম যেমন কুকুর এবং কাক রাখা শোভনীয় নয়, তেমনি খারাপ গুণাবলী প্রকাশক নামও রাখা উচিত নয়। অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে এমন নাম রাখলে ব্যক্তির মাঝে অহংকার ও দম্ভ সৃষ্টি হবে। এটা তো মানুষের স্বভাবের পরিপন্থী। এজন্য এ ধরনের নাম রাখারও অবকাশ নেই।

একজনের নাম ছিল 'হুযন' (দুঃখ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ নাম পরিবর্তন করে আরেকটি সুন্দর নাম রাখতে চাইলে সে বলল, আমার মা-বাবা এ নামটি রেখেছেন, আমি এটা পরিবর্তন করতে রাজী নই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, তোমার এ নামই থাকুক। কিন্তু পরিণাম ভালো হয়নি। তার জীবনে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট লেগেই ছিল।

এক সাহাবিয়্যার নাম ছিল 'আছিয়া' যার অর্থ অবাধ্য-নাফরমান। তখন নবীজি তার নাম রাখলেন 'জামীলা' যার অর্থ 'সুন্দর'।

আরেক মহিলা সাহাবীর নাম ছিল বাররা। যার অর্থ হল পাপমুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামটি শুনে বললেন, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। তারপর বাররাহ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।

৩. পারস্যের তরুণ : এক যুদ্ধের ঘটনা। যুদ্ধ চলছে। এক মুসলিম সৈনিক দুশমনের উপর আক্রমণ করে বীরত্ব প্রকাশার্থে বলে উঠল– خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسُ 'একজন পারস্য তরুণের পক্ষ থেকে এ হামলা গ্রহণ কর।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথা শুনে বললেন, এ কথা বলো না, বরং বলো, وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارُ আমি আনসারী তরুণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এ শব্দটি বলতে নিষেধ করেছেন? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, তখন পারস্য সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর পরাশক্তি। পারস্যের সাথে সে লোকটির বংশীয় বা জন্মগত সম্পৃক্ততা ছিল বিধায় সে বলেছে- আমি পারস্য তরুণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলতে নিষেধ করার কারণ হল

তখনও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে আসেনি। সেটা ছিল ইসলামবিরোধী বড় ধরনের শক্তি। তাই সাহাবীকে ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে সম্বন্ধ না করে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ পক্ষ আনসারীদের সাথে সম্পৃক্ততার ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ করেছেন। কারণ ফারেস শব্দটি তখন একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি লালন করত। এ শব্দের পথ বেয়ে যদি মুসলমানদের মাঝে সে সংস্কৃতির প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি হয় তাহলে তা তাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হবে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে শব্দটি উচ্চারণ করতেই নিষেধ করে দিয়েছেন।

আমরা এ বিষয়টি বুঝি আর না বুঝি ইসলামের দুশমনরা এটা খুব ভালোভাবে বোঝে। কোন সময় কোন শব্দের প্রচার করতে হবে এবং কখন কোন শব্দকে ঘৃণিত করে তুলতে হবে সেটা তারা খুব ভালোভাবে জানে।

৪. বস্তুর নামে বিলাতি শব্দ : ভাষা সভ্যতাকে লালন করে এর একটি উদাহরণ হল 'বিলাতি' শব্দটি। ভালো ভালো জিনিসের সাথে বিলাতি শব্দ যুক্ত রয়েছে। এটা একটা সভ্যতাকে লালন করে। এ সভ্যতাটা যেন হারিয়ে না যায় এজন্য এ নামটি বিভিন্ন ভালো জিনিসের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। বিলাত তো হল বর্তমান লন্ডনের পুরাতন নাম। একসময় আমাদের এ দেশ ব্রিটিশ খ্রিস্টানরা শাসন করেছে। তাদের রাজধানী হল বিলাত। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি জিইয়ে রাখার জন্য তারা এ অঞ্চলের ভালো ভালো জিনিসগুলোর নাম রেখেছে বিলাতি। যেমন বিলাতি পাতা, বিলাতি আলু, বিলাতি গাব।

আমাদের দেশে দুই রকমের গাব রয়েছে। একটা হল সাধারণ গাব, যেটা গ্রামের মানুষ খায় না। আরেক রকম হল, বিলাতি গাব। হালি বা কেজি হিসেবে বেশ দামে বিক্রি হয়। গ্রাম-শহর সব জায়গার মানুষই খায়। পাকলে খুব ঘ্রাণ বের হয়। দেখতেও খুব সুন্দর।

চিন্তার ব্যাপার হল এ বিলাতি গাব ও পাতা সে দেশে (লন্ডনে) নেই। এগুলো আমাদের দেশেই হয়। এমনও নয় যে, সে দেশের বীজ এনে এ দেশে চাষ করা হয়।

আমাদের বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব এ কে. এম ফজলুল হক সাহেব প্রথমে যখন বিলেত যান তখন সেখানকার বিভিন্ন বন-জঙ্গল ও গার্ডেন ঘুরে ঘুরে গাব গাছ খুঁজেছেন। কিন্তু কোথাও গাব গাছ দেখতে পাননি। তখন তিনি ভাবতে শুরু করলেন—আমাদের দেশের ভালো জাতের গাবটির নাম কেন বিলাতি গাব নাম রাখা হল? বিলাতে তো এ গাছ নেই। দেশে ফিরে আলেম-উলামাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। আলেম-উলামারা তাকে জানিয়েছেন যে, এটা একটা গভীর চক্রান্ত। বিলাতের প্রতি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টির জন্য উন্নত বড় ও ভালো ভালো জিনিসের সাথে বিলাতি শব্দটি যোগ করা হয়েছে। যাতে বিলাতের বড়ত্ব ও মহব্বত মানুষের দিলে অটোমেটিকভাবে ঢুকে যায়। এজন্য যত ভালো জিনিস রয়েছে তার নাম হল বিলাতি।

৫. বস্তুর নামে রাম শব্দ : এমনিভাবে এ দেশে যখন হিন্দু সভ্যতার প্রভাব ছিল, তখন এসব ক্ষেত্রে রাম শব্দটি ব্যবহার করা হত। ভালো দামি বড় উঁচু ও লম্বা যত জিনিস ছিল সেটার সাথে 'রাম' শব্দটি যোগ করা হত। যেমন রামছাগল, রামদা, রামসাগর, রামদীঘি ইত্যাদি। এটাকে বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এটা একটা যুদ্ধ। আমরা অনুভব করি বা না করি, শব্দের বিরাট প্রভাব রয়েছে। মানুষের আদর্শ ও কালচার সুন্দর ও অসুন্দর বানানোর ক্ষেত্রে বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বা ডিভাইড (পার্থক্য) করার ক্ষেত্রে এর অনেক বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। আমাদের কাছে ক্ষুদ্র মনে হলেও আদতে বিষয়টি ক্ষুদ্র নয়।

৬. সিনেমার নাম পাপ শো : আল্লামা তকী উসমানী দা. বা. একবার ঢাকায় এসেছিলেন। তখন সুধীসমাজকে নিয়ে একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে আমিও ছিলাম। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ফাঁকে তিনি এ বিষয়ে কিছু কথা বললেন। বললেন, পাকিস্তানের একটি সংস্থা বিনোদনের নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। একটা প্রোগ্রামের নাম দিয়েছে পাপ-শো। তিনি বিশ্লেষণ করে বলেন, এ নামটা দেয়ার নেপথ্য কারণ হল, পাপ হিসেবে মানুষ কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকতে চায়। পাপ শব্দটার প্রতি মানুষের সহজাত যে ঘৃণাবোধ রয়েছে সেটা দূর করার জন্য এমনটি করা হয়েছে।

৭. মাওলানার নামে স্টেডিয়াম : মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের একজন বড় নেতা ছিলেন। বাস্তবে তিনি মাওলানা ছিলেন না কিন্তু তার নামের সাথে মাওলানা যুক্ত হয়েছে। জাতীয় ব্যক্তি হিসেবে তার নামটা অন্য কোথাও রাখা হলে ভালো হত। কিন্তু তার নামটা রাখা হয়েছে একটা স্টেডিয়ামে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্টেডিয়াম। আলেম-উলামারা যাতে খেলাধুলার বিরুদ্ধে ওয়াজ-নসীহত করতে না পারে এজন্য স্টেডিয়ামের নামই রেখে দিয়েছে মাওলানার নামে। তার নাম দিয়ে কোনো হাসপাতাল বা সেতুর নামকরণ করা যেত। কিন্তু তা না করে তাকে স্থান দেয়া হয়েছে স্টেডিয়ামে, বলুন তো এ থেকে কী মন-মানসিকতা পয়দা হবে? মাওলানাদের সাথে আর স্টেডিয়ামের সাথে যেন দূরত্ব কমে যায়। কোনো ভেদাভেদ না থাকে।

দুনিয়া এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বলতে কিছু থাকছে না। জাতিসংঘের সিডো নামে একটি সনদ রয়েছে। নারীনীতি নিয়ে ঝামেলার সময় সেটি আগাগোড়া পড়েছি। সে সনদের আসল উদ্দেশ্য হল নারী-পুরুষ বলতে কোনো ব্যবধান এবং ভেদাভেদ বলতে কিছুই যেন না থাকে আর পৃথিবীর অবস্থাটা যেন এমন হয় যে, মানুষ বিবাহ-শাদীর নামও না নেয়। বিবাহ-শাদীর কাজ বিবাহ-শাদী ছাড়াই চলবে। তাহলে তাদের দৃষ্টিতে ভালো হবে। সে সনদে বিবাহ-শাদীর জন্য অনেক কঠিন কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে মানুষ সে দিকে অগ্রসর না হতে পারে। গোটা সনদের মধ্যে এমন একটা শব্দও নেই যেখানে বিবাহ-শাদী বা পারিবারিক জীবনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভালো বুঝতেন যে, উম্মত কোন পথে ধ্বংস হবে। আমরা যদিও এসব বিষয়কে একেবারে গুরুত্বহীন ও মামুলি মনে করি; কিন্তু আসলে এগুলো আদৌ মামুলি নয়; বরং এগুলোর কুফল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এজন্য শব্দ ব্যবহার বুঝে শুনে করতে হবে।

৮. প্রেম শব্দটি আবেদন হারিয়ে ফেলেছে : এমন একটি শব্দ হল 'প্রেম'। অভিধান ঘাটলে এর তেমন খারাপ কোনো অর্থ পাবেন না। প্রেম অর্থ- মহব্বত, মায়া, মমতা ইত্যাদি লেখা থাকবে। কিন্তু এখন এ শব্দটি অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে হতে একটা গান্দা শব্দে পরিণত হয়েছে। এটা বললেই এখন যেহেন অন্য দিকে চলে যায়। এজন্য এ শব্দটি এখন মুসলমানদের মুখে বিশেষভাবে উলামায়ে কেরামের মুখে আসা উচিত নয়।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত, মা-বাবার মহব্বত এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে 'মহব্বত' শব্দটি উপযুক্ত। এখানে ঐ শব্দটি বলার প্রয়োজন নেই। মহব্বত বললেই মানুষ বোঝে। মায়া ও মমতা বললেও বোঝে। প্রেম শব্দটি বর্তমানে তার মূল পজিশনে নেই। কারণ, বর্তমানে এ শব্দটি ছেলে-মেয়েদের বিবাহ-শাদী বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ককেই বোঝায়। অহরহ মানুষ বলে থাকে অমুকে প্রেম করে বিবাহ করেছে। শব্দটি উচ্চারণ করতে আমার খুব ঘৃণা লাগছে। তবুও বোঝানোর স্বার্থে উচ্চারণ করতে হচ্ছে।

৯. দোশীযা : হযরত থানভী (রহ.)-এর এক মুরীদ হযরতের নিকট পত্র লিখে নিজের অবস্থা জানিয়েছেন। পত্রে তিনি তার ছেলের মৃত্যু ও বিধবা পুত্রবধূর অবস্থা তুলে ধরেছেন। পত্রে পুত্রবধূর অবস্থা লিখতে গিয়ে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা একজন শ্বশুর তার পুত্রবধূর ব্যাপারে বলতে পারেন না। শব্দটি হল 'দোশীযা' যার অর্থ- কুমারী। এর একটা উদাহরণ দিই। কেউ যদি তার পুত্রবধূর ব্যাপারে কারো কাছে বলে যে, মেয়েটা খুব ভালো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। অথবা যদি বলে বউমা খুব ভালো, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কেউ যদি পুত্রবধূর স্থলে রমণী শব্দ ব্যবহার করে আর বলে রমণীটা খুব চমৎকার! তাহলে কেমন লাগবে। এ রমণী শব্দের মধ্যে ভেজাল আছে। মেয়ে বা পুত্রবধূ শব্দটি যে নিষ্কলুষ অবস্থা বোঝায়, রমণী শব্দটি তা বোঝায় না। কারো কাছে ধরা না পড়লেও যারা দিলের ডাক্তার তাদের কাছে এগুলো ধরা পড়ে। এজন্য শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

হযরত থানভী (রহ.) চিঠি পাঠ করার পর জবাবে লিখেন- তুমি আমার এ পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামানাপত্রসহ আমার খানকায় চলে আসবে। হযরত থানভী (রহ.) মুরীদের চিঠির শব্দ থেকে বুঝে

ফেলেছেন যে, এ লোকের ভিতরে দুষ্টুমী কাজ করছে। না হয় সে তার পুত্রবধূর ব্যাপারে অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে দোশীযা শব্দ ব্যবহার করবে কেন? শব্দ দেখেই বুঝে নিয়েছেন মুরীদের ভিতরে দুষ্টুমী কাজ করছে।

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش
من انداز قدت را می شناسم
যে রঙেরই পোশাক তুমি করো পরিধান
বুঝতে পারি আমি তব দেহের পেহচান

পীর সাহেবের জরুরী নির্দেশ জারী হয়েছে যে, তোমার দিলে শয়তানী ঢুকেছে—এর চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ৪০ দিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

১০. 'উকিল বাবা' একটি আপত্তিকর শব্দ: বাবা একটি পারিভাষিক শব্দ। যাকে তাকে বাবা বলা যায় না। বিবাহের মধ্যে একজন উকিল হয়েছে বিধায় তাকে বাবা বলা যাবে না। কারণ, বাবা শব্দের নির্ধারিত অর্থ রয়েছে। কেউ যদি কারো বাবা হয় তাহলে তার স্ত্রীর সাথে সে দেখা দিবে, যেহেতু মা, তার মেয়ের সাথে দেখা দিবে, যেহেতু বোন। এরা অনেক হারাম জিনিসকে হারাম মনে করবে। উকিল তো উকিল। উকিল আবার বাবা হয় কীভাবে? বিবাহের জন্য অন্যকে উকিল বানাতেই হবে–এটাও ভালো কথা নয়। এসব রেওয়াজ ঠিক নয়। মেয়েকে তার বাবা নিজে বিবাহ দিয়ে দিবে। বাবা মজলিসে ছেলেকে বলবে আমার মেয়েকে তোমার কাছে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এতেই বিবাহ হয়ে যাবে। উকিল বাবা বানানোর কী প্রয়োজন রয়েছে। বাবা জীবিত কিংবা উপস্থিত না থাকলে ভাই বিয়ে পড়িয়ে দিবে। চাচা কিংবা মামা, যাদের পক্ষে দেখা দেয়া জায়েয তাদের যে কেউ অনুমতি এনে বিবাহ পড়িয়ে দিবে। এরা কেউ উকিল হওয়ার কারণে বাবা হতে পারবে না। এজন্য এসব শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। এগুলোর দ্বারা দীনি ক্ষতি হয়।

১১. ঘরে প্রবেশের অনুমতিজ্ঞাপক শব্দ : ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের জন্য একটি সালাম দিতে হয়। এর নাম অনুমতি সালাম। এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের পূর্বে এই

অনুমতি সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন- أَلِجُ (আমি কি প্রবেশ করতে পারি?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন أَلِجُ না বলে أَدْخُلُ বলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন শব্দটি পরিবর্তন করে দিলেন? অথচ উভয়টি সমার্থবোধক শব্দ। এর কারণ হলো أَلِجُ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আর أَدْخُلُ প্রশস্ত জায়গায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মুসলমানের ঘর কোনো সংকীর্ণ জায়গা নয়। ছোট হলেও সেটি প্রশস্ত। এ ঘরে সকলের আগমনের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং কেউ أَلِجُ বললে বোঝা যায় যে, সে কোনো সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তার অনুমতির এ শব্দটির মাঝে ভালো লক্ষণ নেই। সংকীর্ণতা বা কোণঠাসা মনোভাব নিয়ে কারো ঘরে যাওয়া উচিৎ নয়। কারো ঘরে প্রবেশ করে কাউকে সংকীর্ণ ও কোণঠাসা করে তোলাও ভালো নয়। তাই শব্দ ব্যবহারে সচেতন হতে হবে।

১২. অবাধ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার : আমরা তো অহরহ অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে ফেলি। একটু চিন্তা-ভাবনা করা চাই যে, আমি যে শব্দটি ব্যবহার করছি তাতে কোনো সমস্যা আছে কি-না। অনেক সময় তো অর্থ ভালোভাবে না বুঝেই ব্যবহার করতে থাকি আর মানুষের হাসির পাত্র হতে থাকি। যেমন 'কতিপয়' একটি শব্দ। এটি এক ব্যক্তি শুনেছে। মনে করেছে এটি সম্মানসূচক শব্দ হবে হয়ত। বাবার কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে লিখেছে– ''আমার কতিপয় আব্বাজান! আশা করি ভালোই আছেন।'' এবার চিন্তা করুন তো আব্বাজান যদি কতিপয় হয় তাহলে কী অবস্থা হবে? সুতরাং শব্দের প্রকৃত মর্ম না বুঝে ব্যবহার শুরু করলে এমনই হবে।

কিছু শব্দ তো এমন রয়েছে যেগুলো একমাত্র সে ভাষাভাষীদের কালচারের সাথেই প্রযোজ্য। চিন্তা করতে হবে। আমি মুসলমান হিসাবে আমার সভ্যতার সাথে শব্দটি সঙ্গতিপূর্ণ, নাকি এর মাঝে ভেজাল আছে। বিধর্মীদের পারিভাষিক শব্দ আমার সভ্যতার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কেবল সম্ভাবনাই নয়; বরং সাংঘর্ষিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, ভাষা তো হলো মনের ভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম। আর মনের ভাব তো মানুষের

স্বভাব, চরিত্র ও সভ্যতা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্বভাব ও চরিত্রটাই ভাষা হয়ে জন্ম নেয়। পারিভাষিক শব্দগুলো তো স্বভাব ও সভ্যতার আলোকেই আসবে। এজন্য মুসলমানদের পরিভাষা এখানে কোনটা হওয়া চাই—এ ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক হওয়া চাই।

১৩. মাংস : এ ধরনের একটি শব্দ হল মাংস। গোশত আর মাংসের ক্ষেত্রে চিন্তাগত ও বিশ্বাসগত বিরাট ব্যবধান রয়েছে। একটি শব্দে দেবতা হওয়ার ঘ্রাণ রয়েছে, আরেকটিতে তা নেই। তাই বলি, একটা শব্দকে সুন্দর মনে করেই ব্যবহার করা উচিত নয়; বরং তার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে—এটা মাথায় রেখে ব্যবহার করতে হবে। আর ভিন্ন সভ্যতার শব্দে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকাটাই স্বাভাবিক।

দোস্ত! আদর্শ মানুষ হতে হলে শব্দ ব্যবহারেও সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। এগুলোকে মামুলি মনে করা যাবে না। কোন শব্দ ব্যবহার করলে আমার ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষা পাবে আর কোনটি বললে ক্ষুণ্ন হবে এদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আর আমলের আগে ইলম জরুরী, এ বিষয়ে আমাদের ইলমই নেই। ইলম থাকলেই তো আমল করব, এজন্য বলি, ইলমেরও প্রয়োজন, আমলেরও প্রয়োজন। *

.....

* ২০০৮, ২০০৯ ও ২০০৭ ঈ. সালে ফুলছোঁয়ার বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত বয়ানের সমষ্টি।

মুসলিম পারিবারিক জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .[73]

وَقالَ تَعَالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .[74]

وَقالَ تَعَالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .[75]

وَ قَالَ النبى ﷺ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ . سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

বাদ ফজরের আমল ও একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লাহপাক পরওয়ারদেগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া ফযল ও করম—তিনি আমাদেরকে ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। ফজরের নামাযান্তে নামাযের হালতে শুধু বসে থাকাও একটি দামি আমল। এ সময় দীনি কথা আলোচনা করাও ভিন্ন একটি আমল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর মসজিদে বসতেন। আমরা অনেকেই জানি সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকা তারপর দুই রাকাত নফল নামায পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। কোনো সাহাবী তার স্বপ্নের কথা বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবীর (ব্যাখ্যা) দিতেন। আবার কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোনো স্বপ্নের কথা বলতেন। অনেক সময় এমনিতেই আলোচনা শুরু করতেন।

---

৭৪. সূরা আলে-ইমরান : ১০২
৭৫. সূরা নিসা : ১
৭৬. সূরা আহযাব : ৭০

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের আলোচনা করতে যেয়ে বলেন, সর্বপ্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। কেননা কালিমা শরীফে বলা হয়েছে– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ অর্থাৎ কিছু থেকে কিছু হয় না, যা কিছু হয় একমাত্র আল্লাহ পক্ষ থেকেই হয়।

লক্ষ্য করুন, উপরে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর যে অর্থটি করা হয়েছে তা হাকীকতের দিকে লক্ষ্য করে এবং ব্যকরণের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে 'কিছু থেকে কিছু হয় না' এটাই হল لَا اِلٰهَ-এর অর্থ। যা কিছু হয় তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এটা اِلَّا اللهُ-এর অর্থ। اِلَّا اللهُ-এর অর্থ এমন বলা হয়নি যে, শুধু আল্লাহ থেকে। বরং বলা হয়েছে যা কিছু হয় সব আল্লাহ থেকে হয়। এটা হল اِلَّا اللهُ -এর অর্থ। আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে কিছু থেকে কিছু হয় না যা কিছু হয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আমাদের সুখ-দুঃখ, উপকার-অপকার সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আমরা চোখে যা দেখি এগুলো উপকরণ বা মাধ্যম। এ উপকরণগুলো হল একটি পর্দা। আর এটাই হল পরীক্ষা। এটা না হলে কোনো পরীক্ষাই ছিল না। আল্লাহপাক যদি সবাইকে সরাসরি রিযিক প্রদান করেন, মধ্যখানে কোনো মাধ্যম ছাড়া, তাহলে পরীক্ষার কিছু থাকত না। ঈমান বিলগাইব বা অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস হত না। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা আসবাব, উপকরণ ও মাধ্যমের পর্দা দিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত পর্দার আড়ালে কাজ করছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

کارِ لیلی نیست، ایں کار من است
حسن لیلی عکس انوار من است
এটা হল আমার কাজ, লায়লার কাজ নয়
আমার নূরের আলো দ্বারা লায়লা রূপময়

দুনিয়ার সকলে দেখতে পায় যে, উপকরণ ও মাধ্যমে সব হচ্ছে কিন্তু যাদের ঈমানী দৃষ্টি রয়েছে তারা দেখেন যে, মূলতঃ সব আল্লাহই করছেন।

যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের আলোচনা করছিলেন। এক সাহাবী বলে উঠলেন, হুজুর! আপনি যে

বললেন, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না, এ প্রসঙ্গেই আমার জীবনে একটি ঘটনা রয়েছে। জাহিলী যুগের ঘটনা। তখন মূর্তিপূজা করতাম। একবার সামুদ্রিক সফরে গেলাম। সফর খুব দীর্ঘ ছিল। এত দীর্ঘ হবে ভাবতে পারিনি। আমাদের সাথে যেসব খাদ্য ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। খাবারের মত কোনো দ্রব্য আমাদের সঙ্গে নেই। খুবই কঠিন অবস্থা। তখন আমরা সফরে যাওয়ার সময় একটি মূর্তি সাথে নিয়ে যেতাম। এ সফরেও আমরা একটি মূর্তি নিয়ে বের হয়েছিলাম। আমরা সবাই মূর্তির কাছে প্রার্থনা করলাম হে দেবতা! আমাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে, তুমি খাবারের ব্যবস্থা কর। মূর্তি কোনো জবাব দিচ্ছে না। ঘটনাক্রমে সে মূর্তিটি ছিল আটার খামীরা দিয়ে তৈরি। মূর্তি যেহেতু খাবারের ব্যবস্থা করছে না এবং ক্ষুধাও খুব প্রবল তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মূর্তিটি গুঁড়ো করে পানির সাথে গুলিয়ে খেয়ে ফেলি। সমুদ্রে তো আর পানির অভাব নেই। মূর্তিটি গুঁড়ো করে পানির সাথে গুলিয়ে খেয়ে ফেললাম। এবার বুঝুন দেবতার অবস্থা কী? দেবতা তার উপাসনাকারীদের কী কাজে আসে তার বাস্তব প্রমাণ আমাদের সামনে। আল্লাহপাক কুরআন কারীমে দেবতাদের অসহায়ত্বের কথা খুব চমকপ্রদভাবে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۔ [76]

মশা-মাছি যদি তাদের সম্মুখে রাখা খাদ্যদ্রব্য থেকে কিছু নিয়ে যায় তারা রক্ষা করতে পারে না।

তো বলছিলাম, ফজরের পর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বসতেন। আলোচনা করতেন। হাসাহাসিও করতেন। সে হিসেবে ফজরের পর বসা সুন্নত। কোনো আলোচনা না হলেও এটি একটি পুণ্যময় আমল।

সন্তান বালেগ হয় কখন

মানুষের জীবনের কয়েকটা অংশ বা অধ্যায় রয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে মানব জীবন। একজন মানুষ চাই সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক, আল্লাহ পাকের নেজাম হল যখন তার বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হবে সে

---

৭৭. সূরা হজ্ব : ৭৩

বালেগ হয়ে যাবে। শরীয়ত তাকে বালেগ হিসেবে গণ্য করবে। হ্যাঁ, কেউ এর আগেও বালেগ হতে পারে। মেয়ে নয় বছরেই বালেগা হয়ে যেতে পারে। এজন্য নয় বছর পূর্ণ হলেই মেয়েদের পর্দা করতে হবে। ছেলে ১২ বছরে বালেগ হতে পারে। আর এ বছরগুলো সৌর বছরের হিসাবে নয়, ৩৬৫ দিনের বছর অনুযায়ী নয়; বরং ৩৫৪ দিনের বছর অনুযায়ী। চাঁদের হিসাব অনুযায়ী। এভাবে ১২ বছর হলে বালেগ হয়ে যেতে পারে। তবে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর বালেগ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও বালেগ ধরা হবে।

সন্তান বালেগ হওয়ার সাথে শরীয়তের অনেক বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা অনেক বিষয়ে অবহেলা করি। আমরা আমাদের সন্তানদের জন্ম তারিখ লিখে রাখি না। এটা লিখে সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ, যে দিন তার বয়স ১৫ বছর হবে সেদিন থেকে সে বালেগ হবে। তার উপর পর্দার বিধান প্রযোজ্য হবে।

মীরাছ বণ্টনের ইসলামী নীতি

একজন লোক মারা গেছে। তার অনেক রকমের সম্পদ রয়েছে। নগদ টাকা-পয়সাকে তো আমরা সম্পদ মনে করি। এ ছাড়া আরো অনেক জিনিসকে সম্পদ বলা হয়। যে কাপড়টি পরা অবস্থায় সে মারা গেছে সেটাও তার সম্পদ। যেসব কাপড় তার গায়ে নেই, বাইরে আছে সেগুলোও তার সম্পদ। যেমন লুঙ্গি, শার্ট, প্যান্ট, পায়জামা–এগুলো সবই সম্পদ। একজন মানুষের কিছু না কিছু সম্পদ থাকেই। একটা লুঙ্গি বা গামছা হলেও থাকে। মরার সময় যেটা গায়ে ছিল সেটাও তো সম্পদ।

যাই হোক, সম্পদ বেশি থাকুক বা অল্প থাকুক এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা কী? মরার সাথে সাথে ওয়ারিশগণ সকল সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় জবরী ও এজতেরারী মালিকানা। কেউ যদি বলে আমি মালিক নই, বাবার সম্পত্তি আমি নিব না, তবুও সে মালিক। বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে সে মালিক হয়ে গেছে। এখন সে তার মালিকানা শেষ করতে হলে কিংবাসম্পদ নিতে না চাইলে অন্যদেরকে হেবা করে দিতে হবে অথবা বিক্রি করে দিতে হবে। চাই

আপনজনের কাছে বিক্রি করুক বা অপরের কাছে বিক্রি করুক। অন্যথায় মালিকানা শেষ হবে না।

মনে করুন, ওয়ারিশদের মধ্যে সবাই বালেগ কিন্তু একজন নাবালেগ। এই একজন না বালেগ হওয়ার কারণে মাসআলা ভিন্ন রকম হবে। সবাই বালেগ থাকলে খুব সহজ ছিল। সবার সম্মতিতে যে কোনো কাজ করা যেত। যেমন কেউ চাইল বাবার সম্পত্তি থেকে দান করবে, গরীব-মিসকীনকে খাওয়াবে তাহলে ওয়ারিশগণ সবাই সম্মত হলে করতে পারবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন সদস্য নাবালেগ হলে এমনটি করা যাবে না। যদি করতে হয় তাহলে সব সম্পদ থেকে নাবালেগের অংশটা আলাদা করে নিতে হবে। এমনকি মায়্যেতের গায়ে যে গেঞ্জি ছিল সে গেঞ্জিটার মধ্যে নাবালেগের যে অংশ রয়েছে তাও বের করতে হবে। গেঞ্জির অংশ বের করবে কিভাবে? মনে করুন গেঞ্জির দাম পঞ্চাশ টাকা। নাবালেগের অংশ পাঁচ টাকা। এ পাঁচ টাকা অন্যখান থেকে দিয়ে দিবে। তারপর অন্যরা সম্মত হয়ে এ গেঞ্জি কাউকে দান করতে চাইলে দান করতে পারবে।

এরকমভাবে সন্তান বালেগ হওয়া বা নাবালেগ হওয়ার উপর শরীয়তের আরও অনেক বিষয় নির্ভর করে। এটাও আমাদের একটা বড় ধরনের উদাসীনতা। আমরা এসব বিষয়ে খেয়াল করি না। যার কারণে শরীয়তের অনেক বিষয় আমাদের দ্বারা লঙ্ঘিত হচ্ছে।

আমাদের জীবনে শান্তি কিভাবে আসবে। আমরা যতটুকু শান্তি পাচ্ছি তার পুরোটাই মাওলার দয়া। আমরা যে দিকেই হাত দেই দেখি কোনো দিকেই আমাদের চালান নেই। বাস্তবেই নেই। আরও কত রকম সমস্যা রয়েছে তার হিসাব নেই।

বিবাহ : পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তি

পরিবার বলতে আমরা বুঝি স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদী, মা-বাবা তথা একান্নভুক্ত একটি সংস্থা। এ পরিবারের রয়েছে অসংখ্য মাসআলা-মাসাইল।

বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। বিবাহ-শাদী হল জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মোড়। এ মোড়ে যদি

ভুল হয়ে যায় তাহলে বিপদের শেষ নেই। মোড় দেওয়া দরকার ছিল ডান দিকে, কিন্তু দিয়ে ফেলেছে বাম দিকে, এখন গন্তব্যের দিকে দূরত্ব কমবে না; বরং ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

মানুষ বালেগ হওয়ার পর বিবাহ-শাদীর চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যতার জন্য বিবাহ করতে হয়, দীনি প্রয়োজনেও করতে হয়, নিজের ঈমান ও আমলের হেফাজতের জন্য করতে হয়, ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে একাগ্রতার জন্য বিবাহ করতে হয়, নিজের সুন্দর চরিত্রের জন্য বিবাহ করতে হয়। এরকম অসংখ্য প্রয়োজন ও উপকারিতার জন্য বিবাহ করতে হয়। বিবাহ-শাদী এমন জিনিস নয় যে, এক জায়গায় একটা পেলাম আর করে ফেললাম। আমাদের সমাজ এত খারাপ হয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না।

মানুষের দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে দু'টি জিনিসের স্থায়িত্ব এত বেশি যে, সেগুলো শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং জান্নাত পর্যন্ত তার সাথে থাকে। একটা হল ঈমান আরেকটি হল বিবাহ। দুনিয়াতে যে আপনার স্ত্রী ছিল সে জান্নাতেও আপনার স্ত্রী থাকবে; বরং তিনি জান্নাতী হুরদের সরদার হবেন। ঐ মহিলার জন্যও একই কথা। দুনিয়াতে যে তার স্বামী ছিলেন জান্নাতেও তিনি তার স্বামী হবেন। কত স্থায়ী বন্ধন! এটা এরকম জিনিস নয় যে, মোবাইলে কারো সঙ্গে কথা হওয়ার পর ভালো লেগেছে তো তাকে বিবাহ করে ফেললাম। একটি আদর্শ ছেলে একজন অপরিচিত মেয়ের সাথে কিভাবে কথা বলে? আর বিশেষভাবে এসব কথা বলা তো কল্পনাই করা যায় না। এমনিভাবে একটি আদর্শ মেয়ে অপরিচিত আরেকটি ছেলের সাথে মোবাইলে এসব কথা বলা অসম্ভব ব্যাপার।

এক লোক আমাকে বললেন, হুজুর! আমি বিবাহ করে ফেলেছি। বললাম, কিভাবে করলেন? বললেন, লঞ্চে ফরিদপুর যাচ্ছিলাম। একটি মেয়ে লঞ্চের বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমিও গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম। কথা-বার্তা হল। ভালোই লাগল। লঞ্চ থেকে নেমে তাদের বাড়িতে গেলাম। মেয়ের বাবা-মার সাথে কথা বললাম। তারাও রাজী হলেন তো বিবাহ হয়ে গেল।

সাময়িক জযবায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা না করে অনেকেই এমনভাবে বিবাহ করে ফেলে কিন্তু পরবর্তীতে কত রকমের মসিবত ও পেরেশানী আসে—এসবের কোনো চিন্তাই আসে না। বিবাহ এমন নয় যে, পেটে ক্ষুধা লেগেছে তো কিছু খেয়ে পেট ভরে নিলাম বা গরু-ছাগল হায়ওয়ান-জানোয়ারের মত যাকে তাকে গ্রহণ করলাম' বরং বিবেচনা করতে হবে, এর সাথে আমার স্থায়ী সম্পর্ক হতে পারে কি না। কেননা আমাদের ভবিষ্যৎ তো শুধু এ দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। স্বামী কিংবা স্ত্রী একে অপরের পরকালের সামান বা সহযোগী হতে হবে। ছেলে কিংবা মেয়ের ব্যাপারে জানতে হবে সে কেমন, কোন চরিত্রের মানুষ, কেমন বংশ ও মর্যাদার অধিকারী।

বিবাহের উদ্দেশ্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্ষেত্রে কত সুন্দর ফর্মূলা দিয়ে গেছেন। প্রথমে তিনি বিবাহ-শাদীর উদ্দেশ্য ঠিক করতে বলেছেন। কেননা যে কোনো জিনিস করার পূর্বে একটি উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। তারপর সামনে অগ্রসর হতে হবে।

বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে এই যে, এটা আল্লাহ পাকের একটি হুকুম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবী-রাসূলের একটি সুন্নত, আমি আল্লাহর হুকুম ও পয়গম্বরগণের সুন্নত পালন করব।

কিছু বিবাহ তো এমন হয়েছে যা স্বয়ং আল্লাহপাক পড়িয়েছেন। হযরত আদম ও হাওয়ার বিবাহ আল্লাহপাক পড়িয়েছেন। স্বাক্ষীরও প্রয়োজন হয়নি। আল্লাহপাক যেটা পড়িয়েছেন তার কি সাক্ষীর প্রয়োজন আছে? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ হযরত যয়নবের সাথে স্বয়ং আল্লাহপাক পড়িয়েছেন।

اَللّٰهُ مُزَوِّجٌ جِبْرِيْلُ شَاهِدٌ

বিবাহ পড়িয়েছেন আল্লাহপাক, জিবরীল (আ.) সাক্ষী।

দুনিয়ার সকল মানুষ স্বাক্ষী হলে যা হত তার চেয়ে বেশি মজবুত হয়েছে। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ۔[77]

৭৮. সূরা আহযাব : ৩৭

আমি যয়নবের সাথে আপনার বিবাহ পড়িয়ে দিলাম।

তো বিবাহের নিয়ত হলো- আল্লাহর হুকুম মানবো আর রাসূল (আ.)-এর সুন্নত অনুসরণ করব। আমি একজন নির্মল চরিত্রের মানুষ হতে চাই। আমি যেন চারিত্রিক উন্নতি লাভ করতে পারি, অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে পারি, মানুষও যেন আমার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা কু-ধারণা পোষণ করতে না পারে—এসব নিয়তে জন্য বিবাহ করব।

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দীনি সহযাত্রী

স্বামী-স্ত্রী তো একে অন্যের দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন এবং পরকালের অনন্তকালের জীবনের সঙ্গী ও সহযোগী হবেন। আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার ক্ষেত্রে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে সহযোগী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্বামী আর স্ত্রীর জন্য দোয়া করেছেন, যারা একজন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে অপরজনের চেহারায় পানির ছিটা মারে। স্বামী ঘুম থেকে জেগেছেন কিন্তু স্ত্রী এখনও ঘুমিয়ে আছেন। স্বামী স্ত্রীর চোখে হালকা পানির ছিটা দিলেন কিংবা স্ত্রী স্বামীর চোখে হালকা পানির ছিটা দিলেন। এতে আল্লাহ পাক খুশি হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের জন্য রহমতের দোয়া করেছেন। তো বোঝা গেল, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উভয় জগতের সঙ্গী ও সহযোগী।

বিবাহের মাঝে আর কী কী নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকবে? উদ্দেশ্য থাকবে আমি যেন আমার মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে আমার হায়াত কাটাতে পারি।

ঈমানদারদের জীবন তো তার জন্ম দিয়ে শুরু হয় আর শেষ হয় না। দুনিয়ার হায়াত শেষ হয় কিন্তু তার হায়াত শেষ হয় না। দুনিয়ার বর্ডারের হায়াত শেষ হয়েছে কিন্তু আরেক জগতের হায়াত শুরু হয়েছে। জান্নাতেও শেষ হয় না। জান্নাত শেষ হলেই তো তার হায়াত শেষ হবে। জান্নাতেরও শেষ নেই, তার হায়াতেরও শেষ নেই। দুনিয়াতে মুমিনের আশা-আকাঙ্খাও শেষ হয় না। একদিন শেষ হবে। জান্নাত পেলেই মুমিনের আশা পূরণ হবে না। যে দিন জান্নাতে মাওলায়ে পাকের সাথে দীদার হবে, মাওলায়ে পাক ঘোষণা দিয়ে দিবেন আমি চির দিনের জন্য

তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আর কোনো দিন নারাজ হব না। সে দিন সব আশা পূরণ হয়ে যাবে। আর কোনো আশা বাকী থাকবে না।

هر تمنا دل سے رخصت هو گئي
اب تو آجا اب تو خلوت هو گئي

দিলের সকল আশা-আকাঙ্খা শেষ হয়ে গেছে। এখনও একটি তামান্না বাকী রয়ে গেছে। জান্নাত পাওয়া গেছে কিন্তু এখনও মাওলার দীদার পাওয়া যায়নি। পূরণ হবে কখন?

منتظر گشته نشستم سوئے تو
آمده بارے نمائم روئے تو

মাওলা গো! তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।
তোমার দীদারের আশায় প্রহর গুণছি।

یه جنت بهی مطلوب هے اس وجه سے
که دار اللقاء هے مقام الرضا هے

আশা তো সেদিন পূরণ হবে, আনন্দ তো সেদিন পূর্ণ হবে যেদিন মাওলায়ে পাকের দীদার আর সন্তুষ্টির ঘোষণা মিলবে। এরপর আর কোনো আশা থাকবে না।

জীবনসঙ্গী কেমন হওয়া চাই!

মুসলমান ছেলে-মেয়ের মাঝে বিবাহের পূর্বে এ চিন্তা থাকতে হবে যে, আমি যাকে নিয়ে ভবিষ্যৎজীবনে যাত্রা করব, আমার দুনিয়ার জীবন তার দ্বারা কতটুকু সুখী হবে, আমার মওতের সময় তার দ্বারা কোনো উপকার পাব কি না, কবরে উপকার পাব কি না, হাশরের ময়দানে কোনো উপকার পাব কি না, জান্নাতে যাওয়ার পথে তাকে সহযোগী হিসেবে পাব কি না। শুধু একটু ক্ষুধা নিবারণ করা বিবাহের উদ্দেশ্য হতে পারে না; বরং উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবাহের উদ্দেশ্যের মধ্যে রাখতে হবে। ছেলেকে ভাবতে হবে—যে মেয়েকে আমি আমার জীবন-সঙ্গীনী বানাতে যাচ্ছি, সে দুনিয়াতে আমার জীবনসঙ্গীনী, জান্নাতেও যেন আমার জীবনসঙ্গীনী হতে পারে। একজন মেয়েকেও একথাটি ভাবতে হবে। অভিভাবকদেরও এসব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

আরেকটি উদ্দেশ্য থাকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত বৃদ্ধি করা। আল্লাহ পাক নেজাম রেখেছেন বিবাহের মাধ্যমে হালাল সন্তান হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ .[78]

তোমরা এমন বংশের নারীদের বিবাহ কর, যারা বেশি বেশি সন্তান প্রসব করে এবং স্বামীদেরকে বেশি মহব্বত করে। কেননা আমি হাশরের মাঠে তোমাদের সংখ্যা দিয়ে গর্ব করব।

আরেকটি নিয়ত হল নেক সন্তান লাভ। আমরা সকলেই তো মরে যাব, কেউ দুনিয়াতে চিরদিন থাকব না। কবরের জীবনে নেক পাওয়ার তিনটা রাস্তা থাকবে। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল নেক সন্তান। দুনিয়াতে দীনদার ছেলে কিংবা মেয়ে থাকলে আমার জন্য দান-সদকা করবে, বিভিন্ন আমল করে ঈসালে সওয়াব করবে। দুনিয়ার কেউ না করলেও নেক সন্তানরা বাবা-মার জন্য ঈসালে সাওয়াব করবে।

ঈসালে সওয়াবের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক লোক অপর এক মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছে যে, সে খুব কষ্টে আছে। ফকীরের বেশে বড় অসহায় অবস্থায় তার কাছে এসেছে। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য তিনি সে জমানার বড় বুযুর্গের কাছে গেলেন। বুযুর্গের কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মৃত ব্যক্তিটির কি কোনো সন্তান নেই? বললেন, কেবল একটি মেয়ে আছে, কিন্তু মেয়েটি দীনদার নয়। বুযুর্গ বললেন, তার মেয়েকে বলবে সে যেন তার বাবার জন্য কিছু ঈসালে সওয়াব করে। লোকটি ঠিকানা নিয়ে মেয়ের বাড়িতে পৌঁছলেন। গিয়ে শুনেন মেয়ে নদীতে গোসল করতে গেছে। তিনি সেখানেই গেলেন। বললেন, স্বপ্নে তোমার বাবাকে খুব অসহায় অবস্থায় দেখেছি, মনে হয় খুব কষ্টে আছেন। তুমি তার জন্য কিছু সওয়াব পৌঁছাও। মেয়ে একথা শুনে হাতের কোষ দিয়ে কিছু পানি নদীর পারে নিক্ষেপ করল আর বলল, এটা আমার বাবার জন্য পাঠালাম। পরের রাতে তিনি ঐ লোকটিকে আবার স্বপ্নে দেখলেন। আজ দেখলেন খুব রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত। জিজ্ঞেস করলেন,

৭৯. সুনানু আবু দাউদ, হাদীস নং-২০৫০

আপনার আজকের অবস্থা এমন কেন দেখছি? বললেন, আমার মেয়ে আমার জন্য এক কোষ পানি নিক্ষেপ করেছিল। সে পানি গিয়ে এমন একটি গর্তে পড়েছে যেখানে একটি পোকা পানির অভাবে নড়াচড়া করতে পারছিল না এবং গর্ত থেকে উপরে উঠতে পারছিল না। ঐ পানি পাওয়ার পর মোটামুটি নড়াচড়া দিয়ে উপরে উঠতে পেরেছে। এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে। তাই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এবার বুঝলেন তো সন্তান কী কাজে আসে। তাই বিবাহের ক্ষেত্রে এসব উদ্দেশ্য সামনে রাখতে হবে।

বর-কনের কুফু মিলতে হবে

এরপর কনে বা ছেলে চয়ন করার ক্ষেত্রে কতগুলো জিনিস লক্ষ করতে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো উম্মতকে শিখিয়েছেন। কুফু মিলতে হয়। রাজার ছেলে গরীবের মেয়েকে, গরীবের ছেলে রাজার মেয়েকে বিবাহ করে। বিবাহের সময় তো ভালো লেগেছে; কিন্তু কিছুদিন পর এ অসম বিবাহ বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। ছেলে স্ত্রীর খোরপোশ ও ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম কিনা তা মোটামুটিভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় খুব সুন্দর একটি ছেলে একেবারে বিশ্রী একটি মেয়েকে বিবাহ করে ফেলে। উভয়ের সৌন্দর্যের মাঝে মিল থাকে না। পরে ঝামেলা হয়। এজন্য এটাও দেখে নিতে হবে।

কনে দেখার শরঈ নিয়ম

তবে আমরা যে রকম আনুষ্ঠানিকতার সাথে কনে দেখি এমন দেখার কথা বলছি না। বর্তমানে আমাদের সমাজের কনে দেখা তো গরুর বাজারে গরু দেখার মত হয়ে গেছে। দশ-বার জন মিলে দেখতে হবে। গরুর ব্যাপারে যেমন জানতে চায় কয়টা দাঁত উঠেছে; হাল চাষে কেমন; লাফ দেয় কেমন; ছেলেপক্ষের লোকজন মেয়ের ব্যাপারেও এমন অনেক কিছু জানতে চায়। এভাবে দেখা ইসলাম সমর্থন করে না। পুরুষের মধ্যে কেবল ছেলে দেখবে। কিভাবে দেখবে? যতটা গোপনে দেখা যায়। যাই হোক, সৌন্দর্যও দেখার বিষয়। এটা উপেক্ষা করা চলবে না।

ছেলে মেয়ে উভয়ে উভয়কে পছন্দ করেছে তো যথেষ্ট। আর কারো পছন্দ হল কি-না তা দেখার বিষয় নয়। অনেক সময় এমন হয় যে, ছেলের তো পছন্দ হয়েছে কিন্তু বাবার পছন্দ হয় না কিংবা ভাইয়ের পছন্দ হয় না, ভগ্নিপতির পছন্দ হয় না। প্রথমত মেয়েকে অন্য পুরুষদের জন্য দেখা জায়েয নেই। দ্বিতীয়ত অন্যরা ছেলের পছন্দের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। এতজন পছন্দের দরকার কী? ছেলে-মেয়ের পছন্দই যথেষ্ট।

বিয়েতে বংশ দেখতে হবে। যাত-পাত দেখে বিবাহ করতে হবে। সামাজিক অবস্থান দেখতে হবে।

আমার শায়েখ (রহ.) একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। চট্টগ্রামের এক সওদাগর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ করেছে খুব সুন্দরী দেখে। কিন্তু অন্যরা পছন্দ করেনি। কারণ বংশ ভালো ছিল না। বাপ-মা ভিক্ষা করে। এ মেয়েটা তার সমপর্যায়ের কোনো ছেলের উপযোগী হবে কিন্তু এ সওদাগরের জন্য নয়। বংশীয় মান-মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান দেখতে হবে।

আর যেটা না দেখলেই নয়, সেটার নাম হল দীনদারী। নামায পড়ে কি না, কুরআন তিলাওয়াত করে কি না, পর্দাপুশিদা মেনে চলে কি না– এসব অবশ্যই দেখতে হবে।

দাম্পত্য জীবনে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের মধ্যে খুতবা পড়তেন। তাঁর কোনো খুতবা এমন ছিল না যেখানে কুরআন শরীফের তাকওয়া বিষয়ক তিনটি আয়াত না পড়তেন। তিনটি আয়াতই হল তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় সম্পর্কিত।

প্রথম আয়াত :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .[79]

–হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

৮০. সূরা আলে-ইমরান : ১০২

দ্বিতীয় আয়াত :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .[80]

–হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।

তৃতীয় আয়াত :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .[81]

–হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

তিনটি আয়াতই তাকওয়া সম্পর্কিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বোঝাতে চেয়েছেন—জীবনের কাঙ্খিত বস্তু পেয়ে আনন্দে গা ভাসিয়ে দিও না, বরং শরীয়তে যতটুকু আনন্দের অনুমতি রয়েছে সে সীমারেখার ভিতরে থাকবে।

আনন্দের মাঝেও আল্লাহকে ভোলা যাবে না

এখন তো বিবাহ-শাদীতে খুব আনন্দ-ফুর্তি চলে। বিবাহ অবশ্যই আনন্দের বিষয়। আনন্দ করা যাবে। তবে ঐ মাওলাকে ভুলে গিয়ে নয়, যে মাওলার কারণে আনন্দের এত উপকরণ পেয়েছেন, জীবন-যৌবন পেয়েছেন, মহব্বত করার জন্য দিল পেয়েছেন।

মোগল সম্রাটদের মধ্যে একজনের নাম হল যফর শাহ। তিনি একজন বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বলেন–

৮১. সূরা নিসা : ১
৮২. সূরা আহযাব : ৭০

ظفر آدمی ہر گز اس کو نہ کہیےگا * خواہ ہو کتناہی صاحبِ فہم و ذکا
جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی * جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

হে যফর! যে ব্যক্তি আনন্দ-ফুর্তি কিংবা রাগের মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করে না, আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহর ভয় দিলে রাখে না, যা ইচ্ছা তাই করে বসে—ঐ লোকটাকে মানুষই বলবে না, চাই সে যত বড় বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হোক না কেন। এই দুই মুহূর্তে যার হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ থাকে না তাকে 'মানুষ' বলা উচিত নয়। কারণ, যে আল্লাহকে ভুলে যায় সে নিজেকেও ভুলে যায়। সে যে মানুষ একথাও সে ভুলে যায়।

আনন্দের মুহূর্তে আল্লাহকে ভুলে তাঁর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা হয়। কারণ আনন্দের উপকরণগুলো তো আল্লাহপাকের দেয়া। তিনি উপকরণগুলো ঠিক না রাখলে কি আমরা আনন্দ প্রকাশ করতে পারতাম?

وفا آموختی از من وکار دیگراں کردی
ربودی جو ہر ازمن نثار دیگراں کردی

হে মানুষ! তুমি হাসছ, তুমি যে মুখ দিয়ে হাসছ, যে চোখ দিয়ে দেখছ, যে কান দিয়ে শুনছ আর আনন্দ উপভোগ করছ, এগুলো তো আমি দিয়েছি। অথচ আমি মাওলাকে ভুলে গেলে, তোমার আনন্দের এ উপকরণগুলো তো আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম। এগুলো তোমাকে দিয়েছি আমার শোকরগুজার হওয়ার জন্য। আমাকে ইয়াদ করার জন্য। সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি বাক্য বলার জন্য। আজকে ভুলে গেলে আমাকে! সম্পদ আমি দিলাম তোমাকে এজন্য যে, তুমি এর দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করবে, আর তুমি আমাকে ভুলে গেলে!

দোস্ত! আমরা যেন আনন্দে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যাই।

দেওবন্দের কিছু শিক্ষক একবার খুব রসিকতা করছিলেন। রসিকতা শেষ হলে একজন বললেন, আমরা যখন আনন্দ করছিলাম তখন আমাদের দিলে আল্লাহর স্মরণ বিরাজমান ছিল কি না? সকলেই

বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের দিলে তখনও আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত ছিল।

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی
جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

মনে করুন, বিবাহ হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হয়েছে। এমন মুহূর্তেও আল্লাহকে ভুলে থাকা যাবে না। ভুলে থাকলে বড় ধরনের ক্ষতি হবে। তোমার জীবনের মোড় পরিবর্তন হচ্ছে। যদি তোমার মাওলার সাহায্য তোমার সাথে না থাকে তুমি একা সবকিছু সামাল দিতে পারবে? তুমি একা কিছুই করতে পারবে না। তাই মাওলার সাহায্য পেতে হলে তখনকার যে আমল রয়েছে তা আদায় কর।

প্রথম সাক্ষাতে করণীয়

স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতে সালাম দিবে, দু'আ পড়বে, মাথার সামনের অংশের চুলে ধরে দু'আ পড়বে। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

এ দুআয় আল্লাহপাকের কাছে স্ত্রীর কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়েছে এবং অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

অনেকের কাছ থেকেই এ অভিযোগ শুনতে পাই যে, হুজুর! আমার বিবি কথা শোনে না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা কি প্রথম সাক্ষাতে এ আমল করেছিলেন? আমলের ধারধারে না গিয়ে তখন নিজে নিজেই তো সব কিছু সামাল দিতে চেয়েছেন। আল্লাহপাকের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। এখন সমস্যায় পড়ে টের পাচ্ছেন।

এরপর যখন স্বামী-স্ত্রী মিলনের প্রস্তুতি নেয় সে মুহূর্তেও আল্লাহকে ভোলা যায় না। শয়তান ঐ মুহূর্তে অনেক প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে থাকে। যে প্রভাবটি সন্তানের উপর গিয়ে পড়ে। তাই দু'আ পড়ে নিতে হয়। দোয়াটি এই–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

এ দোয়ার মধ্যে আল্লাহর কাছে শায়তানের শয়তানী থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

দোস্ত! পারিবারিক জীবনে অশান্তির উপসর্গগুলো তো আমরা নিজেরা সৃষ্টি করেছি।

স্ত্রীকে দীন শেখানোর দায়িত্ব স্বামীর

বিবিকে দীন শেখানো স্বামীর দায়িত্ব। বিবাহের সময় তো রূপ সৌন্দর্য থেকে নিয়ে কত কিছু যাচাই করলেন কিন্তু এটা কি যাচাই করেছেন যে, মেয়েটি দীন-ধর্ম সম্পর্কে কতটুকু জানে? নামাযের সূরা-কেরাতগুলো সহীহ আছে কি-না? না থাকলে কি তালাক দিয়ে দিবেন? না, না প্রশ্নই আসে না। তাকে দীন শেখাতে হবে। স্ত্রী আপনার সবচেয়ে বড় মেহমান। তার যথাযথ মেহমানদারী আপনার কর্তব্য। দৈনিক এক ঘন্টা-আধাঘন্টা করে শিখাবেন। সহীহ-শুদ্ধ না থাকলে সহীহ করে দিবেন। তার মধ্যে দীনদারীর অভাব থাকলে তাকে আল্লাহর মহব্বতের কথা শোনাবেন। পরকালের কথা শোনাবেন। মহিলাদের মন খুব নরম। পরকালের কথা শুনলে তারা গলে যাবে। পুরুষের মনই গলে যায় আল্লাহর মহব্বতের কথা শুনলে। আর মহিলারা তো আরও বেশি গলবে। মহিলাদেরকে ধ্বংস করাও সহজ, লাইনে আনাও সহজ। দীনদারী শিক্ষা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা।

হে নারীসমাজ! স্বামীর কাছ থেকে ভালো খাবার আর দামি দামি কাপড় ও আধুনিক ডিজাইনের ফার্নিচার পাওয়াই মূল বিষয় নয়। কী শাড়ী পেলাম, কেমন ঘর পেলাম, কী অলংকার পেলাম—এসবের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল স্বামীর কাছ থেকে আমি কী আদর্শ পেলাম, দীনদারী কী পেলাম। তার কাছ থেকে আমি কী শিক্ষা পেলাম—এ দিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য দেয়া উচিত।

সন্তান গর্ভে থাকাবস্থায় করণীয়

সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় সন্তানের অনেক হক এসে যায়। সন্তানের বাবা-মা এখন থেকে অনেক সতর্ক হতে হবে। সন্তানের বাবা-মাকে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদেরকে আল্লাহপাক সন্তান দিবেন। আমরা যদি খারাপভাবে চলাফেরা করি তাহলে এ সন্তানটা সমাজে মাথা

উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। মানুষ বলবে এটা অমুকের ছেলে না! এতে সন্তান লজ্জা পাবে।

সন্তান পেটে এলে মাকে আগের তুলনায় বেশি পর্দা-পুশীদা করে চলতে হবে। সন্তান পেটে এসেছে এটা যেন অন্যেরা না বোঝে। সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে না পারে। মুরুব্বীরা তো বুঝবেন। এ সময় মা যত লজ্জাশীলতার সাথে থাকবে তত ভালো ফল হবে। দুধ পান করানোর সময়ও খুব সতর্ক থাকতে হবে। আড়ালে গিয়ে দুধ পান করাবে।

এখন এ ব্যাপারে এতটা নগ্নতা চলছে যা বলে শেষ করা যাবে না। সন্তান গর্ভে আসার সাত মাস হলে অনুষ্ঠান করা হয়। এর নাম দিয়েছে সাতাশা। আসলে ছিল সাত মাসা। সংক্ষেপে বলে সাতাশা। একটা অনুষ্ঠান হলে কতগুলো মানুষের কাছে বিষয়টি জানাজানি হবে তার কোনো হিসাব আছে! মানুষ জিজ্ঞেস করবে কোথায় যাচ্ছেন, উত্তরে বলবে, অমুকের স্ত্রীর সাতাশায় যাচ্ছি। হায়া-শরম সব চলে গেছে!

ঘটনা

আমার শায়েখ (রহ.) একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। চট্টগ্রামে মাওলানা মাজহারুল ইসলাম নামে একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি আমার শায়েখের উস্তাদ ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তিনি ফরিদাবাদ মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। তিনি শুনিয়েছেন, এক লোক বিবাহ করেছেন। স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন। তিনজন ছেলে সন্তান রয়েছে। সবাই বড় হয়েছে। একবার স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া লেগেছে। স্বামী স্ত্রীকে মেরেছে। স্বামী ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর বড় ছেলে ঘরে এসেছে। বড় ছেলেকে পেয়ে আহত মা কাঁদতে কাঁদতে উঁচু আওয়াজে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করল। ছেলে ঘটনা শুনে মাকে সামলাতে গিয়ে বলল, মা! চুপ করুন, মানুষ শুনলে মন্দ বলবে। আমাদের লজ্জা হবে। বড় ছেলের কথায় মা সন্তুষ্ট হতে পারল না। রাগে-ক্ষোভে বলল, তোর কাছে কোনো দিন বিচার পাইলাম না।

কিছুক্ষণ পর মেঝ ছেলে ঘরে এসেছে। আহত মা মেঝ ছেলের কাছেও পূর্বের মত অভিযোগ করল। মেঝ ছেলে ঘটনা শুনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হল এবং বাবার প্রতি সামান্য ক্ষোভ প্রকাশ করল। তারপর মাকে সান্ত্বনা

দিয়ে বলল, থাক মা! বাবা এমন অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। অন্য কেউ যেন না জানে, ধৈর্য ধারণ কর। অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছেলেও এসে ঘরে হাজির। মা তার কাছেও বিলাপ করে অভিযোগ পেশ করল। ছোট ছেলে মার দুঃখের কথা শুনেই হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে এমনকি একটি লাঠি হাতে নিয়ে বাবাকে মারার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। ঘটনার কিছু দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিলমিশ হয়ে যায়। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। একদিন স্ত্রী স্বামীকে বলে, সন্তান তো সবগুলোই আমাদের। কিন্তু ঐ দিনের ঘটনায় তিন ছেলের আচরণ তিন রকম দেখা গেল কেন? কারো কাছেই উত্তর জানা নেই। স্ত্রী বলল, বিষয়টি তোমার হুজুরকে জিজ্ঞেস করো তো দেখি। স্ত্রীর কথা মত লোকটি মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাহেবের কাছে গেলেন এবং উক্ত ঘটনার বিবরণ দেয়ার পর কারণ জানতে চাইলেন। হুজুর বললেন, প্রথম সন্তান গর্ভধারণ করার সময় মার মধ্যে লজ্জা-শরম খুব বেশি ছিল। আল্লাহর ভয়ও ছিল বেশি। দুশ্চিন্তা ছিল পেটের সন্তানটি কেমন হয় এ নিয়ে। গর্ভের সময়টিতে নিজেকে খুব গোপন রাখত। জন্মের পর দুধ পান করানোর সময়ও আড়ালে দুধ পান করাতো। দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় লজ্জা-শরম, আল্লাহর ভয় ও তার প্রতি সমর্পণ প্রথমবারের মত ছিল না। একটু কমে গিয়েছিল। তৃতীয় সন্তান যখন এসেছে তখন সবকিছু আরও কমেছে। পর্দার গুরুত্ব কমেছে। দুধ পানের সময় খোলামেলা অবস্থা বিরাজ করেছে।

তো সন্তান গর্ভে থাকাবস্থায় এবং লালিত পালিত হওয়ার সময় বাবা-মার মাঝে লজ্জাশীলতা থাকতে হবে। এটাও সন্তানের হক। আজকের সমাজ মহিলাকে রাস্তা-ঘাটে বের করার মাঝে, অফিসে-আদালতে চাকরী করার মাঝে সফলতা খুঁজছে। খুঁজতে থাকুন। কস্মিনকালেও সফলতার দেখা পাবেন না। শরীয়ত যেটা হারাম করেছে সেটার মাঝে আবার সফলতা থাকে কিভাবে?

শিশুর কানে আযান-ইকামত

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলে হোক, মেয়ে হোক ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হবে। এটা তার পাওনা। এ আযান-ইকামতের বিরাট শক্তি রয়েছে। খ্রিস্টানরা ভারত উপমহাদেশ দখল করে প্রায় দুইশত

বছর শাসন করেছিল। তারপরও থাকতে পারেনি। যতদিন শাসন করেছে সে সময়েও তেমন শান্তিতে থাকতে পারেনি। মুসলমানদের আন্দোলন ও প্রতিবাদের মুখে ওরা সদা কাবু হয়ে থাকত। তখন এরা চিন্তা করল ব্যাপার কি? আমরা এত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে, আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করলে মুসলমান গর্জে ওঠে কেন? ব্যক্তি জীবনে অনেককে ইসলামের অনুশাসন তেমন মেনে চলতে দেখা যায় না কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু হলে সবাই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, এর কারণ কী? গবেষণা করে ওরা এটা বের করেছে যে, মুসলমান সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেয়ার মাধ্যমেই তাদের মাঝে আল্লাহ, নবী ও ইসলামের বড়ত্ব ও মহত্ব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তখন এটা এমনভাবে বদ্ধমূল হয় যে, মরার সময়ও আর বের হয় না। আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কিছু হলে গর্জে ওঠে।

এ আযান-ইকামত দেওয়ার জন্য পুরুষ খুঁজতে হবে না। মহিলাগণও দিতে পারবেন। হুজুর ডেকে আনাও জরুরী নয়। সন্তানকে ঘরের বাইরে আনাও জরুরী নয়। আযান অনেক জোরে দেওয়াও আবশ্যক নয়।

এ পাওনাটা কেবল ছেলের নয়। ছেলে মেয়ে উভয়ের। অনেকে ছেলে হলে আযান দেয়, মেয়ে হলে দেয় না। কেউ যদি এমন করে থাকেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। যাদের সন্তানাদি রয়েছে তারা চিন্তা করবেন আমি আমার সন্তানের এ অধিকারটুকু আদায় করেছি কি-না। ছেলের কানে দিয়েছেন কিন্তু মেয়ের কানে দেননি এমনও হতে পারে। তাই সবাই হিসাব নিবেন আমার সন্তানের হক আমি আদায় করেছি কি-না। ছেলে হোক মেয়ে হোক উভয়ের হক আদায়ের ক্ষেত্রেই সচেতন হোন।

মেয়ে সন্তানের অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিন

দোস্ত! হকের জন্য কেয়ামতের দিন খুব ধরপাকড় হবে। ছেলেদের সম্পদ তো আমরা ভালোভাবে প্রদান করি কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে অবহেলা করি। মেয়েদের সম্পদ আদায় করতে গেলে মা-বাবার মাথা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল নারীদেরকে যে পরিমাণ অধিকার দিয়েছেন সরকার এটাকে সমান করতে চায়। এটা সমান

করতে যাওয়ার চেয়ে আর কোনো কাজকে আমি বড় বোকামী বলে মনে করি না; বরং সরকারের দায়িত্ব হল আল্লাহ পাক মেয়েদেরকে যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু যেন তারা পেয়ে যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মেয়েরা যদি তাদের পাওনা পুরোপুরি পেয়ে যায়, তাহলে দেশের প্রতিটি মেয়ে সাবলম্বী হয়ে যাবে। মেয়েরা বহু জায়গা থেকে পায়। বাবার কাছে পায়, স্বামীর কাছে পায়, ছেলের কাছে পায়, মায়ের কাছে পায়। সরকারের দায়িত্ব এগুলো যথার্থভাবে পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা। সমান করা বোকামী ও পণ্ডশ্রম হবে। মহিলাদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যা দিয়েছেন এর চেয়ে সুন্দর ও বাস্তবসম্মত কোনো কিছু কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু বর্তমান সময়ে মহিলাগণ বঞ্চিত। আল্লাহ বঞ্চিত করেননি। বরং আমরা বঞ্চিত করে রেখেছি। মহিলাগণ অসহায়। তারা তাদের অধিকার উদ্ধার করতে পারে না। তাই সরকার এ ক্ষেত্রে তাদের পাশে দাঁড়াবে। মহিলাদেরকে তাদের অধিকার পেতে সহায়তা করবে। এমনটি করা হলে দেশের কোনো মহিলা অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল থাকবে না। সবাই ধনী হয়ে যাবে।

মেয়েদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দিতে এত কষ্ট লাগে কেন? একটা পয়সাও কি কেউ কবরে নিয়ে যাবেন? আমরা ছেলেদেরকে খুব দিয়ে যাই। মেয়েদেরকে বিয়ে দিলে মনে করি তার বুঝি আর কোনো পাওনা নেই। ভাইয়েরাও এমনটিই মনে করে। ভাইয়েরাও মনে করে বোনকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে। এই হয়েছে, সেই হয়েছে। এসব অনুচিত কথা ও অবান্তর চিন্তা। আপনার বিবাহে বাবার সম্পত্তি খরচ হয়নি? কিংবা আপনার আরেকটি ভাই থাকলে সম্পত্তির ভাগ দিতেন না? ভাই হলে দিতেন, বোন হলে কেন দিবেন না? এসব চিন্তা এসেছে হিন্দুদের থেকে। হিন্দু ধর্মে বিয়ে দেয়ার পর মেয়ে বাবার বাড়ির কোনো সম্পত্তি পায় না। আপনি বাবা, ছেলেদেরকে দিচ্ছেন, মেয়েকে দিচ্ছেন না কেন? আপনি কাউকে জিতিয়ে গেলেন, আর কাউকে ঠকিয়ে গেলেন, পরকালে কী জবাব দিবেন? আপনি পরকালে এ জুলুমের মজা ভোগ করবেন। মনে করছেন ছেলেকে দিলে লাভ হবে, মেয়েকে দিলে লাভ হবে না। এত চিন্তা না করে যার যেটা পাওনা সেটা দিয়ে যাবেন। এটা হল দীন। দীন যদি না মানি তাহলে বদদীনি তো আসবেই। পরিণতিতে অশান্তিও আসবে।

মানুষের ঘরে মানুষ বাস না করলে জীন-ভূত বাসা বাঁধে, তেমনি দীনের অনুসরণ না করা হলেও সেটি বদদীনী আর অশান্তির আখড়ায় পরিণত হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব কথার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন! *

.....

* ২০১০ ঈ. সালে ফুঁলছোয়ার বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান

সফরে আখেরাত

(মৃত্যু ও কাফন-দাফন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .[82]

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا - او كما قال النبى ﷺ.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

দুনিয়ার সফর ও আখেরাতের সফর

এখনকার আলোচ্য বিষয় হলো 'সফরে আখেরাত' বা আখেরাতের সফর। আমরা দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এখানে এসেছি। দেশের

৮৩. সূরা বাকারাহ : ২৮১

বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছি। সবাই সফর করে এসেছি। আবার আল্লাহ পাক নিলে সফর করেই যার যার ঠিকানায় ফিরে যাব। এ সফর ছাড়াও আরেকটা সফর রয়েছে, যার নাম হল সফরে আখেরাত, আখেরাতের সফর। এখনকার আলোচ্য বিষয় হল এটা। সেই সাথে এ সফরের পদ্ধতি কী হবে, যে বাহনটার মাধ্যমে আখেরাতের সফরটা হবে তথা মৃত্যু, কাফন-দাফন, কবর ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হবে।

জন্মই মৃত্যুর সংবাদ দেয়

زندگی موت کے آنیکی خبر دیتی ھے
یہ اقامت تجھے پیغام سفر دیتی ھے

একজন মানুষের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নিশ্চিত অঘোষিত সংবাদও পাওয়া গেছে। সেটা হল মৃত্যুর সংবাদ। জন্ম এ ঘোষণা দেয় যে, এ লোকটি পৃথিবীতে চিরদিন থাকার জন্য আসেনি। একদিন মরে যাবে। আমি দুনিয়াতে অবস্থান নিয়েছি, বসবাস করছি, এ অবস্থান ও বসবাস আমাকে সফরের পয়গাম দিচ্ছে যে, তুমি এখানে অবস্থান করছ ঠিকই তবে মুসাফির হিসেবে। একদিন তোমাকে এ দুনিয়ার সীমানা ছেড়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ বাণী

ওহীর সূচনা হয়েছিল হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। যত নবী এসেছেন তাঁদের সকলের কাছেই ওহী এসেছে। ওহী হল নিখুঁত জ্ঞান, নিখুঁত ইলম। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যা কল্যাণকর শুধু ঐ বিষয়েই ওহী এসেছে। ক্ষতিকর কোনো বিষয়ে ওহী আসেনি। যদি পৃথিবীতে ওহীর ইলম না আসত তাহলে মানুষ কিছুতেই প্রকৃত মানুষ হতে পারত না। হায়ওয়ান-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করত এ মানুষ। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.)। আল্লাহপাক তাঁকে দুনিয়াতে নবী বানিয়েই পাঠিয়েছেন। যাতে দুনিয়াতে এমন একটি মুহূর্ত অতিবাহিত না হয়, যে সময় মানুষের কল্যাণকর বিষয়গুলো জানানোর ব্যবস্থা না থাকে। এজন্য পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম মানুষ, তিনি সর্বপ্রথম নবীও।

নবী মানে তাঁর উপর আল্লাহ পাকের ওহী এসেছে। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন সকলের সাথে এ ওহীর সম্পর্ক ছিল। সকলেই ওহীর জ্ঞান লাভ করেছেন। তারা মানুষকে ওহীর কথা শুনিয়েছেন। যারা মানার তারা মেনেছে, আর যারা না মানার তারা মানেনি। কিন্তু এগুলো আদর্শ হিসেবে রয়ে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে নবুওয়্যতের সিলসিলা ও ধারা খতম করে দেয়া হয়েছে। তার অর্থ হল- আর ওহী নাযিল হবে না। এ নবুওয়তী ধারার আল্লাহ পাকের সর্বশেষ বাণী কোনটা, যা হযরত জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছে? আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের জন্য কেয়ামত পর্যন্তের জন্য যে কথাটা দিয়ে তাঁদের সাথে ওহী নাযিল করা শেষ করে দিলেন, ঐ বাণীটা কি আমরা শুনতে চাই না! শুনতে চাই না আল্লাহ পাক শেষ কথাটা কী বলেছেন? সেটা হল–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.[83]

''ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনো রূপ অবিচার করা হবে না।''

এটা সর্বশেষ ওহী। এরপর আর কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। অনেকে মনে করেন সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا হল সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। এটা ঠিক নয়। কেননা এ আয়াত তো বিদায় হজে আরাফার ময়দানে নাযিল হয়েছে। এরপরও কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। আরাফার ময়দানে রাসূল ছিলেন যিলহজের নয় তারিখে। এর পর যিলহজের অবশিষ্ট দিনগুলো, মুহররম, সফর অতিক্রম করে রবীউল আউয়ালের ১২ তারিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। এই মাঝখানে কি কোনো আয়াত নাযিল হয়নি? অবশ্যই হয়েছে।

---

৮৪. সুরা বাকারাহ : ২৮১

তবে একটি প্রশ্ন হল الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الخ. এ আয়াতটিকেও কেন শেষ আয়াত বলা হয়? কেউ কেউ বলেন, এটা শেষ আয়াত। তবে বলাটা একেবারে অমূলক নয়। বিধানগত আয়াত হিসেবে এটা শেষ আয়াত। এর পর আর বিধানগত কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। কুরআন শরীফে প্রায় সাড়ে পাঁচশত আয়াত হল বিধানগত। আর বাকী ছয় হাজারের বেশি আয়াত কী সম্পর্কে? একজন মানুষ শুধু বিধান পালন করেই মানুষ হয় না। মানবতার জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। সেসব আয়াতে এ বিষয়গুলোর বর্ণনা এসেছে। যাই হোক, বিধানগত আয়াত হিসেবে এটা শেষ আয়াত। তবে কুরআন নাযিল হওয়ার ধারা এটার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়নি। এর পরও অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছে ঐ আয়াতটি হল–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. [84]

ওহে দুনিয়ার মানুষেরা! ঐ দিনটাকে ভয় করো, যে দিনে তোমাকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হলেও যেতে হবে, দুশমন হলেও যেতে হবে।

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ. [85]

প্রতিটি মানুষ ১৫ বছরের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সময়টিতে যা কিছু অর্জন করেছে সবগুলোর বিনিময় তাকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। একজনের নেকী বেশি হওয়ার কথা; কিন্তু কম উঠানো হয়েছে–এটাও জুলুম। গুনাহ কম হওয়ার কথা কিন্তু আমলনামায় বেশি ওঠানো হয়েছে- এটাও জুলুম। এমন কোনো ব্যাপার সে দিন হবে না। কোনো প্রকারের জুলুমের কল্পনাও করা যাবে না। বান্দা দুনিয়ায় যা করেছে তাই পেশ করা হবে, তারই বিচার হবে।

সর্বশেষ বাণীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত

৮৫. সূরা বাকারাহ : ২৮১
৮৬. প্রাগুক্ত

দোস্ত! আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ওহী কী। আল্লাহ পাকের শেষ কথা–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ

এর মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে আমরা সফরে রয়েছি। প্রতিমুহূর্তে পরকালের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

আখেরাতই নিকটবর্তী

হযরত লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু উপদেশ কুরআন শরীফে এসেছে আর অনেকগুলো হাদীসে এসেছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত একটি নসীহত হলো–

يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوعَدُونَ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ وَإِنَّك قَداسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ دَارًا تَسِيرُ إليها أقرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا. [86]

হযরত লোকমান হাকীম (আ.) তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে আমার আদরের সন্তান! মানুষের সামনে অনেকগুলো ওয়াদাকৃত বস্তু রয়েছে। যা একের পর এক সংঘটিত হতে থাকবে। আর এসব বিষয়ের ফিরিস্তি খুব দীর্ঘ। কী সেগুলো? সামনে আমি ভালো কাজ করব, না মন্দ কাজ করব, আমার কবরটা জান্নাতের বাগান হবে, না জাহান্নামের গর্ত হবে, পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারব, না মাঝখানে কেটে পড়ব; আমলনামা ডান হাতে আসবে, না বাম হাতে; জান্নাতী হব, না জাহান্নামী হব? অনেক ব্যাপার রয়েছে। আর সফরটা খুব দ্রুততার সাথে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

আমাদের দেশর কোনো নেতা-নেত্রী বা বড় কেউ মামলা-মুকাদ্দমায় ভালোভাবে জড়িয়ে পড়লে আমরা বলি অমুকে দৌড়ের উপর আছে। দুনিয়ার হিসেবে সে তো দৌড়ের উপর আছে। আসলে আমরা সবাই কিন্তু দৌড়ের উপর আছি। কোন দিকে? আখেরাতের দিকে। আমার বুঝে আসুক আর না আসুক, আমার অনুভূতিতে ধরুক আর না ধরুক, ঘটনা যেটা ঘটছে সেটা এটাই যে, আখেরাতের দিকে আমি খুব

৮৭. রাজিন, হাদীস নং-৫২২০, মিশকাত শরীফ- কিতাবুর রিকাক

দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছি। সেকেন্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে দৌড়াচ্ছি। তিনি বলেন–

يَا بُنَيَّ، وَإِنَّك قَداسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ

হে আমার আদরের সন্তান! দুনিয়াতে যে দিন তুমি জন্ম গ্রহণ করেছ সেদিন থেকে তুমি দুনিয়াকে পিছনে ফেললে, আর আখেরাতকে সামনে নিলে। তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই সাথে তুমিও অগ্রসর হচ্ছো আখেরাতের দিকে।

وَإِنَّ دَارًا تَسِيرُ إليها أقرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا

তুমি যে ঘর থেকে বের হয়ে এলে ঐ ঘরে আর তুমি যেতে পারবে না। আরেকটা ঘর অনেক দূরে দেখা যায়। কিন্তু সামনে ঐ ঘরের দিকেই তুমি ফিরে যাচ্ছ এবং যেতে থাকবে। আর যে ঘরটা তুমি পিছনে ফেলে এলে তার দিকে আর কখনো ফিরে যাবে না, যদিও ঐ ঘরটি খুব কছে। ঐ ঘরটি কাছে থাকলেও দূরে আর ঐ ঘরটি যেদিকে তুমি যাচ্ছ সেটা দূরে থাকলেও নিকটে।

দোস্ত! আমরা সবাই দৌড়াচ্ছি কবরের দিকে। সকলের পা কবরের দিকে যাচ্ছে। বাহ্যত আমি এখান থেকে দোকানে যাচ্ছি, শহরে যাচ্ছি, এর ভেতর দিয়ে আমি কবরের দিকেই যাচ্ছি। আমার যাত্রা কবরের পাড়ে গিয়ে থামবে।

আল্লাহর এক আরেফ বলেন–

قدم سوئے مر قد نظر سوئے دنیا
کد ھر جا ر ھا ھے کدھر دیکھ ر ھا ھے

তুমি যাচ্ছ কোন দিকে, আর তুমি তাকাচ্ছ কোন দিকে? আরে নির্বোধ! বুদ্ধিমানের কাজ হল যে দিকে রাস্তা চলে তার সামনের দিকে নজর রাখা। আমি সামনে নজর না রেখে ডানে আর বামে তাকাচ্ছি। সামনে গর্ত আছে কি-না, পুকুর আছে কি-না, কাঁটা আছে কি-না, সে খবর নেই। এজন্য নজর রাখতে হবে সামনের দিকে। পা যে দিকে যাচ্ছে সেদিকে নজর রাখতে হবে। পা কবরের দিকে যাচ্ছে তো নজরও সেদিকেই রাখতে হবে। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا 'মরার আগে মর।' অর্থাৎ মরার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا তোমার কাছ থেকে অব্যশই হিসাব নেয়া

হবে, সে হিসাবের পূর্বে তুমি তোমার হিসাব মিলিয়ে দেখ। এটাকে আরবীতে 'মুহাসাবা' বলে।

হযরত আলী (রা.) বলেন–

أَلاَ يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى ... سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ
قَلِـيْلٌ عُمْـرُنَا فِى دَارِ دُنْيَا ... فَمَرْجِعُـنَا اِلَى بَيْتِ التُّـرَابِ
بِلَالُ الشَّيْبِ فِي فَوْدَيْكَ نَادىٰ . .. بِاَعْلَى الصَّوْتِ حَيَّى عَلَى الذَّهَابِ

ওহে দুনিয়ার সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাসকারী! তুমি যত উঁচু ও সুদৃঢ় ভবনে বসবাস কর না কেন, তোমাকে কিছু দিনের মধ্যে মাটিতে দাফন করা হবে।

قَلِيْلٌ عُمْرُنَا فِى دَارِ دُنْيَا ... فَمَرْجِعُنَا اِلَى بَيْتِ التُّرَابِ

দুনিয়ার মধ্যে আমাদের জীবন খুবই স্বল্প। মাটির ঘরের দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেমন অল্প জানেন? আগেও ছিলাম না। কত দিন ছিলাম না– তা কি কেউ বলতে পারবেন? কেউ বলতে পারবেন না। আবার এক সময় থাকব না। কত দিন থাকব না- তাও কি কেউ বলতে পারবেন? কেউ বলতে পারবেন না। অসীম সময় পর্যন্ত থাকব না। মাঝখানে একেবারেই সামান্য সময় দুনিয়াতে আছি।

কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ – (سورة الملك : ٢)

আল্লাহ পাক জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন। এখানে মৃত্যুর কথা আগে বলা হয়েছে। অথচ জীবন আগে মরণ পরে। কেন এভাবে বলা হল? এভাবে বলে বোঝানো হয়েছে যে, হে বান্দা! তোমার আগেও মরণ, পরেও মরণ। নাই তোমার কিছু। মাঝখানে সামান্য একটু জীবন। এটা দেখার মত কোনো বস্তুই নয়। এরপরও দেখা যায় কেন? তোমরা এ সামান্য জীবন পেয়েও খুব বেশি মাতামাতি ও লাফালাফি কর বিধায় দেখা যায়। এর দৃষ্টান্ত হল পাটখড়ির মাথায় আগুন জ্বালিয়ে নিভিয়ে দেয়ার পর আগুনের ক্ষুদ্র কণার মত, যেটা হাতে নিয়ে ঘুরালে একটা বৃত্তের মত দেখা যায়। আসলে সেটা একটা কণা মাত্র। ঘুরানোর কারণে বড় মনে হয়। অন্যথায় সেটা খুবই ক্ষুদ্র কণা।

তোমার জীবনের অবস্থাও অনুরুপ। আগেও নাই, পরেও নাই। পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল না, আবার সামনেও অসীম সময় পর্যন্ত তোমার জীবন থাকবে না।

بِلَالُ الشَّيْبِ فِي فَوْدَيْكَ نَادٰى . .. بِاَعْلَى الصَّوتِ حَيَّى عَلَى الذَّهَابِ

আগে আযান দেয়ার জন্য মসজিদে মিনার ছিল। যাতে অনেক দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে মানুষ! তোমার শরীরের উপরেও একটি মিনার আছে। মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিন ঘোষণা দেয়- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ নামাযের দিকে এসো। আর তোমার দেহ-মিনারের চূড়ার মুয়াজ্জিন ঘোষণা দেয় حَيَّ عَلَى الذَّهَابِ কবরের দিকে এসো। কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

হাফেয শিরাজী (রহ.) বলেন–

مرا در منزل جاناں چه امن و عیش چوں هردم
جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها

দুনিয়াতে আমি আল্লাহর পথের যাত্রী। সদা সেদিকে অগ্রসরমান। সুতরাং আমার আমোদ-ফুর্তির সময় কোথায়? সফরের দামামা অহর্নিশ ঘোষণা দিচ্ছে যে, সফরের সামানাপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক।

একটি মর্মান্তিক ঘটনা

আমার শায়েখ নানুপুরী (রহ.)-এর শায়েখ ছিলেন পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজীজুল হক (রহ.)। তাঁর একটি ঘটনা। মুফতী সাহেব (রহ.) এক জায়গায় দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। ঐসব এলাকার মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি কাজ করে। তাদেরকে বড়ুয়া বলা হয়। এক বড়ুয়া যুবতী মেয়ে গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। মুফতী সাহেব জায়গাটি অতিক্রম করার পরও পিছনে ফিরে বারবার তাকাচ্ছিলেন। লোকজন তো অবাক হয়ে মনে করছে কী ব্যাপার! হুজুর এ মেয়ের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন কেন? কতজনের মনে কত প্রশ্ন জাগে! মুফতী সাহেব (রহ.) মেজবানের বাড়ীতে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পর হৈ-চৈ শোরগোল শুরু হয়ে গেল।

পরে জানা গেল যে, ঐ ষাড় গরুটা মেয়েটিকে শিং-এর আঘাতে মেরে ফেলেছে। তখন মুফতী সাহেব বললেন, আমি যখন এখান দিয়ে অতিক্রম করে আসছিলাম তখন দেখলাম হযরত আজরাঈল (আ.) ঐ ষাড় গরুর শিং–এর উপর বসে রয়েছেন। অবস্থা খুবই নাজুক। কখন যে

কী ঘটে যায় বলা যায় না। তাই আমি বারবার ঐ দিকে তাকাচ্ছিলাম। তোমরা কে কী মনে করেছ আমি জানি না। আসলে আমি তাকিয়েছি আজরাঈল (আ.)-কে দেখে। এবার বুঝুন হযরতের কেমন নজর ছিল!

বাদশাহ হারুনুর রশীদের সতের বয়সী একটি ছেলে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে বাবাকে লক্ষ্য করে দু'টি কবিতা লিখে যায়–

يَا صَاحِبِى لَاتَغْتَرِرْ بِتَنَعُّمٍ ... فَالْعُمْرُ يَنْفَدُ وَالْمَالُ يَزُوْلُ
اِذَا حَمَلْتَ اِلَى الْقُبُوْرِ جَنَازَةً ... فَاعْلَمْ بِاَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُوْلُ

ওহে আমার বন্ধু ও প্রিয়জন! দুনিয়ার সুখ-শান্তি পেয়ে তুমি ধোঁকায় পড়ে যেও না। কারণ, তোমার জীবন স্থায়ী নয়। খুবই সংকীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। আর যে সম্পদের মাঝে মগ্ন হয়ে তুমি মাওলাকে ভুলে যাচ্ছ, পরকালকে ভুলে গেছ, সে সম্পদও স্থায়ী নয়। হয়ত তুমি দুনিয়াতে থাকতেই সে সম্পদ তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা সম্পদ তো সম্পদের জায়গায় পড়ে থাকবে কিন্তু তোমাকে সে সম্পদ ছেড়ে চলেই যেতে হবে। চিরদিনের জন্য দু'জন একত্রিত হবে না।

বাদশা সেকান্দর গোটা দুনিয়ার রাজত্ব করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গেছেন আমাকে যখন কাফন পরিয়ে কবরের দিকে নিয়ে যাবে তখন আমার হাত দু'টি কাফনের বাইরে রাখবে। যাতে দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, গোটা পৃথিবীর রাজত্ব করেও খালি হাতে যেতে হয়।

اِذا حَمَلْتَ اِلَى الْقُبُوْرِ جَنَازَةً ... فاعلم بِاَنَّك بَعْدَهَا مَحْمُوْل

যখন তুমি জানাযার কোন খাট বহন করে নিয়ে যাও, কিংবা কেউ বহন করে নিয়ে যায় আর তুমি দেখ ঐ মুহূর্তে তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর যে, অল্প সময় পরে তোমাকেও এভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে।

اے ساکن قصر کُهن دنیا کا مت دیوانه بن
عقبی کا کچھ کرلے جتن چھوڑ یگا ایك دن یه وطن

দোস্ত! এ দুনিয়া এক দিন ছেড়ে যেতেই হবে। মনে চাইলেও যেতে হবে, মনে না চাইলেও চলে যেতে হবে। সবাইকেই চলে যেতে হবে।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে

ঐ মানুষগুলো ভাগ্যবান যারা পূর্ব থেকেই দিলকে এমনভাবে প্রস্তুত করে রেখেছে, যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তাদের মৃত্যুতে কোনো কষ্ট নেই।

وَمَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَه

আর সবচেয়ে কষ্ট পাবে ঐসব মানুষ যারা আখেরাতকে ভুলে ছিল, মাওলার মায়া-মমতা দিলে জায়গা দেয়নি, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজের অবস্থা সুন্দর বানাতে পারেনি, দিলটাকে মাওলায়েপাকের উপযুক্ত বানাতে পারেনি। দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে এমতাবস্থায় যে, এর মায়া-মহব্বত দিলে ভরা। যেই মাওলার দিকে রওনা হচ্ছে সেই মাওলার মহব্বত দিলে নেই। যে আখেরাতের প্রতি রওনা হল, যেই কবরের দিকে রওনা হল সেখানকার কোনো সামান তার কাছে নেই। দিলটা পুরোপুরি দুনিয়ার মায়া-মহব্বতে ভরা, এসব লোক যখন মারা যায় তাদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়। কারণ সবকিছু ছেড়ে যেতে তার মন চায় না। কিন্তু ফেরেশতারা টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যান। কী যে কষ্ট!

আবার মৃত্যু কারো জন্য খুবই আরামদায়ক হবে। যাদের দিলটা পূর্ব থেকেই এর জন্য প্রস্তুত থাকে। মাওলাকে পূর্ব থেকেই দিলে জায়গা দিয়ে রেখেছে। মৃত্যুর জন্য আগেই তৈরি হয়ে আছে। সে দিলকে এমনভাবে তৈরি করে রেখেছে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। যে কোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে। ডাক এলেই তো আমাকে চলেই যেতে হবে।

তাই দোস্ত! প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। যারা মানসিকভাবে এরকম প্রস্তুত থাকে, মাওলায়েপাকও তার অপেক্ষায় থাকেন।

وقت آں آمد كه من عُریاں شوم
جسم بگذارم سراسر جاں شوم

–আমি দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুধু রূহ হয়ে
আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

خرّم آں روز كزیں منزل ویراں بروم
راحتِ جاں طلبم وز پائے جاناں بروم

–সে দিনটা আমার কাছে আনন্দের যে দিন আমি দুনিয়ার বিরান বাড়ি ছেড়ে কবর দেশে পৌঁছব। যে দিন আমি আমার মাহবুবের পদপ্রান্তে পৌঁছব সে দিন আমার আত্মা শান্তি পাবে।

منتظر گشته نشستم سوئے تو
آمده بارے نمایم روئے تو

–মাওলা গো! তোমার অপেক্ষায় বসে আছি,
তোমার দীদারের আশায় সদা প্রহর গুণছি।

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَمَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ

যে আল্লাহপাকের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে আল্লাহপাকও তার অপেক্ষায় থাকেন।

وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَه

আর যে অপ্রস্তুত হয়ে সময় কাটায় আল্লাহ পাকও কামনা করেন সে আমার কাছে না আসুক।

সুন্দর মৃত্যু পেতে হলে যা করণীয়

দোস্ত! আমাদের হালত খুবই খারাপ, দুনিয়া থেকে সবাইকে বিদায় নিতে হবে। বিদায়ের মুহূর্তটা যদি সুন্দর হয় তাহলে বোঝা যাবে সবই সুন্দর হবে। এটাকে 'খাতেমা বিল খায়ের' বলে। বিদায়ের ক্ষণটা সুন্দর হওয়ার অর্থ কী? সুন্দর হওয়ার অর্থ হল বিদায়ের সময় এমন একটা পরিবেশ পাওয়া যেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার মত লোক উপস্থিত থাকে এবং তারা সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করতে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে- মৃত্যুর সময় শিয়রের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে মৃত্যুর কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। আর ঐ সময়টায় শয়তানও সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় গোমরাহ করার জন্য।

দোস্ত! এমন একটি দীনি পরিবেশ এমনিতেই হয়ে যায় না। এর জন্য নিজের মেহনত লাগে। নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তানাদী ও প্রতিবেশীকে দীনের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সুন্দর মৃত্যু পেতে হলে মৃত্যুর বিছানায় শোয়ার পূর্বে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আমাকে কালিমার তালকীন দানকারী কেউ থাকবে কি না, আমার শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতকারী কেউ থাকবে কি না। নাকি সবাই তখনও দুনিয়ার কথাই শোনাবে। সন্তানরা বলবে আব্বা! এত কিছু রেখে আপনি চলে যাচ্ছেন। দোস্ত! এ মুহূর্তটা দুনিয়ার কোনো বিষয় আলোচনার মুহূর্ত নয়। অনেক নির্বোধ

মানুষ এ মুহূর্তে ছোট ছোট সন্তান বা নাতিদেরকে এনে দেখায়। এটা ঠিক নয়। এ সময় দুনিয়ার মহব্বত বৃদ্ধি হওয়ার মত কোনো জিনিস দেখানো উচিত নয়। বরং তিনি যে দিকে রওনা হয়েছেন সেখানকার সামান করে দেয়া। ঐ রাস্তার সামান কিভাবে বেশি হবে, কিভাবে দুনিয়ার আকর্ষণ কমে আখেরাতের আকর্ষণ বাড়তে থাকবে ঐ ফিকির থাকতে হবে। শিয়রে তখন এমন ফিকির করার মত বুঝবান লোকের প্রয়োজন, মাসআলা সম্পর্কে অবগত, দীন সম্পর্কে জ্ঞাত লোকের প্রয়োজন।

দোস্ত! আমি কি আমার পরিবার, সন্তানাদী ও আত্মীয়-স্বজনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পেরেছি যে, আমার মৃত্যুর সময় এ কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদিত হবে বলে আমি আশাবাদী। আমি কি আমার সমাজটা এমনভাবে গড়ে তুলতে পেরেছি যে, আমার সমাজের লোকেরা আমাকে সহীহভাবে গোসল দিবে, সুন্নাত তরীকায় কাফন-দাফন করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের মত কবর খনন করবে। আমার জন্য ঈসালে সওয়াব হবে কি-না। হলে সুন্নত মোতাবেক হবে, নাকি বেদআত ও রসম-রেওয়াজের সাথে হবে। এগুলোও মৃত্যুর প্রস্তুতি।

দোস্ত! আমার কাফন-দাফন ও ঈসালে সওয়াব যদি সুন্নত মোতাবেক হয় তাহলে এগুলোর উসিলায়ও তো আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিতে পারেন। এজন্য মৃত্যু-সংক্রান্ত মাসআলাও জানতে হবে। এসব মাসআলা কেবল নিজে জানলে চলবে না। আপনি তো মরেই যাবেন। অন্যকেও জানাতে হবে। আপনজনকে জানাতে হবে। তাহলে আশা করা যায় তারা সহীহভাবে সুন্নত মোতাবেক সবকিছু সম্পন্ন করবে। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন। আমীন! *

* ২০১০ সালে বাদ আসর ফুঁলছোয়ার মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُه وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِه الْكَرِيْمِ

প্রিয় হোক বা অপ্রিয়—যা বরণ করে নিতেই হবে, এর নাম মৃত্যু। নিরঙ্কুশ এ সত্যটিকে আমরা ভুলে আছি। মৃত্যুর পূর্বাপর করণীয় কী—এ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানটুকুও অনেকের নেই। উচ্চতর ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান "দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ" এর শিক্ষানবীসদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য বহু কিতাবের সহযোগিতায় 'মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে' নামে দাফন কাফনের মাসায়েল সংকলিত হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপকার পৌঁছাবেন।

ওসিয়ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "কোন মুসলমানের যদি ওসিয়ত করার মত কিছু থাকে তাহলে ওসিয়ত লিপিবদ্ধ না করে তিন রাত অতিবাহিত করা উচিৎ নয়।" (মুসলিম শরীফ খণ্ড-২ পৃঃ ৩৯)

ওসিয়তের বিধান

যাকাত, কাফ্‌ফারা, মান্নত, নামায-রোজার ফিদিয়া, মানুষের পাওনা ও আমানত ইত্যাদির ওসিয়তনামা লিখে রাখা জরুরী।

হারাম ওসিয়ত

মরণোত্তর দেহ, চক্ষু বা যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা বা দানের ওসিয়ত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম বা কবীরা গুনাহ।

যে ওসিয়ত কার্যকর করা জরুরী নয়

এ ধরনের ওসিয়ত করা যে, অমুক ব্যক্তি আমার জানাযা পড়াবে, অমুক করবস্থানে আমাকে দাফন করবে, অমুক আমার কাফন পরাবে ইত্যাদি ওসিয়ত কার্যকর করা জরুরী নয়।

রোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি যদি কোন ধরনের রোগ-ব্যাধি, বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীর সম্মুখীন হয়, এমনকি তার পায়ে যদি কাঁটাও বিদ্ধ হয়, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেন।" আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে ঃ "যদি কোন মুমিনের গুনাহ না থাকে তাহলে এর দ্বারা জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।"

রোগী দেখার ফজিলত

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঃ "হে আমার বান্দা! আমি তোমার প্রভু। আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে দেখতে আসনি।" বান্দা বলবে, "হে প্রভু! আপনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, আপনি অসুস্থ হতে পারেন না।" তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, "আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে।"

রোগী দেখার আদব ও তরীকা

রোগী দেখার আদব ঃ ওযু করে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের আশা নিয়ে রোগীর মাথার পাশে গিয়ে বসে প্রথমেই এই দোয়া পড়বে ঃ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ তারপর রোগীর মাথার উপর হাত রেখে ৭ বার এই দোয়া পড়বে ঃ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ তারপর তার অবস্থা জানবে, তার সামনে সান্ত্বনামূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা বলবে, আশু রোগ মুক্তির আশা ব্যক্ত করে তার জন্য সুস্থতা ও গুনাহ

মাফের দোয়া করবে এবং নিজেও তার কাছে দোয়ার দরখাস্ত করবে। রোগী দেখতে গিয়ে তার কাছে বেশীক্ষণ বসা ঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি এমন ব্যক্তি হয় যে, সে কাছে থাকলে রোগী আনন্দ পায়, তাহলে তার জন্য বিলম্ব করা উত্তম।

রোগী দেখার বিধান

পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে দেখতে যাওয়া ও তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব। যদি রুগ্নব্যক্তির দেখা-শোনা করার মত তার কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকে তাহলে সর্ব-সাধারণের মধ্যে তার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ব্যক্তিদের উপর তার সেবা-শুশ্রূষা করা ফরজে কেফায়া।

রোগীর জন্য করণীয়

রুগ্ন ব্যক্তি সাওয়াব ও গুনাহ মাফের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে। মৃত্যুর স্মরণ এবং আল্লাহর যিকির ও ইস্তিগফারে মশগুল থাকবে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর বেশী বেশী দোয়া পড়বে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় উক্ত দোয়া ৪০ বার পড়বে, অতঃপর যদি মারা যায়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর সুস্থ হয়ে গেলে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রুগ্ন অবস্থায় আবেগের সাথে এ দোয়াও পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ

মৃত্যু যখন নিকটবর্তী মনে হবে, তখন এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَأَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

মৃত্যু কামনা করা

রোগ-শোক ও মুসিবতের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করা নাজায়েয। হ্যাঁ, একান্ত যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে এভাবে দোয়া করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ مَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ

মুমূর্ষু অবস্থায় করণীয়

১। যদি সম্ভব হয় এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির কষ্ট না হয়, তাহলে তাকে উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে শোয়াবে অথবা ক্বেবলার দিকে পা দিয়ে পূর্বদিকে মাথা রেখে চিৎ করে শোয়াবে এবং মাথা সামান্য পরিমাণ উঁচু করে দিবে, যাতে চেহারা ক্বেবলামুখী হয়ে যায়।

২। তার পাশে বসে এমন আওয়াজে কালেমা শরীফ পড়তে থাকবে যেন সে শুনতে পায়, কিন্তু তাকে পড়ার জন্য বলবে না। সে নিজ থেকে পড়লে ভাল, না পড়লেও কোন অসুবিধা নেই।

৩। তার কাছে বসে সূরা ইয়াছিন পড়বে, হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ সূরা ইয়াছিন পাঠ করলে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হয়।

৪। ঐ কঠিন মুহূর্তে তার আদরের বাচ্চা বা তার প্রিয় বস্তু সামনে আনবে না এবং এদের আলোচনাও তার সামনে করবে না, যাতে দুনিয়ার মহব্বত নিয়ে বিদায় না হয়।

রূহ্ বের হয়ে গেলে সাথে সাথে করণীয়

১। চক্ষুদ্বয় ও মুখ বন্ধ করে দিবে এবং তখন এ দোয়া পড়বে ঃ

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

২। হাত পা টেনে টেনে সোজা করে দিবে।

৩। থুতনির নীচ থেকে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে কাপড় পেঁচিয়ে বেঁধে দিবে যাতে মুখ খুলে না যায়।

৪। পেটের উপরে সামান্য ভারী কিছু রেখে দিবে যাতে পেট ফুলে না যায়।

৫। ঋতুবর্তী বা গোসল ফরজ হয়েছে এমন কেউ মৃত ব্যক্তির কাছে থাকবে না।

৬। কোন মহিলা মারা গেলে তার মাহরাম ব্যাতিত অন্য কোন পুরুষ তাকে দেখতে পারবে না, এমনিভাবে কোন পুরুষ মারা গেলে তাকে কোন পরনারী দেখতে পারবে না। উল্লেখ্য, স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে দেখতে পারবে, কিন্তু স্পর্শ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাকে দেখতেও পারবে স্পর্শও করতে পারবে।

৭। মৃতব্যক্তি যদি এমন বুযুর্য ও শ্রদ্ধাভাজন হয় যে, তার জানাযার নামাজে মানুষ আগ্রহ সাথে শরীক হবে, তাহলে তার জানাযার নামাজের জন্য পাড়ায়-পাড়ায় ও বাজারে-বাজারে এলান করা ভালো। পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তি এমন না হয় তাহলে এরুপ এলান করা মাকরুহ।

৮। চিৎকার করে কান্নাকাটি করা বা গায়ের জামা ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি হারাম।

৯। মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর ময়নাতদন্ত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে লাশের অস্ত্রোপচার করা নাজায়েয।

১০। মারা যাওয়ার পর গোসল দেয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কুরআন শরীফ তেলওয়াত করা নিষেধ।

মৃত্যুর সংবাদ শুনে করণীয়

মৃত্যুর সংবাদ শুনে- إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়বে অযথা হা-হুতাশ, সজোরে কান্নাকাটি করবে না; বরং ধৈর্য ধারণ করবে। এতে অনেক সওয়াব আছে। হা-হুতাশ করলে মানুষ এ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। মুসিবত রোধ করার ক্ষমতা যেহেতু কারো নেই, ধৈর্য তাকে ধরতেই হবে, তাই অহেতুক অভিযোগ-অনুযোগ করে এত বড় সাওয়াব থেকে মাহরূম হওয়া মস্তবড় বোকামি। বন্ধুগণ! আল্লাহ পাকের ফয়সালার উপর সর্বাবস্থায় রাজি থাকা অত্যাবশ্যকীয়। তাই তাঁর ফয়সালার বিরুদ্ধে কোন শব্দ যেন মুখ দিয়ে বের না হয়, অন্যথায় কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেন সে সদ্য মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হল।

অন্য হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তার কোন দোষ দেখলে গোপন রাখে, তাকে ৪০ বার ক্ষমা করা হয়। আর যে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে রেশমের পোশাক পরাবেন।"

গোসলের সুন্নত তরীকা

যে খাটে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হবে, প্রথমে তাতে আগর বাতি অথবা অন্য কোন সুগন্ধি দ্বারা তিন বার, পাঁচ বার অথবা সাত বার ধোঁয়া দিবে। অতঃপর মাইয়্যেতকে উক্ত খাঠের উপর রেখে মোটা কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে শরীরের অন্যান্য কাপড় খুলে ফেলবে। অতঃপর ঢিলা ও পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিয়ে (হাতের কব্জি ধৌত করা ব্যতীত এবং কুলি ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া) নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করাবে এবং আঙ্গুলে কাপড় পেঁচিয়ে দাঁত ও নাক পরিষ্কার করে দিবে। এরপর নাক, কান ও মুখে তুলা ভরে দিবে যাতে পানি ঢুকতে না পারে। (মৃত ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ হয়ে থাকলে বা হায়েজ নেফাস অবস্থায় মৃত্যু হলে কুলি করানো ও নাকে পানি দেয়া জরুরী)। তার পর মাথা (যদি মাথায় চুল থাকে) এবং দাড়ি 'খিত্‌মী' দ্বারা ধৌত করবে। খিত্‌মী না থাকলে সাবান দ্বারা। অতঃপর মাইয়্যেতকে বাম কাতে শায়িত করে বরই পাতা সিদ্ধ গরম পানি তিনবার ডান কাতের উপর ঢালবে, যাতে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে যায়। তারপর ডান কাতে শায়িত করে বাম কাতে তিনবার পানি ঢালবে, যেন সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে যায়। তারপর বসিয়ে হালকাভাবে পেটে চাপ দিবে। কোন কিছু বের হলে ধুয়ে নিবে। তারপর আবার বাম কাতে শোয়াবে এবং সমস্ত শরীরে তিনবার কর্পূর মিশ্রিত পানি ঢালবে, অতঃপর সারা শরীর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলবে। মাথা এবং দাড়িতে আতর লাগাবে। কপালে, নাকে, উভয় হাতে, হাঁটুতে এবং উভয় পায়ে কর্পূর লাগাবে।

গোসল সংক্রান্ত কিছু জরুরী মাসায়েল

গোসলদাতা মাইয়্যেতের নিকটাত্মীয় হওয়া ভাল। তারা ভালভাবে গোসল দিতে না জানলে অন্য কোন দ্বীনদার লোক গোসল দিবে। গোসলের স্থান কোন কিছু দিয়ে আড়াল করা মুস্তাহাব, যাতে গোসলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কেউ দেখতে না পারে। গোসল দেয়ার পর গোসলদাতার জন্য গোসল করে নেওয়া মুস্তাহাব। কাফের, ঋতুবতী এবং গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল দেয়া মাকরূহ। মাইয়্যেতকে ইস্তিঞ্জা করানোর সময় হাতে মোটা কাপড় বেঁধে নিবে। যেমনিভাবে জীবিত লোকের সতর দেখা ও স্পর্শ করা হারাম তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তির সতর দেখা ও (সরাসরি) স্পর্শ করাও হারাম। পুরুষ কোন মহিলাকে, মহিলা কোন পুরুষকে গোসল দিতে পারবে না, তবে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। গোসল দেয়ার সময় মাইয়্যেতের কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা গোপন রাখবে। ভাল কিছু দেখলে প্রকাশ করবে।

কাফন প্রসঙ্গ

কাফন দেয়া ফরজে কেফায়া। পুরুষের জন্য তিন কাপড় ও মহিলার জন্য পাঁচ কাপড় সুন্নত।

পুরুষের তিন কাপড় : (১) লেফাফা অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা চাদর (২) ইযার, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তবে লেফাফা ইযার থেকে বড় হবে, যাতে উভয় প্রান্তে মুঠ করে বাঁধা যায় (৩) কামিস, গলা, থেকে পার্যন্ত।

মহিলাদের পাঁচ কাপড় ঃ (১) লেফাফা (২) ইযার (৩) কামিস (৪) সারবন্দ অর্থাৎ ওড়না যা দ্বারা মাথা ঢাকা হয়, (৫) সিনাবন্দ, বগল থেকে হাটু পর্যন্ত লম্বা কাপড়।

পুরুষদের কাফন পরানোর নিয়ম

খাটের উপর প্রথমে লেফাফা বিছাবে তার পর ইযার। তারপর মাইয়্যেতকে কামিস পরিয়ে ইযারের উপর শোয়াবে। অতঃপর বাম দিক থেকে ইযার ভাঁজ করে মাইয়্যেতের শরীরের উপর উঠিয়ে দিবে, তারপর ডান দিক ভাঁজ

করবে, যাতে ডান পার্শ্বের কাপড় উপরে থাকে। তারপর উক্ত নিয়মে লেফাফা ভাঁজ করবে। মাথা ও পায়ের দিকে কাফনের উভয় প্রান্ত বেঁধে দিবে এবং কোমর বরাবরও একটি বাঁধ দিবে যাতে নেয়ার পথে খুলে না যায়।

মহিলাদের কাফন পরানোর নিয়ম

প্রথমে খাটে উপর লেফাফা তারপর ইযার বিছাবে। অতঃপর কামিস পরিয়ে মাইয়্যেতকে ইযারের উপর শোয়াবে। এরপর চুলকে দু'ভাগ করে একভাগ ডান দিক থেকে অপর ভাগ বাম দিক থেকে বুকের উপর উঠিয়ে দিবে। তারপর (সারবন্দ দ্বারা মাথা এবং চুল ঢেকে দিবে। অতঃপর পুরুষের ন্যায় বাম দিকে থেকে ইযার ভাঁজ করে শরীরের উপর উঠিয়ে দিবে। তারপর ডান দিক থেকে ভাঁজ করে উঠিয়ে দিবে।) তারপর সিনাবন্দ পরাবে। অতঃপর লেফাফা ভাঁজ করবে। প্রথমে বাম দিক, পরে ডান দিক। মাথা, কোমর ও পায়ের দিকের কাফন বেঁধে দিবে। সিনাবন্দ লেফাফার উপরও পরানো যেতে পারে। কাফন পরানোর পূর্বে কাপড়গুলোকে তিন বার, পাঁচ বার অথবা সাত বার আগর বাতির ধোঁয়া দেওয়া মুস্তাহাব। কাফনের কাপড় সাদা হওয়া ভাল।

মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে করণীয়

যদি কোন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে তার নাম রাখবে এবং গোসল দিবে। তবে সুন্নত অনুযায়ী কাফন পরিয়ে জানাজার নামাজ পড়বে না। বরং কাপড়ের টুকরোতে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মারা গেলে তার গোসল ও জানাযা

কোন দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে তার গোসল ও জানাযার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, দুর্ঘটনায় তার দেহের কতটুকু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি তার সম্পূর্ণ দেহ বা দেহের অধিকাংশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় কিংবা টুকরো টুকরো হয়ে যায় বা থেতলে (ছেঁচে) শরীরের গঠন শেষ হয়ে যায়, এমনিভাবে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বা পানিতে পড়ে ফুলে ফেঁটে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তাহলে এসব সূরতে তাকে গোসল দেয়া হবে না এবং তার উপর জানাযার নামাজও পড়া হবে না। বরং তাকে একটি কাপড়ে মুড়িয়ে দাফন করে দেয়া হবে।

আর যদি দেহের অধিকাংশ অথবা মাথাসহ অর্ধেকাংশ অক্ষত থেকে বাকি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সুন্নত ত্বরীকায় গোসলও দেয়া হবে এবং তার উপর জানাযাও পড়া হবে।

আর যদি সম্পূর্ণ দেহের গঠন ঠিক থাকে কিন্তু ফুলে এমন হয়ে যায় যে, হাতে স্পর্শ করলে বা বেশী নাড়াচাড়া করলে ফেঁটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, এরকমভাবে কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ার কারণে যদি এই অবস্থা হয় যে, বেশী নাড়াচাড়া করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তার উপর শুধু পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট হবে; সুন্নত ত্বরীকায় গোসল দিতে হবে না এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে। আর এভাবেও সম্ভব না হলে শুধু তায়াম্মুম করিয়ে জানাযা পড়ে নিবে। তবে শুধু দেখতে খারাপ দেখা যাওয়া বা ক্ষত থেকে রক্ত জারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে গোসল দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না।

জানাযার নামায

জানাযার নামাজ ফরজে কেফায়া। জানাযার নামাযে ফরজ দু'টি যথাঃ-

১। চার তাকবীর বলা,

২। দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

জানাযার নামাযে সুন্নত চারটি যথাঃ-

১। ছানা পড়া,

২। দুরূদ শরীফ পড়া,

৩। দোআ পড়া,

৪। ইমামের জন্য মাইয়্যেতের সিনা বরাবর দাঁড়ানো।

নামাযে জানাযা পড়ার নিয়ম

মাইয়্যেতকে সামনে রেখে ইমাম সাহেব তার সিনা বরাবর দাঁড়াবেন এবং সকলে নামাযের নিয়ত করবে। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে হাত বেঁধে ছানা পড়বে।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

এরপর হাত উঠানো ছাড়া- اَللهُ اَكْبَرْ বলে দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর হাত উঠানো ছাড়া আবার- اَللهُ اَكْبَرْ বলবে, অতঃপর মাইয়্যেত বালেগ হলে (পুরুষ হোক বা মহিলা) নিম্নের দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

পক্ষান্তরে যদি মাইয়্যেত না-বালেগ হয়, তাহলে ছেলে হলে নিম্নের এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

আর মেয়ে হলে এই দোয়াই পড়বে তবে শুধুমাত্র اِجْعَلْهُ এর স্থানে اِجْعَلْهَا এবং شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا এর স্থানে شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً পড়বে। তারপর হাত উঠানো ছাড়া اَللهُ اَكْبَرْ বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে।

কতিপয় জরুরী মাস্‌আলা

* জানাযার নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা বিদআত ও মাকরূহে তাহরীমী।
* মসজিদের ভিতরে বিনা ওজরে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ।
* অনুমতি ছাড়া অন্যের জমিনে নামায পড়া মাকরূহ।
* জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে রাস্তায় জানাযার নামায পড়া মাকরূহ।
* গায়েবানা জানাযার নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীমী।
* জানাযার নামাযে ইমাম সাহেব তাকবীর বলার পর কোন ব্যক্তি হাজির হলে সে মসবূক হিসেবে গণ্য হবে। জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে মসবূকের হুকুম হল, অন্যান্য নামাযের ন্যায় এসেই তাকবীর বলে শরীক হবে না, বরং পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করে ইমামের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলে নামাযে শরীক হবে। ইমামের সালামের পর বাকী নামায আদায় করবে।
* দোয়া-দুরূদ সহকারে বাকী নামায আদায় করতে গেলে যদি জানাযা (খাট) উঠিয়ে নেওয়ার আশংকা হয় তাহলে শুধুমাত্র ছুটে যাওয়া তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

* একটি লাশের উপর শুধুমাত্র একবারই জানাযার নামায পড়া যায়, তবে অভিভাবকের অজান্তে বা অভিভাবকের নিষেধ অমান্য করে যদি কেউ পড়ে ফেলে, তাহলে অভিভাবক ইচ্ছা করলে পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে। আর উক্ত জানাযায় শুধুমাত্র ঐ সব লোকেরাই অংশ নিতে পারবে যারা পূর্বের নামাযে জানাযায় শরীক ছিল না।
* গোসলদাতা ছাড়া মৃতব্যক্তিকে গোসল করানোর মত লোক আরো থাকলে গোসলদাতা বিনিময় নিতে পারবে। তবে না নেয়াই ভাল। আর যদি সে ছাড়া গোসল দেয়ার মত কোনো লোক না থাকে, তাহলে বিনিময় নিতে পারবে না। বরং তখন মৃতকে গোসল করানো তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

লাশ বহন করার নিয়ম

লাশ বহন করার মুস্তাহাব তরীকা হল, জানাযা বহনকারী প্রথমে জানাযার সামনের ডান দিক ডান কাঁধে বহন করে দশ কদম, তারপর পিছনের ডান দিক ডান কাঁধে বহন করে দশ কদম, তারপর সামনের বাম দিক বাম কাঁধে বহন করে দশ কদম, তারপর পিছনের বামদিক বাম কাঁধে বহন করে দশ কদম চলবে। এভাবে চল্লিশ কদম চলার পর স্বাভাবিকভাবে পথ চলবে। এ নিয়মটি শুধু একজনের জন্যই প্রযোজ্য।

সুন্নত তরীকার কবর

কবরের গভীরতা মাঝারি ধরনের উচ্চতা সম্পন্ন ব্যক্তির অর্ধেক পরিমাণ হলে যথেষ্ট। তবে পূর্ণ এক পুরুষ পরিমাণ গভীর করা উত্তম। এরচেয়ে গভীর করা উচিত নয়। কবরের দৈর্ঘ্য মুরদারের অনুপাতে ও প্রস্থ মুরদারের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক পরিমাণ হতে হবে।

কবর বগলী হওয়া সুন্নত

বগলী কবর খনন করার নিয়ম : প্রথমে যথারীতি পূর্ণরূপে একটি কবর খনন করবে, অতঃপর গর্তের সমতল থেকে কিবলার দিকে মৃতের দেহ অনুপাতে একটি গর্ত খনন করবে, যার অভ্যন্তরে মাইয়্যেতকে সুন্দরভাবে ডান কাতে রাখা যায়। বালি মাটি বা মাটি নরম হওয়ার

কারণে যদি বগলী কবর খনন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সিন্দুকী কবর খনন করবে।

সিন্দুকী কবর খনন করার নিয়ম : যথারীতি পূর্ণ কবর খননের পর কবরের মধ্যভাগে মৃত ব্যক্তির দেহ অনুপাতে খালের মতো একটি গর্ত খনন করবে, যার মধ্যে মৃতের দেহ *ডান কাত করে ভালভাবে রাখা যায়।*

দাফনের বিধান

দাফনের সুন্নত তরীকা : জানাযার নামায আদায়ের পর যথারীতি মৃতকে দাফন স্থলে নিয়ে গিয়ে কবরের পশ্চিম পাড়ে এভাবে রাখবে যেন কিবলা মৃতের ডান পাশে থাকে। মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষ কবরে নামবে। নেককার, আমানতদার, সবল ও মৃতের আত্মীয়দের কবরে নামা মুস্তাহাব। অবশ্য মহিলার লাশ হলে, তার মাহরাম পুরুষরাই কবরে নামাবে। তাদের অবর্তমানে অন্যান্য নিকট আত্মীয়গণ এবং তাদের কেউ উপস্থিত না থাকলে বৃদ্ধ পুরুষগণ মহিলার লাশ কবরে নামাবে। লাশ কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পড়বে ঃ- بِسْمِ اللهِ وَعَلى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ মাইয়্যেতকে কবরে রাখার পর পুনরায় উক্ত দোয়া পড়বে।

মৃতব্যক্তিকে পূর্ণ ডান কাতের উপর এমনভাবে শোয়াবে যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত পূর্ণ শরীর কিবলামুখী হয়ে যায়। অতঃপর কাফনের বাঁধন খুলে দিবে। অতঃপর বাঁশ ইত্যাদির দ্বারা (বগল বা সিন্দুক অর্থাৎ) যে স্থানে মাইয়্যেতকে রাখা হয়েছে এর মুখ বন্ধ করে দিবে। তারপর হাত, কোদাল বা অন্যকিছুর সাহায্যে মাটি ফেলে কবর ভরাট করে ফেলবে। উটের কুঁজের ন্যায় কবর এক বিঘত উঁচু করবে। তারপর কবরের উপর জরুরত হলে কিছু পানি ছিটিয়ে দিবে। কবরের উপর সুবজ ডাল স্থাপন করা যেতে পারে, তবে এটাকে জরুরী মনে করা বিদআত। দাফন স্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য উভয় হাতের আঁজলা ভরে তিনবার কবরে মাটি ফেলা মুস্তাহাব। প্রথম বার মাটি ফেলার সময় مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ দ্বিতীয় বার মাটি ফেলার সময় وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ তৃতীয় বার মাটি ফেলার সময় وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً

اُخْرٰى পড়বে এবং মৃত ব্যক্তির শিয়রের দিক থেকে মাটি ফেলা আরম্ভ করবে। মৃত ব্যক্তি যে এলাকায় মারা যায় সে এলাকার অধিবাসীদের জন্য ব্যবহৃত কবরস্থানে দাফন করা মুস্তাহাব। মহিলাদের দফনের ক্ষেত্রে পূর্বে কবর খানা কাপড়, চাদর বা এমন কোন জিনিস দ্বারা ঘিরে ফেলবে যদ্দারা সম্পূর্ণ পর্দা হয়ে যায়। বাঁশ দ্বারা কবরের আভ্যন্তরীণ গর্ত বন্ধ করার পর মাটি ভরাট করার পূর্বেই উক্ত চাদর বা পর্দা খুলে ফেলা যাবে। দাফন কার্য সম্পাদনের পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে অবস্থান করে মৃত ব্যক্তিকে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার তাওফীক দানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে এবং কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত মোট পাঁচ আয়াত আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত মোট দু' আয়াত তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

কবর জিয়ারত

পুরুষদের জন্য কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। সপ্তাহে অন্তত একবার কবর জিয়ারত করবে। শুক্র, শনি, সোম ও বৃহস্পতিবারে জিয়ারত করা উত্তম।

কবর জিয়ারতের আদব : ওযু অবস্থায় জিয়ারত করা। সম্ভব হলে মৃতের পায়ের দিক থেকে কবরের নিকটে যাবে। অন্যথায় মাথার দিক থেকে গেলেও কোন অসুবিধা নেই। কিবলার দিককে পিছনে রেখে মৃত ব্যক্তির চেহারার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ ভাবে সালাম দিবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

অতঃপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দোয়া-দুরূদ পড়বে। যথাসম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করবে। সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত ও সূরা ইখলাস তিনবার, সাতবার অথবা এগার বার পড়ে মাইয়্যেতের আমলনামায়

এসবের ছাওয়াব পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করবে।

নামায-রোযার ফিদিয়া বা কাফ্ফারা

বালেগ হওয়ার পর থেকে জিন্দেগীতে যত নামায বা রোযা ছুটে গেছে এবং কাযা আদায় করা হয়নি, সে সব নামায-রোযার ফিদিয়া বা কাফ্ফারা আদায় করার ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব এবং তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে উক্ত ওসিয়ত আদায় করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব। অসিয়ত না করে মারা গেলে বালেগ ওয়ারিশগণ যদি নিজেদের সম্পদ থেকে মৃতের ফিদিয়া বা কাফ্ফারা আদায় করে দেন, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মৃতকে ক্ষমা করে দিবেন। কোন ব্যক্তি যদি এক দিনের বেশী সময় অজ্ঞান থাকে অথবা এতই অসুস্থ হয় যে, ইশারা করেও নামায পড়া সম্ভব নয়, তাহলে উক্ত সময়ের নামায-রোযার কাযা ও কাফ্ফারা কোনটিই ওয়াজিব নয়। এক রোযার ফিদিয়া এক ফিৎরার সমান অর্থাৎ ১৬৩৬ গ্রাম গম বা তার মূল্য গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের কাফ্ফারা এক ফিৎরার সমান। বিতির নামাযসহ দৈনিক ছয় ওয়াক্ত নামায হিসাব করে কাফ্ফারা দিতে হয়।

মৃত ব্যক্তিকে ছাওয়াব পৌঁছানোর উত্তম পদ্ধতি

হাদীস শরীফে আছে ঃ "মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব বন্ধ হয় না ১। ছদকায়ে জারিয়া ২। ইলম, যদ্দারা মানুষের উপকার সাধিত হয়, ৩। নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" অতএব নিজের জন্য এসব আমল করে যাওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্যও দ্বীনি ইলমের খেদমত হয়, কোন গরীব গোরাবার উপকারে আসে এমন কাজ কোন আলেমে হক্কানী রাব্বানীর পরামর্শ মোতাবেক করা উচিৎ। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রচলিত বিদআত-কুসংস্কার

♦ কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা।

♦ গোসলের পূর্বে লাশের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা।

♦ মুমূর্ষু বা মৃত ব্যক্তির পাশে বসে অনর্থক কথা বলা।

♦ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা পড়ার জন্য নির্দেশ করা বা পীড়াপীড়ি করা।

♦ জীবিত অবস্থায় যাদের সাথে দেখা দেয়া না জায়েয তারা মৃতকে দেখা ♦ নখ কাটা, দাড়ি, মোচ ইত্যাদি সেভ করা।

♦ গোসল ও দাফন-কাফনে বিলম্ব করা।

♦ জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা।

♦ কালেমা বা কুরআনের আয়াত খচিত কোন চাদর লাশের খাটিয়ার উপর ব্যবহার করা।

♦ অনন্যোপায় অবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও লাশ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করা।

♦ গায়েবানা জানাযা পড়া।

♦ একাধিক বার জানাযা পড়া।

♦ জানাযার সাথে চলার সময় সরবে কালিমায়ে শাহাদাৎ ইত্যাদি পড়া।

♦ কবর বাঁধাই করা। সাধারণ ব্যক্তির কবরে নাম ফলক লাগানো।

♦ জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে এ মর্মে দাওয়াত দেওয়া যে অমুক দিন মরহুমের কুলখানি হবে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

♦ তিন দিনা, চার দিনা ও চল্লিশা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা।

♦ কবরে ফুল দেওয়া, মোমবাতি জ্বালানো।

♦ জানাযা পড়ে অথবা মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া-কালাম ও খতম ইত্যাদি পড়ে কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা।

♦ ওরশ বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।

♦ যেই কবর বা মাজারে বিদআত বা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করা হয়, সে কবর বা মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া।

♦ মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদারী করা, ব্যবহৃত কাপড় ফকির মিসকীনকে দান করা বা স্মৃতি হিসাবে কেউ নিয়ে যাওয়া নাজায়েজ। ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ না-বালেগ থাকলে সে অনুমতি দিলেও তা জায়েয হবে না।

তথ্যসূত্র / গ্রন্থপঞ্জি

❖ কুরআন শরীফ ❖ মাআরেফুল কুরআন ❖ বুখারী শরীফ ❖ মুসলিম শরীফ ❖ তিরমিযী শরীফ ❖ মিশকাত শরীফ ❖ বাযলুল মাজহুদ ❖ আল-বাহরুর রায়েক ❖ ফাতহুল বারী ❖ বাদাইউস সানায়ে' ❖ তাহ্তাবী আলাল্ মারাকী ❖ আলমগীরী ❖ মাহ্মুদিয়া ❖ বেহেশতী জেওর ❖ ইলমুল ফিক্হে ❖ আহ্সানুল ফাতাওয়া ❖ দারুল উলূম জাদীদ ও কাদীম ❖ ইমদাদুল ফাতাওয়া ❖ ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ❖ কিফায়াতুল মুফতী ❖ মাজমাউল আনহুর ❖ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ❖ জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ❖ আহকামে মাইয়্যেত ❖ সমকালীন জরুরী মাসায়েল ❖ তাবারানী ❖ মুস্তাদরাক।

যিকির : হৃদয়ের প্রশান্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ :
فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . [87]

صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ .
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

যে আমলটি বেশি করার তাগিদ এসেছে

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন, শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ ও দিল-দেমাগ ভালো রেখেছেন। এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে- যে ব্যক্তি ইশা এবং ফজর নামায জামাতের সাথে আদায় করল তার সারা রাত নফল ইবাদতে কাটল।

এখনকার আলোচ্য বিষয় হল আল্লাহ পাকের যিকির। কুরআন-হাদীসে যে কাজটাকে বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে তার নাম হল যিকির। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– وَاذْكُرُو اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর, যাতে তোমরা

৮৮. সূরা জুমুআহ : ১০

সফলকাম হতে পারো। আরেক আয়াতে এসেছে– وَاذْكُرُو اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো।

এসব আয়াতে বেশি বেশি যিকির করতে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ বান্দার জন্য যে জিনিসের প্রয়োজন বেশি আল্লাহ পাক সেটাকেই বেশি করতে বলেছেন।

শান্তির ঠিকানা

মানবদেহে শান্তির জায়গা হল অন্তর। আর শান্তি আল্লাহ পাক রেখেছেন যিকিরের মধ্যে। গোটা দুনিয়া শান্তির জন্য পাগলপারা। পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে তা শান্তির জন্যই হচ্ছে। একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে, তার উদ্দেশ্য কী? তার উদ্দেশ্য শান্তি। কৃষক এত কষ্ট এজন্য করেছে যে, এ কষ্টের আড়ালে শান্তি রয়েছে। সকলেই শান্তির প্রত্যাশী। দুনিয়ার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বড় বড় শক্তি ও দেশগুলো কত শ্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু যতই শ্লোগান দেয়া হচ্ছে, যতই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে দিন দিন পৃথিবী ততই অশান্তির অনলে উত্তপ্ত হচ্ছে। শান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে না; বরং শান্তি হ্রাস পেয়ে অশান্তি বাড়ছে। ব্যক্তি পর্যায়ে, পারিবারিক পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দিন দিন শান্তি বাড়ছে না; বরং উদ্বেগজনকহারে হ্রাস পাচ্ছে এবং অশান্তি বাড়ছে। কারণ, দুনিয়াকে শান্তিময় করার জন্য যারা চেষ্টা চালাচ্ছে তারা ঠিকানা ভুল করে ফেলেছেন। শান্তির জন্য যেখানে হাত দেয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে হাত না দিয়ে অন্যখানে হাতড়াচ্ছে। শান্তির ঠিকানা আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। শান্তি কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তা সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। দুনিয়ায় যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার মেহনত করছেন তারা হয়ত কখনো এ বিষয়টি চিন্তায় আনেননি যে, আমরা যে শান্তি নিয়ে লাফালাফি করছি- এ শান্তি কোনো দেশে তৈরি হয় কি-না। এ শান্তির কোনো ফ্যাক্টরী আছে কি-না। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, শান্তি উৎপাদিত হওয়ার কোনো ফ্যাক্টরী বা দেশ নেই।

শান্তির যদি কোনো দেশ বা ফ্যাক্টরী না থাকে তাহলে শান্তি নামক বস্তুটি আসে কোত্থেকে? পৃথিবী এত উন্নতি সাধন করার পরও, এত বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কার ও তৈরি করার পরও কোনো দেশ বা সংস্থা

কেন দাবি করতে পারে না যে, আমরা শান্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা শান্তি নির্মাণ করে বিশ্ববাজারে রফতানী করি। এ দাবি কেউ করতে পারেনি। তাই সকলকেই চিন্তা করা দরকার যে, এ শান্তি আসলে কোথায় পাওয়া যাবে? আল্লাহ তা'আলা শান্তির ঠিকানা দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সেটা পাঠ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سورة الرعد : 28)

অর্থাৎ, শান্তি এমন জিনিস যেটা একমাত্র আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে। কাউকে বানানোর ক্ষমতাও দেইনি, বিতরণের ক্ষমতাও দেইনি। অনেক কোম্পানী পণ্য প্রস্তুত করে অন্যদেরকে ডিলার বানিয়ে সারা দেশে বিতরণ করে। আল্লাহপাক বলেন, আমি শান্তি নামক বস্তুটির ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা রাখিনি, কাউকে বানানোর সুযোগও দেইনি, আবার ডিলারী সিস্টেমে বিতরণের সুযোগও দেইনি। এটা আমার নিজের কাছে রেখেছি। পেতে হলে আমার সাথে যোগাযোগ করে পেতে হবে। এজন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেন, আমার ভিতর এমন শান্তি রয়েছে, যদি মোগল সরকার সেটা জানতে পারত এবং সেটা ছিনিয়ে নেয়ার বস্তু হত তাহলে তারা যে কোনোভাবে ছিনিয়ে নিত। এটা আল্লাহপাক রেখেছেন তাঁর কুদরতী হাতে। দিবেন কাকে? যে মাওলায়েপাকের সাথে যোগাযোগ করবে তাকে দিবেন। যে মাওলাকে স্মরণ করবে সে এ শান্তি পাবে। পবিত্র কুরআন বলে–

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. [৪৪]

মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে যিকিরের মাধ্যমে।

যিকিরের স্তর

এ যিকিরের কতগুলো স্তর রয়েছে। আমরা যে নারকেল ফল খাই তার কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথমে কাগজের মত খুবই পাতলা ও মসৃণ একটি প্রলেপ রয়েছে। এরপর আরেকটি স্তর রয়েছে খুব খসখসে। ছোবার আবরণ। এরপর আরেকটি স্তর রয়েছে যেটাকে আমরা মালা বা আইচা বলি। এ তিনটি স্তরের আবরণ ভেদ করে ভিতরের নারকেল নামক সুস্বাদু অংশটি খাওয়া যাবে। এভাবে যিকিরের মধ্যেও তিনটি স্তর

৮৯. সূরা রা'আদ : ২৮

রয়েছে। যিকিরের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে সকল স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে। যিকিরের সবক শুরু করেই সে স্তরে পৌঁছা যাবে না। কেউ যদি চায় যে, নারকেলের মগজটা বাইরে থাকবে আর আবরণগুলো ভেতরে থাকবে তার এ ইচ্ছাটা অবান্তর। কারণ এমতাবস্থায় নারকেল পচে যাবে, খাওয়ার অনুপযুক্ত হবে, খেলে পেটে অসুখ হবে। নারকেলের আসল উদ্দেশ্য তথা মগজে পৌঁছতে হলে যেমন তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয় তেমনিভাবে আল্লাহপাকের যিকিরের স্বাদ অনুভব করতে হলেও এর সবগুলো স্তর অতিক্রম করতে হবে। যিকিরের তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর

একটি স্তর হলো শুধু মুখে আল্লাহর নাম জপা, দিলে এর কোনো প্রভাব না থাকা। অর্থাৎ, অন্য দিকে খেয়াল করে মুখে আল্লাহর নাম জপা। আমাদের নামাযও অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে। অথচ এ নামায আল্লাহপাক কেবল এজন্যই দিয়েছেন যাতে যথাযথভাবে আল্লাহর স্মরণ হয়। ইরশাদ হয়েছে–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۔[89]

আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কয়েম কর। আল্লাহপাক যেই নামাযকে যিকিরের জন্য ফরয করেছেন সে নামাযের মধ্যেই খেয়াল এদিক-সেদিক চলে যায়। আর অন্য সময়ের তো কথাই নেই।

তো একটা যিকির এমন রয়েছে যে, মুখে আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু খেয়াল অন্য দিকে, দিলের মধ্যে আল্লাহর যিকির নেই। এ যিকিরে ফায়দা হবে কি? হ্যাঁ, এ যিকিরেও ফায়দা হবে।

রুহানিয়ত বিবর্জিত এক পণ্ডিত ও দার্শনিক বলেন–

در زباں تسبیح ودردل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح کئے دارد اثر

মুখে তো আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু দিলে আল্লাহ নেই। এসব যিকির দিয়ে কী হবে?

৯০. সূরা ত্বহা : ১৪

রুহানিয়্যত বিবর্জিত ঐ পণ্ডিতের কবিতাটি যখন রুহানিয়্যতসম্পন্ন পণ্ডিত হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কানে পৌঁছেছে তখন তিনি বলেন, সে তো ভুল বলেছে। তারপর তিনি তার কবিতাটি সংশোধন করে বলেন–

در زباں تسبیح ودردل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح هم دارد اثر

যদি মুখের মধ্যে আল্লাহর যিকির থাকে কিন্তু অন্তরে না থাকে; বরং অন্তরে দুনিয়াবী জল্পনা-কল্পনা থাকে- এ ধরনের যিকিরেরও বিরাট প্রভাব রয়েছে। এরূপ যিকিরের মধ্যেও আছর রয়েছে। হয়ত আছরটি অল্প পরিমাণে হবে। কেননা এটা এমন সত্তার নাম যার নাম মুখ দিয়ে ভুলক্রমে বের হলেও কাজ হয়ে যায়।

একটি ঘটনা

এক পৌত্তলিক মূর্তিপূজা করত। আরবীতে মূর্তিকে 'সানাম' বলা হয়। সে নিয়মিত মূর্তির নাম জপত আর বলত ইয়া সানামু! ইয়া সানামু! এ সানাম সানাম জপতে জপতে তার তন্দ্রা এসে যায়। তন্দ্রাচ্ছলে মুখ দিয়ে বের গেছে 'ইয়া সামাদু'। সানাম আর সামাদের উচ্চারণ তো কাছাকাছি। 'সানাম' অর্থ তো মূর্তি আর 'সামাদ' আল্লাহপাকের গুণবাচক নাম। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔[90]

সামাদ অর্থ হল, এমন বেনিয়াজ সত্তা, যিনি কারো কাছে মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী নন; বরং সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। নবীও মুহতাজ, অলীও মুহতাজ, রাষ্ট্রপতিও মুহতাজ, প্রধানমন্ত্রীও মুহতাজ, ধনীও মুহতাজ, গরীবও মুহতাজ। পৃথিবীর সবাই যার দয়া-মায়ার মুহতাজ তিনি হলেন সামাদ। মূর্তিপূজকের মুখ দিয়ে যখন উচ্চারিত হল ইয়া সামাদু! তখন হঠাৎ আওয়াজ এলো—লাব্বাইকা ইয়া আবদী! হে আমার বান্দা! আমি হাজির। তোমার কী প্রয়োজন? তুমি আমাকে কেন ডাকছ? মূর্তিপূজক আওয়াজ শুনে হতভম্ব হয়ে গেল—এ আওয়াজ কোত্থেকে এলো! পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছে যে, সে তো আহ্বান করছিল সানামকে কিন্তু

৯১. সূরা ইখলাছ : ১-২

ভুলে মুখ দিয়ে মুসলমানদের প্রভু সামাদের নাম বের হয়ে গেছে। আর তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তখন সে ভাবল ভগবান সানামের নাম জপে জপে জীবন কাটিয়ে দিলাম অথচ একবারও সে সাড়া দেয়নি, অথচ মুসলমানদের খোদা সামাদের নাম ভুলে একবার ডাকার সাথে সাথে তিনি সাড়া দিয়ে ফেললেন। আমি তাহলে সানামকে আর কেন ডাকব, এখন থেকে সামাদকেই ডাকব। এরপর লোকটি মুসলমান হয়ে গেল।

দোস্ত! এবার চিন্তা করুন! রুহানিয়তের কত প্রয়োজন। রুহানিয়ত না থাকলে অনেক কিছু বোঝা যায় না। রুহানিয়তের দৌলত থেকে বঞ্চিত এক পণ্ডিত বলেছে দিলে আল্লাহর স্মরণ নেই এমন যিকিরে লাভ নেই। কিন্তু আল্লাহর আরেফ বলেন, এমন যিকিরেও লাভ রয়েছে। কেমন লাভ? মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটি শুকরিয়া রয়েছে। দিলের শুকরিয়া হল দিলকে আল্লাহর ধ্যান-খেয়ালে নিমগ্ন রাখা। আর মুখের শুকরিয়া হল মুখে আল্লাহর নাম জপতে থাকা। আল্লাহর নাম জারী রাখা। দিলে আল্লাহর নাম না থাকলে দিলের শুকরিয়া বাদ গেল। কিন্তু মুখে বললে তো মুখের শুকরিয়া আদায় হল। এটাও অনেক ফায়দা। যদিও কাঙ্ক্ষিত ফায়দা পেতে আরও সামনে অগ্রসর হতে হবে।

দ্বিতীয় স্তর

যিকিরের আরেকটি স্তর হল মুখে আল্লাহর নাম নেই কিন্তু দিলে আছে। এটাও একটা স্তর। এটাকেই বলে– دست بکار دل بیار হাত কাজে আছে, দিল আল্লাহর সাথে যুক্ত। মুখে হয়ত কারো সাথে কথা বলছে কিন্তু দিলে আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল বিরাজমান। এমনও হয়।

যেসব মুরুব্বীদের উসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ লাইনে রেখেছেন। মাওলা যদি লাইনে না রাখেন তাহলে এক সেকেন্ডও থাকা সম্ভব নয়। অনেক ধোঁকা চলে আসে। নফসের ধোঁকা বড় সূক্ষ্ম।

বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) একবার একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন- আব্দুল কাদির! আমি তোমার প্রতি এত রাজি-খুশি হয়েছি যে, তোমার আর ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে না। তিনি একথা শোনার পর উপরের দিকে তাকালেন। দেখেন যে, শয়তান আরশ সাজিয়ে বসে আছে। তিনি বললেন, লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, শয়তান তুই দূর হো। দুনিয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের চেয়ে আর বড় আবেদ কে হবে? তাঁর জন্যও তো আল্লাহ পাক ইবাদত মওকুফ করেননি। আমার জন্য মওকুফ হল। আর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর لاحول ولاقوة الا بالله-এর ধাক্কায় শয়তানের আরশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এবার শয়তান কথার ঢং বদল করে বলল, আব্দুল কাদির! তোমার মতো এ স্তরে আসার পর অসংখ্য বুযুর্গকে আমি গোমরাহ করে দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে গোমরাহ করতে পারলাম না তোমার ইলমের কারণে, তোমার ইলম তোমাকে রক্ষা করেছে। আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমার আমলের কোনো ক্ষমতা নেই আমাকে রক্ষা করার। আমার মাওলা আমাকে রক্ষা করেছেন।

এবার বোঝুন, শয়তানের ধোঁকা কত ধরনের হয়ে থাকে এবং এটাও বুঝুন যে, আমরা মাওলায়ে পাকের কতটা মুহতাজ। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্যও আমরা মাওলারই মুহতাজ। মাওলার পক্ষ থেকে সাহায্য না হলে আমার নফস কিংবা শয়তান আমাকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিবে।

হযরত মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী (রহ.) আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, হে আল্লাহ! যে মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বেশি ধ্বনি সে মুহূর্তেও আমি আপনার সব চাইতে বেশি মুহতাজ, আর যখন গরীব থাকি তখন আমি কেন আপনার মুহতাজ হব না।

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমার নাম ও পরিচয় হল আমি মুহতাজ ফকীর এবং মুখাপেক্ষী। যে মুহূর্তে দুনিয়ার মানুষ আমাকে ধনি বলবে সে মুহূর্তেও কিন্তু আমি আপনার কাছে ফকীর ও মুহতাজ। তখনও আমি আপনার দয়া ও মায়ারই মুহতাজ। ধনি বলতে কেবল সম্পদের ধনি উদ্দেশ্য নয়; বরং ইলম-ইরফানের ক্ষেত্রে ধনি হওয়াও উদ্দেশ্য, এ ক্ষেত্রেও নিজেকে বড় মনে করার সুযোগ নেই। মানুষ যদি আমাকে বড় আলেম, মুফতী ও বুযুর্গ মনে করে সে মুহূর্তেও আমি মাওলারই মুহতাজ। এ ধনাঢ্যতা আমার নিজের শক্তিতে অর্জিত হয়নি; বরং একমাত্র মাওলায়ে পাকের মেহেরবানী ও ভিক্ষার উসিলায় হয়েছে। এজন্য নিজেকে কিছু একটা ভাবার সুযোগ নেই। আল্লাহপাক যদি কোনো বড় পদে আসীন করান সে মুহূর্তে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি মুহতাজ ভাবতে হবে।

যিকিরের স্তর বর্ণনা করছিলাম। একটি স্তর তো হল মুখে আল্লাহর যিকির আছে, কিন্তু দিলে নেই। আরেকটি স্তর হল মুখে নেই, তবে দিলে আছে। এ দ্বিতীয় স্তর সম্পর্কে আমাদের মুরুব্বীদের একটি ঘটনা বলতে চেয়েছিলাম। দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় একবার মুফতী শফী (রহ.) সহ কয়েকজন বড় বড় আলেম একত্রিত হয়ে কোনো বিষয়ে মতবিনিময় করছিলেন। এক পর্যায়ে কোনো কথার প্রসঙ্গ ধরে খুব হাসি-কৌতুক হল। হাসি-কৌতুকের পর একজন সকলের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা প্রত্যেকে নিজের দিলের দিকে তাকিয়ে বলুন তো এই যে হাসাহাসি ও আনন্দ-ফুর্তি হল, এ মুহূর্তে আমাদের দিলে আল্লাহপাকের স্মরণ ছিল কি-না? সকলেই বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! সে মুহূর্তেও আমাদের দিলে আল্লাহ পাকের ধ্যান-খেয়াল বিরাজমান ছিল। এসব মহান ব্যক্তিরাই বলতে পারেন–

تو ھی مقصود اگر مشغول غیرم
تو ھی مطلوب اگر نزیك دیرم

ওগো মাওলা! অন্য কাজে মশগুল থাকার সময়ও তুমি আমার উদ্দেশ্য, অন্য কারো নিকটে উপবিষ্ট থাকলেও তুমিই আমার কাঙ্খিত সত্তা।

যিকিরের এ স্তরটিও খারাপ নয়। মুখের শুকরিয়া আদায় না হলেও দিলের শুকরিয়া তো আদায় হচ্ছে।

তৃতীয় স্তর

আরেকটা স্তর হল দিলেও আল্লাহর স্মরণ আছে, মুখেও আল্লাহ নামের যিকির আছে। মুখেও আল্লাহ, দিলেও আল্লাহ। দিল এবং মুখ উভয়টির সমন্বয়ে যদি মাওলাকে ডাকা যায় তার দাম কত!

ما در دو جهاں غیر خدا یار نداریم
جز یاد خدا ھیچ دگر کار نداریم

দুনিয়া কিংবা আখেরাতে আল্লাহ ছাড়া কেউ আমার বন্ধু নেই, মাওলার স্মরণ ছাড়া আমার কোনো কাজই নেই।

ماھر چه خواند ه یم فراموش کرده ئیم
اِلاَّ حدیث یار که تکرار می کنیم

যা কিছু জানা ছিল, যা কিছু পড়া ছিল সব ভুলে গেছি, শুধু আমার বন্ধু মাওলায়ে পাকের কথাটিই মনে আছে, বারবার সেটাই বলি। অন্যসব কিছু ভুলে গেছি।

لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
سب خوشیوں کو آگ لگا دو ں غم سے تیرے دل شاد رھے
سب کو نظر سے اپنی گرا دو ں تجھ سے فقط فریا د رھے
اب تو رھے بس تادم آخر وردِ زباں اے مرے اله
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
یه نغمه فصل گل و لا له کے نهیں پابند
بهارهو که خزاں لا اله الا الله
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله

মুমিন বসন্তের কোকিল নয়। ফাগুন-চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। কোকিল পাখি বসন্তকালে গান গায়, অন্য সময় গায় না। এজন্য তাকে বলে বসন্তের কোকিল। হেমন্তকালে ডাকে না। তখন গাছে পাতা থাকে না। প্রকৃতি রুক্ষ থাকে। গাছে ফুল থাকে না। কোকিলের জন্য এ সময়টা পছন্দের নয়। যখন বসন্তকাল আসে তখন গাছের মধ্যে নতুন নতুন পাতা গজায়। বিভিন্ন রকমের ফুল ফোটে। এ দৃশ্যটা কোকিলের কাছে খুব আনন্দদায়ক মনে হয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে খুব ডাকাডাকি করে। সুরেলা কণ্ঠ ছেড়ে গান গায়। ফুল বাগানের রওনক তখন বেড়ে যায়।

মুমিন-মুসলমান বসন্তের কোকিল নয়। এদের কালিমা কেবল বসন্তের কোকিলের ডাক নয়। এটা বসন্তের ডাক, হেমন্তেরও ডাক, তারা খুশির মধ্যেও মাওলাকে ডাকে, দুঃখ-কষ্টেও মাওলাকে ডাকে। কখনো মাওলাকে ভোলে না।

یه نغمه فصل گل ولا له کےنهیں پابند
بهار هو که خزاں لا اله الا الله
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله

ঈমানদার দুনিয়ার মধ্যে যখন সবচাইতে আনন্দঘন মুহূর্তে থাকে তখনও সে তার মাওলাকে ভুলতে পারে না। ঐ আনন্দের ভেতর সে মাওলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আবার যখন খুব বিপদগ্রস্ত হয়, পেরেশান হয়, ঋণগ্রস্ত হয়, দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়, দুনিয়ার সমস্ত আরাম-আয়েশের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় যে, চোখে-মুখে কিছু দেখে না। ঐ মুহূর্তেও ঈমানদার মাওলাকে ভোলে না। ঐ মুহূর্তেও সে মাওলার দরজায়ই ধর্না দেয়।*

* ১২/৩/২০১০ইং সালে ফুলছোঁয়ার মাহফিলে বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান।

আল্লাহর মহব্বত লাভের গুরুত্ব ও উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ [91].

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারে আলমের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, যিনি আমাদেরকে আজ পর্যন্ত হায়াতে রেখেছেন, শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, মন-মগজ ও দিল-দেমাগ ভালো

৯২. সূরা নমল : ৩৪

রেখেছেন। আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর দীনের প্রতি, আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, ইলম ও উলামার প্রতি অন্তরে কম-বেশী মায়া-মমতা দিয়েছেন এবং সে সূত্র ধরে আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছেন–এটা তাঁর অনেক বড় ইহসান ও দয়া।

মানুষের দুর্বলতা ও সক্ষমতা

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল তার দিল বা কলব। মানুষকে আল্লাহপাক অনেক যোগ্যতা দিয়ে তৈরি করেছেন। মানুষকে তথা মানুষের কলবকে অনেক যোগ্যতা দিয়েছেন। দৌহিক দিক থেকে মানুষ অনেক দুর্বল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.[92]

মানুষকে একদম কমজোর করে বানানো হয়েছে।

এমন কমজোর যে, মশার সাথেও কুলিয়ে ওঠা মুশকিল। একজন খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু মশার যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারে না। গতকাল এ সময় খুব ঠাণ্ডা ছিল। সবাই ঠাণ্ডার কারণে কষ্ট পেয়েছেন। আজ এ সময় গরমের কারণে কষ্ট লাগছে। এবার চিন্তা করুন মানুষ কতটা কমজোর! এক মানুষই গতকাল ঠাণ্ডার কারণে সুয়েটার, মাফলার ও চাদর গায়ে দিতে বাধ্য হয়েছে আর আজ ফ্যান না চালালে কষ্ট হচ্ছে। মানুষ সর্বদিক থেকে কমজোর। এখন হয়ত কেউ হাসছে। হঠাৎ এমন একটি সংবাদ এসে যেতে পারে কিংবা এমন কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে, কান্না ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তো বাঁশের একটি সুচালো কঞ্চি পায়ে ফুটলে বিরাট কষ্টের কারণ হতে পারে। অন্ধকারে হাঁটছেন। না দেখার কারণে সামনের কোনো গাছের সাথে মাথা লেগে মাথা ফেটে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা নিজেই এ কমজোরীর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল ও কমজোর করে।

কিন্তু এ কমজোর মানুষ আবার এত দামি ও মূল্যবান যে, জিবরাঈল (আ.) নামক ফেরেশতার চেয়েও অনেক দামি হতে পারে। হযরত আবু বকর (রা.) জিবরাঈল ফেরেশতার চেয়ে অনেক দামী ছিলেন। মানুষের

৯৩. সূরা নিসা : ২৮

মূল্য ও দাম এত বেশি যে, মানুষের জন্যই আল্লাহপাক পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের এত দাম কেন?

মানুষের এত দাম কেন? মানুষের ভেতরে একটি মূল্যবান বস্তু আছে। সেটির কারণে মানুষের এত মূল্য। সেটি হল তার দিল।

مقام انکا ھے دلوں کی خلوتوں میں
خدا جانے مقامِ دل کہاں ھے

মানুষকে আল্লাহ পাক এমন একটা দিল দিয়েছেন যার বিশালতা, ক্ষমতা ও শক্তি এত বেশি যে, আমাদের কল্পনা যেখানে গিয়ে শেষ হবে তার চেয়েও বেশি। পৃথিবীর কোথাও আল্লাহপাকের জায়গা হয় না কিন্তু মানুষের দিলের মধ্যে তাঁর জায়গা হয়ে যায়। অসীম মাওলা যেখানে আসন গ্রহণ করেন সেটা কত অসীম হবে!

দিলের ক্ষমতা

মানুষের দিল যদি 'দিল' হয় তাহলে কেমন ক্ষমতা ও শক্তিশালী হয়, সে সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনুন। এক মুমিন বান্দা পানির জাহাজে সফর করছেন। বিরাট জাহাজ। ইহুদী খ্রিস্টান যাত্রীর সংখ্যা বেশি। গভীর রাত। এক খ্রিস্টান যাত্রী জরুরত সারার জন্য তার রুম থেকে বের হয়েছেন। বাথরুমের দিকে যাবেন। পথিমধ্যে তার কানে 'আল্লাহ আল্লাহ' এর সুমধুর আওয়াজ ভেসে আসছিল। এক দিলওয়ালা মুসলমান তাহাজ্জুদ পড়ে গভীর মহব্বতের সাথে তন্ময় হয়ে আল্লাহর যিকির করছেন। খ্রিস্টান যাত্রীটি যিকিরের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে আসার পথে আবার সেই রুমের সামনে দাঁড়ালেন। যিকিরের মধুরতা অনুভব করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে যিকিরমগ্ন মুসলমানকে লক্ষ করে বললেন, তুমি আল্লাহর নাম জপছ। আমরাও তো ডাকি। আরো বহু মানুষকে ডাকতে শুনি কিন্তু তোমার ডাকটা এত সুমধুর লাগছে কেন? মুসলমান বললেন, আমাদের অন্তরে আল্লাহপাকের প্রতি গভীর মমতা ও মহব্বত রয়েছে। সে মহব্বতের প্রভাবে আমরা আল্লাহকে ডাকলে অনেক স্বাদ অনুভব করি। হয়ত তুমিও সে স্বাদ

কিছুটা অনুভব করতে পেরেছ। লোকটি বলল, আমাকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান বানাও, আমিও এ স্বাদ পেতে চাই। তখন মুসলমান লোকটি তাকে কালিমা পাঠ করিয়ে মুসলমান বানিয়ে দিলেন। এ যাত্রীর মুসলমান হওয়ার ঘটনা প্রচার হওয়ার পর সে জাহাজের আরো অনেক যাত্রী মুসলমান হয়ে যায়।

ফার্সিতে প্রবাদ আছে–

از دل خیزد بر دل ریزد

দিল থেকে কিছু বের হলে আরেকটি দিলে গিয়ে বিঁধে।

দিল এত দামি। আল্লাহ পাকের মহব্বত কারো দিলে এসে গেলে বাস্তবেই সে আল্লাহপাকের নাম জপার মাঝে, আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করার মাঝে এত স্বাদ পাবে যে, দুনিয়ার মানুষকে বলে বোঝানো যাবে না। ঐ লোকটিকে কি কেউ বক্তৃতা করে বোঝাতে পারত যে, আল্লাহ নামের এত স্বাদ আছে। ঐ লোক তো আরেকজন মহব্বতওয়ালা দিলের স্বাদ নিজে অনুভব করেছে। ফলে দিওয়ানা হয়ে গেছে।

انکے نام کی لذت جو بورئے پہ مل گئی
ھم تو سلطنت کے تختوں سے بیزار ھوگئے
انکی راہ میں جوانی جنکی خاك ھوگئی
انکے دردوں کی لذت سے ھم سرشا ر ھوگئے
انکی راہ کے کانٹوں کی عظمت نہ پوچھئے
ساری دنیا کے پھولوں سے بیزار ھوگئے

এ কবিতার মাঝে আল্লাহ পাকের নামে কী স্বাদ রয়েছে সে কথা বলা হয়েছে। কে বলেছেন? আমাদের মত মাদরাসায় পড়ুয়া কোনো আলেম সাহেব বলেননি। হযরত থানভী (রহ.)-এর সাহচর্যে থেকে একজন বড় ইংরেজী শিক্ষিত লোক আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন–

انکی نام کی لذتیں جو بورئے پہ مل گئی
ھم تو سلطنت کے تختوں سے بیزار ھوگئے

আল্লাহর নামের যে মজা আমি এ গাছের নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসে অনুভব করি তা দুনিয়ার রাজত্ব ও রাজমহলের স্বাদের চেয়েও

বেশি। এ স্বাদ পাওয়ার পর আমি সে স্বাদ থেকে বেজার হয়ে গেছি। সে মজা আমার আর প্রয়োজন নেই।

انکی راہ کے کانٹوں کی عظمت نہ پوچھئے
ساری دنیا کے پھولوں سے بیزار ہوگئے

আল্লাহর রাস্তার কাঁটাও এত দামি যে, আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে যদি পায়ে কাঁটা ফুটে সে কাঁটার আঘাতে ও যন্ত্রণায় এত স্বাদ অনুভূত হয় যে, দুনিয়ার ফুলের তোড়াতেও এত খুশি লাগে না।

আল্লাহর মহব্বত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে

দোস্ত! সকল কমতি আমাদের দিলে। আমাদের দিলের রোখ ও গতি ঠিক হয়নি, দিল তৈরি হয়নি। দিলের মধ্যে আল্লাহর যেমন মহব্বত আসার কথা ছিল তা আসেনি। এটা না থাকার কারণে যত সব সমস্যা। এ মহব্বত হল একটি রিমোটকন্ট্রোলার। কন্ট্রোল রুম থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখন যদি কন্ট্রোলরুমের সবকিছু তছনছ হয়ে যায় তাহলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আমাদের দিলটা হল কন্ট্রোল রুম। আর আল্লাহ পাকের মহব্বত হল তার পাওয়ার বা শক্তি। যেটা আমার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। দিলের কন্ট্রোলিং পাওয়ার যখন শেষ হয়ে যায় তখন একেরপর এক আমল ছুটতে থাকে। এজন্য দেখবেন কেউ শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম ঠিক মত পালন করে। সুন্নত, মুস্তাহাব ও আদব পর্যন্ত রক্ষা করে চলে। এর মূল কারণ হল তার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত যথাযথ পরিমাণ রয়েছে। যে পরিমাণে থাকলে এর পাওয়ারটা সে পায় এবং সবকিছু তাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেকের তাহাজ্জুদ ছুটে যায়। মনে করতে হবে তার পাওয়ারে কমতি হয়ে গেছে। আরেক জনের মেসওয়াক ছুটে যায়। মনে করতে হবে তার মাঝে ঐ জিনিসের কমতি হয়ে গেছে। যে পরিমাণ আমল ছুটছে বুঝতে হবে ঐ পরিমাণ মহব্বত কমে যাচ্ছে। মহব্বত একটু কমেছে তো মুস্তাহাব আমল ছুটে যাচ্ছে। আরও একটুও কমেছে তো সুন্নত ছুটে যাচ্ছে। আরও একটু কমে গেছে তো ওয়াজিব ছুটে যাচ্ছে। আরও একটু কমেছে তো ফরয ছুটে যাচ্ছে। কমতে কমতে এক পর্যায়ে এমন হয়ে যায় যে ঈমান পর্যন্ত চলে যায়।

আল্লাহর মহব্বত আত্মিক রোগের মহৌষধ

এজন্য আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) বলেছেন–

شاد باش ائے عشق خوش سودائے ما
اے طبیب جملہ علتھائے ما
اے دوائے نخوت وناموس ما
ائے تو افلاطون وجالینوس ما

আল্লামা রুমী (রহ.) এ কবিতায় তার দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের যে পরিমাণ মায়া-মমতা রয়েছে তার জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছেন। আল্লাহ পাকের কাছে খুশি প্রকাশ করছেন।

আল্লাহপাকের মহব্বতকে সম্বোধন করে তিনি বলেন–

شاد باش ائے عشق خوش سودائے ما
اے طبیب جملہ علتھائے ما

আল্লাহর মহব্বত শুধু মহব্বতই নয়, বরং আমার কলবের ভেতরকার হাজারো রোগের প্রতিষেধক।

আমার ভেতর মানবতা ও মনুষ্যত্ব নেই, আমার ভেতর পাশবিকতা চলে এসেছে, আমি আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছি, আমার ভেতরে হিংসা ও অহংকার ঢুকে পড়েছে, আমার ভিতর পরশ্রীকাতরতা ঢুকে পড়েছে—এসব রোগের ডাক্তার বা ঔষধ হল আল্লাহর মহব্বত। আল্লাহর মহব্বত ভিতরে এলে আত্মার রোগগুলো থাকে না। এর পর তিনি বলেন–

اے دوائے نخوت وناموس ما
ائے تو افلاطون وجالینوس ما

অর্থাৎ গর্ব-অহংকারসহ আমার হৃদয়ে যত রোগ রয়েছে আল্লাহর মহব্বত সেসব রোগের সাধারণ কোনো চিকিৎসক নয়; বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্তক আফলাতুন ও জালীনুস-এর মত বড় চিকিৎসক। আফলাতুন এবং জালীনুস মানুষের দেহের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন বড় চিকিৎসক, আল্লাহর মহব্বত রুহের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেমন বড় চিকিৎসক।

جسم خاك از عشق بر افلاك شد
كوه در رقص آمد و چالاك شد

মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে গিয়েছেন। তুর পাহাড়কে কেন্দ্র করে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। কার কারণে? হযরত মূসা (আ.)-এর কারণে। আল্লাহর মহব্বতওয়ালা নবী তুর পাহাড়ে যাওয়ার কারণে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে পৌঁছেছেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে। কোন শক্তিতে এত বড় ঘটনা ঘটল? এটা হল আল্লাহ পাকের মায়া-মমতা ও ভালোবাসার শক্তি।

মানুষের দিলে এক সাথে দু'জনের ক্ষমতা চলে না

মানুষের দিলে এক সাথে দু'জনের ক্ষমতা চলে না। দুনিয়ার ক্ষমতারও একই অবস্থা। যখন এক সরকারের ক্ষমতা শেষ হয়ে আরেক সরকারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রশাসনে অনেক রদবদল ও উত্থান-পতন হয়। পূর্বের সরকারের মর্যাদাবানরা পরের সরকারের সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এটা দুনিয়ার নিয়ম। কুরআন কারীমেও এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ
(سورة النمل : 34)

কোনো বাদশা যখন কোনো জনপদ জয় করে বিজয়ীর বেশে তাতে প্রবেশ করে তখন সেখানে অনেক কিছু তছনছ ও ভাংচুর করে। পরিবর্তন ও রদবদল করে। ফলে যারা ততদিন সম্মানী ছিল তারা অসম্মানী হয়ে যায়। এক সময় যারা বড় বড় মর্যাদাপূর্ণ মন্ত্রাণালয়ের চেয়ারে আসীন ছিল এবং রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে এখন তারা জেলখানায় সাজা ভোগ করছে। এই আয়াতের মধ্যে যা বলা হল তাতে তো দুনিয়ার একটা সাধারণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ অবস্থা তুলে ধরে আল্লাহ পাক কী বোঝাতে চাচ্ছেন- এটা গভীরভাবে বোঝার বিষয়।

মানবদেহ : একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী

আল্লাহ পাক যা বোঝাতে চাচ্ছেন তার সারমর্ম হল- আমার আপনার দেহটি একটি রাষ্ট্র। একটি জগত। কবি বলেন–

أَتَزْعَمُ اَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيْرٌ * وَقَدْ اِنْطَوٰى فِيْكَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ

তুমি কি মনে করেছ তুমি ক্ষুদ্র একটি দেহ। না, না। তোমার এ ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে বিরাট এক পৃথিবী রয়েছে। গোটা দুনিয়ার সব কিছু তোমার মধ্যে বিরাজ করছে। আল্লাহপাকও কুরআনে বলেন-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.[93]

–এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য।

এবার চিন্তা করুন, মানুষকে আল্লাহ পাক কেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন। গোটা দুনিয়াটাকে যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে তা দু'ভাগে বিভক্ত—জল এবং স্থল। মানুষের দেহেও জল এবং স্থল রয়েছে। জলের বিভিন্ন অবস্থা ও সাইজ রয়েছে। কোনোটি পুকুর, কোনোটি খাল, কোনোটি নদী আবার কোনোটি সাগর। হুবহু এসবগুলোর নমুনা মানুষের দেহের মধ্যে রয়েছে। মানুষের রগ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন তরল পদার্থ চলাচলের বিভিন্ন নালা রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পানি জমা হয়ে থাকে। যেমন মূত্রাশয়। এ ছাড়াও আরও অনেক জায়গায় তরল পদার্থ জমা হয়ে থাকে। কোনোটা নদীর মত। কোনোটা নালার মত।

পৃথিবীর স্থলভাগও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিছু জায়গা এমন আছে যেখান উদ্ভিদ ও গাছপালা জন্মায় আর কিছু জায়গা এমন আছে যেখানে কিছু জন্মায় না। আমাদের দেহেও এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে কোনো পশম বা চুল গজায় না। যেমন হাত ও পায়ের তালু। আর যেখানে গজায় সেটা আবার দু'রকম। কিছু জায়গা বন-জঙ্গলের মত। সেখানে ঘন ঘন গাছ-পালা থাকে। যেমন আমাদের দেশের সুন্দরবন, গজারীবন। আমাদের দেহেও এমন বন-জঙ্গল রয়েছে। যেমন মাথা একটি আফ্রিকার জঙ্গল। আবার দাড়িও খুব ঘন ঘন হয়। এ ছাড়া সারা শরীরের স্থানে স্থানে মামুলি পশম রয়েছে।

স্থল জায়গা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। কিছু সমতল আর কিছু উঁচু-নীচু টিলা। আমাদের দেহেও কিছু অংশ সমতল, কিছু অংশ টিলার মত।

---

৯৪. সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৫৩

সবচেয়ে বড় টিলা হল নাক। এটা দেহের এভারেস্ট পর্বত। এরপর হাত-পায়ের গিরাগুলো হল ছোট ছোট পাহাড়।

এই বন-জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জীব-জন্তু বাস করে। মানুষের মাথার মধ্যে উকুন থাকে। এটা মানবদেহের হিংস্র জন্তু। পুরো পৃথিবীতে যা আছে মানুষের দেহে তা আছে। দেখতে সাড়ে তিন হাত। আসলে এটা পুরো পৃথিবী।

কলব : দেহ রাজ্যের রাজধানী

এ দেহ নামক পৃথিবীর একটি রাজধানীর প্রয়োজন আছে। এর রাজধানী হল মানুষের কলব। হাদীসে এসেছে–

إِنَّ فِيْ الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صُلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ واذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

এ দেহের রাজধানী হল কলব। কলব হল কেন্দ্র। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল অঞ্চল। কেন্দ্রের প্রভাব অঞ্চলে পড়ে। সরকারের সকল দফতর ও মন্ত্রণালয় রাজধানীতে অবস্থিত। ওখান থেকেই সবকিছুর অর্ডার হয় এবং চতুর্দিকে সাপ্লাই হয়। রাজধানীর নির্দেশে প্রত্যেকটি জেলা ও থানা, ইউনিয়ন পরিচালিত হয়। দেহের এ রাজধানীর নাম হল কলব। এ কলব নামক রাজধানীতে হয়ত আল্লাহর আসন হবে, না হয় শয়তানের আসন হবে। যদি কারো 'দিল' শয়তানের আসন হয় তাহলে তার পুরো দেহ থেকে শয়তানী কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাবে। তার দেখা হবে শয়তানী দেখা, তার ধরা হবে শয়তানী ধরা, তার শ্রবণ হবে শয়তানী শ্রবণ, তার চলা হবে শয়তানী চলা। সবকিছুর রূপ ভিন্ন হবে। আর যদি ওখানে আল্লাহপাকের স্থান হয় তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল আচরণ আল্লাহওয়ালা হবে। হাতের ধরা হবে আল্লাহর ধরা, চোখের দেখা হবে আল্লাহর দেখা। হাদীস শরীফে এসেছে– বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য লাভ করে যে, তখন বান্দার হাত আল্লাহর হাত হয়ে যায়, বান্দার মুখ আল্লাহর মুখ হয়ে যায়।

এ নৈকট্য দেহ দিয়ে নয়। এ নৈকট্য দিল দিয়ে অর্জিত হয়। আল্লাহর এক আরেফ বলেন–

سفر از خود بدل می بایدت کرد
نه در دنیا زمیں پیما یدت کرد

হে দুনিয়ার মানুষেরা! তোমাদেরকে বানানো হয়েছে একটা বিশেষ সফরের জন্য। ঐ সফরটা দুনিয়ার ভূমি অতিক্রম করে এখান থেকে ওখানে যাওয়ার সফর নয়; বরং ঐ সফরটা হল দিলের সফর। দিলের এ সফর করে যাচাই করো—আল্লাহপাকের দিকে তোমার কতটুকু সফর হল, তুমি আল্লাহর নৈকট্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছো, আল্লাহর মাঝে আর তোমার মাঝে দূরত্ব কমতে কমতে তুমি কতখানি নিকটে যেতে পেরেছো।

তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে আল্লাহর অনেক নিকটবর্তী হয়ে যায়। তখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে আল্লাহর হাত দিয়ে ধরে, আল্লাহর চোখ দিয়ে দেখে, আল্লাহর মুখ দিয়ে বলে। এর কারণ হল অন্তরে যখন আল্লাহ পাকের জায়গা হয়ে যায় তো এর ফলে অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, গর্ব-অহংকারসহ সকল রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। শয়তানের মসনদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার কারণে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা শেষ হয়ে যায়। তখন রুহের কোনো ব্যাধি তার মাঝে থাকে না। হতে হতে এমন হয়ে যায় যে, এখন সে চলে তো যেন আল্লাহ পাকের কুদরতী পা দিয়ে চলে, ধরে তো আল্লাহপাকের কুদরতী হাত দিয়ে ধরে, কথা বলে তো আল্লাহ পাকের কুদরতী মুখ দিয়ে বলে।

শয়তানী রাজত্ব উৎখাত করতে মুজাহাদা

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً .[94]

এ আয়াত এ কথা বোঝাচ্ছে যে, তোমার দিলে হাজার রকম রোগ থাকার কারণ হল তুমি অন্তরে শয়তানকে জায়গা দিয়ে রেখেছো। যদি তুমি মেহনত-কষ্ট তথা মুজাহাদা করো তাহলে শয়তানকে দূর করতে সক্ষম হবে। যেমনিভাবে একটা খারাপ সরকারকে উৎখাত করতে অনেক মেহনত ও মুজাহাদার প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে দিল থেকে শয়তানকে উৎখাত করতেও কঠোর মেহনত-মুজাহাদার প্রয়োজন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন–

---

৯৫. সূরা নমল : ৩৪

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۔ [95]

অর্থ : যারা আমার পথে মুজাহাদা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার বিভিন্ন ধরনের পথ দেখিয়ে দেই।

মুজাহাদা কী? মুজাদাহা হল মনের বিরুদ্ধে চলা। মানচাহী জিন্দেগী ছেড়ে দেয়া। দিলের থেকে শয়তানের দাপট শেষ হয়ে আল্লাহ পাকের রাজত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেহেতু রাজধানী ঠিক হয়ে গেল সেহেতু এখন আমার অঞ্চলগুলোও ঠিক হয়ে যাবে। অঞ্চল হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এখন চোখের দেখা, হাতের ধরা, পায়ের চলা ও মুখের বলা সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

দোস্ত! এর জন্য প্রয়োজন হল মুজাহাদা। মুজাহাদা ছাড়া দিল ঠিক হবে না। দিলকে আল্লাহর আসন বানাতে হলে, দিলে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি করতে হলে নিয়মিত সঠিক পন্থায় মুজাহাদা বা চেষ্টা-মেহনত করতে হবে।

মুজাহাদার পদ্ধতি

এখন কথা হল আমি মুজাহাদা করব কোন পথে? যে কোনো কাজের একটা উদ্দেশ্য থাকে, আরেকটি থাকে আদর্শ। উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য আদর্শের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন গন্তব্যে পৌঁছতে হলে রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে। মনে করুন, কারো জরুরী ফোন এসেছে চট্টগ্রাম যেতে হবে। সে চট্টগ্রাম যাবে। এটা তার উদ্দেশ্য। না গেলে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। এখন সে চট্টগ্রাম যাবে কীভাবে? যাওয়ার পথ গ্রহণ করতে হবে। তা না করে যদি সে শুধু হৈচৈ করে যে, 'আমার চট্টগ্রাম যেতে হবে, আমার চট্টগ্রাম যেতে হবে' তাহলে কি সে চট্টগ্রাম পৌঁছতে পারবে? পারবে না। পৌঁছতে হলে চট্টগ্রাম যাওয়ার যে পদ্ধতি রয়েছে সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কোন লাইনে চট্টগ্রাম যেতে হয় সে লাইন ধরতে হবে। টিকিট কাটতে হবে। সময় মত গাড়ীতে উঠতে হবে। তারপর চট্টগ্রাম পৌঁছা যাবে। এসব না করে যদি শুধু বলতে থাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে তাহলে উদ্দেশ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না। আবার অনেক সময় গাড়ীতে উঠতেও ভুল করে ফেলে। চট্টগ্রাম যাবে, কিন্তু উঠে গেছে সিলেটের গাড়ীতে। এখন দূরত্ব বাড়বে, না কমবে? বাড়বে।

৯৬. সূরা আনকাবুত : ৬৯

দরকার ছিল চট্টগ্রাম যাওয়ার, চলে গেছে সিলেটে। আরও দূরত্ব বেড়ে গেল। আগে যেখানে ছিল সেটাই তো ভালো ছিল। এখন তো ঝামেলা আরও বেড়ে গেল।

এমনিভাবে আমরা আল্লাহকে পেতে চাই, আল্লাহর মহব্বত পেতে চাই, আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাই। কিন্তু কেউ লাইনে উঠছি না। তাই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। যে কোনো উদ্দেশ্যে সফল হতে হলে লাইনে উঠতে হবে। পেটে ক্ষুধা লেগেছে, ভাত খাওয়ার প্রয়োজন। বাসায় বা হোটেলে গিয়ে খাবার খেতে হবে। তা না করে শুধু হৈচৈ করলে ক্ষুধা মিটবে না। কারো বুকে ব্যথা। ব্যথা ব্যথা বলে শোরগোল আর কান্নাকাটি করলে ব্যথা ভালো হবে না। ভালো হওয়ার লাইন ধরতে হবে। পদ্ধতি মত কাজ করা হলে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। তো লাইন ধরতে হবে এবং লাইন সঠিকটাই ধরতে হবে। ভুল লাইনে চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হবে।

আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নিরাপদ রাস্তা

এতক্ষণ যা বলা হল এর আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর মহব্বত কী জিনিস। সবাই আল্লাহর মহব্বত চায়। দুনিয়াতে কোনো মুসলমান এমন নেই, যে আল্লাহর মহব্বত পেতে চায় না। সবাই চায় আল্লাহ যেন আমাকে মহব্বত করেন এবং আমি যেন আল্লাহর প্রিয় হই। আমার অন্তরেও যেন আল্লাহর মহব্বত আসে, আল্লাহর জন্য যেন আমার চোখ দিয়ে পানি আসে। কেন চায়? সামান্য হলেও বোঝে যে, এর মধ্যে কী স্বাদ রয়েছে। আল্লাহর মহব্বতে যদি কেউ চোখের পানি ফেলতে পারে এ পানি কখনোই দুঃখের পানি নয়, বরং এ তো হল পরম সুখের পানি। মাওলার জন্য যে ব্যক্তি চোখের পানি ফেলতে পারে সে তো এর চেয়ে বড় আর কোনো সুখ কল্পনাও করতে পারে না।

جو تومیرا تو سب میرا * فلك میرا زمیں میری
اگر ایك تو نہیں میرا * تو کوئی شئ نہیں میری

দোস্ত! আমরা সকলেই তো আল্লাহপাকের মহব্বত চাই। এটা আমাদের উদ্দেশ্য। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর অর্থ হল আমার অন্তর থেকে সব কিছুর মহব্বত বের করলাম, একমাত্র আল্লাহর মহব্বত জায়গা দিলাম।

এ উদ্দেশ্যে সফল হতে হলে আমাকে একটা লাইন বা রাস্তা ধরতে হবে। এর জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি রাস্তা দিয়েছেন। সেটা হল مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ হল আমার উদ্দেশ্য আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ হল আমার আদর্শ। চট্টগ্রাম যাওয়া আমার উদ্দেশ্য, চট্টগ্রাম গামী বাস/ট্রেন/বিমান হল আদর্শ। আল্লাহকে পেতে হলে একটি মাত্র পথ ও আদর্শ রয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কুরআন মাজীদে আল্লাহপাক বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ـ[96]

যে ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর ২৩ বছরের রেসালাতের জিন্দেগী মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করবে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে, সে দু'টি জিনিস পাবে। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহ তাকে মহব্বত করবেন এবং তার দিলেও আল্লাহর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। উভয় দিক থেকে কানেকশন হবে।

هم تم هي بس آگاه هيں اس ربط خفى سے
معلوم كسى اور كو يه راز نهيں هے

আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ ও আদর্শ হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের রেসালাতের জীবন। তিনি যেভাবে জীবন যাপন করেছেন আমাকে সেভাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে। তিনি যেভাবে বিবাহ-শাদী করেছেন—আমাদের বিবাহ-শাদীও ঐ ধাঁচে সাজাতে হবে। তিনি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করেছেন। তিনি কিভাবে খুশি পালন করেছেন জানতে হবে। সন্তানাদী হওয়া খুশির বিষয়। এসব ক্ষেত্রে তিনি কী কী কাজ করেছেন—তা জেনে আমাদেরও সে অনুপাতে খুশি পালন করতে হবে। আপনজন মারা যাওয়া দুঃখের বিষয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুঃখের সময় কী কাজ করেছেন। তাঁর সন্তান মারা যাওয়ার পর তিনি কী করেছেন, তাঁর আপনজন মারা যাওয়ার পর তিনি কী করেছেন, তাঁর সাহাবী মারা যাওয়ার পর তিনি কী করেছেন— এগুলো জেনে আমাদেরকেও সেভাবে

৯৭. সূরা আলে-ইমরান : ৩১

সবকিছু করতে হবে। কারো মুমূর্ষু অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করতেন, কী তালকীন দিতেন, মরার পর কী কী আমল করতেন, কিভাবে মায়্যেতকে গোসল দিতেন, কিভাবে কাফন পরাতেন, কিভাবে দাফন দিতেন—ইত্যাদি আমাদের জানতে হবে, মানতে হবে।

সুখের বিষয়েও আদর্শ হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, দুঃখের বিষয়েও আদর্শ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের শোক পালন করতে হয়। কে কিভাবে কত দিন শোক পালন করবে—সব সুন্নত মোতাবেক হতে হবে। খাবার খেতে হবে তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে খানা খেতেন। ঘুমাতে হবে তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ঘুমাতেন। এ জিনিসগুলো যখন জানব এবং সে মোতাবেক আমল করব তখন আল্লাহর মহব্বত পাব। আমি বাথরুমে যেতে বাম পা দিয়ে যাই, দু'আ পড়ি, বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হই, দু'আ পড়ি। এভাবে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিভাবে পাচ্ছে? তা বোঝার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাক বলেছেন মহব্বত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সুন্নাতের মাঝে আল্লাহপাক এ প্রভাব রেখেছেন যে, এর দ্বারা দিলে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

মানুষ যখন সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করে তখন তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত জায়গা নেয় এবং আল্লাহ পাকও তাকে মহব্বত করেন। হাদীসে যে বলা হয়েছে নফল ইবাদত করতে করতে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। এটাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা আর সুন্নত। অন্য তরীকায় এ অবস্থা সৃষ্টি হবে না। বরং দূরত্ব বাড়বে। তো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আলোচনার সারকথা

সারাংশ কী দাঁড়াল? আল্লাহপাকের মহব্বত আমাদের দিলে আসতে হবে। যদি না আসে তাহলে দিলে শয়তানের জায়গা হবে। শয়তানী রাজত্ব থেকে কোনো দিন মুক্তি লাভ করতে পারব না। আল্লাহর মহব্বত দিলে আসবে তো শয়তানী রাজত্ব খতম হবে। আল্লাহর মহব্বত দিলে

আসার পথ কী? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেসালাতের ২৩ বছরের জিন্দেগী অনুসরণ।

আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিন্দেগী অনুসরণ করা খুব হিম্মতের ব্যাপার। আর এ হিম্মতটা আসবে না কোনো হিম্মতওয়ালা মানুষের সাহচর্য ছাড়া। কোনো আল্লাহওয়ালার সাহচর্য ছাড়া এ হিম্মত নসীব হবে না। সুন্নত মোতাবেক চলতে মনে চাইবে, চেষ্টাও করব কিন্তু বিভিন্ন বাধার কারণে আমি হিম্মত করতে পারব না, অগ্রসর হতে পারব না। নিজের ভিতর থেকেই বাধা আসবে যে, কুলিয়ে উঠতে পারি না। তো এর জন্য হিম্মতের প্রয়োজন। আমি আমার জীবনকে যদি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে এত দিন যে আদর্শে চলে এসেছি সেটা বর্জন করতে হবে। এর জন্যও হিম্মতের প্রয়োজন। ঘুষখোর বা চোরও চায় ভবিষ্যতে ঘুষ খাবে না বা চুরি করবে না। কিন্তু তারপরও ছাড়তে পারে না কেন? পারে না এজন্য যে, হিম্মত নেই। যদি হিম্মত থাকে তাহলে চোরও চুরি ছাড়তে পারবে, ঘুষখোরও ঘুষ বর্জন করতে পারবে। একেকটা জিনিসের মধ্যে আল্লাহপাক একেকটা আছর ও প্রভাব রেখেছেন। আল্লাহওয়ালার সাহচর্যে আল্লাহপাক দুনিয়াবিমুখতার প্রভাব রেখেছেন। এঁদের সুহবতে ওঠাবসা করলে দুনিয়া ত্যাগের হিম্মত আসবে। শেষ রাতে উঠতে তো মনে চায় কিন্তু উঠতে পারেন না। জাগ্রত হলেও উঠে নামায পড়ার তৌফিক হয় না, হিম্মত হয় না। আপনি যদি এমন কোনো হিম্মতওয়ালা মানুষের সাহচর্যে যান যিনি শেষ রাতে শুয়ে থাকেন না, উঠে যান, তাহলে আপনারও হিম্মত হয়ে যাবে। এত দিন ঘুমোতে ভালো লেগেছে, এখন উঠতে ভালো লাগবে।

দোস্ত! আল্লাহর মহব্বত আমাদের সবারই দরকার। আল্লাহর মহব্বত পেতে হলে সকল বিষয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। আদর্শ অনুসরণের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হিম্মত আসবে না যতক্ষণ না হিম্মতওয়ালা কোনো মানুষের সাহচর্যে না যাবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বোঝার আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন!

*

* ৯/২/২০০৯ইং তারিখে ফুলছোঁয়ার মাহফিলে প্রদত্ত বয়ান

মাহে রামাযান
তাকওয়া অর্জনের ভরা মৌসুম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .[97]

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ .[98]

৯৮. সূরা বাকারাহ : ১৮৩

او كَما قال عليه الصلاة والسلام. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

কাঙ্ক্ষিত রমাযান

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের হায়াত দীর্ঘ করে বহু কাঙ্খিত ও প্রতিক্ষিত মুহূর্ত রমযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এটা শুধুই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ।

যে রমযান শুরু হল এমন আরও রমযান আমাদের জীবনে অতিবাহিত হয়েছে। বিগত সে রমযানগুলোতে কী আমল করেছি তা ভেবে আমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত। এতে হয়তো এ রমযানে কিছু করার সুযোগ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.[99]

যে ব্যক্তি রমযানের তথা শবেকদরের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় সে চিরবঞ্চিত ও পোড়া কপাল।

আল্লাহ আমাদের দেহ ও রূহ উভয়ের রব

দোস্ত! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবকিছুর রব ও প্রতিপালক। তিনি আমাদের দেহেরও রব, আমাদের রূহেরও রব। আমাদের দেহের প্রতিপালনের জন্য তিনি নানা রকম শস্যদানা, ফলমূল ও শাক সবজি দিয়ে রেখেছেন। আসমান, যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের দেহের প্রতিপালনের জন্য। যেভাবে তিনি আমাদের দেহ প্রতিপালনের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি এ দেহ যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সে রূহ ও আত্মার প্রতিপালনেরও সুব্যবস্থা করেছেন। এ দেহ মূলত রূহের খাঁচা। তাই দেহের লালন মূলত রূহের লালন-পালনের জন্যই।

দেহের প্রতিপালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল পানি। এ পানির একটি মৌসুম রয়েছে। তা হল বর্ষাকাল। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর সারা

৯৯. সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং-২১০৬
১০০. সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং-২১০৬

বছর এ পানি আমাদের প্রয়োজনে আমরা ব্যবহার করতে থাকি। রূহ প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভেরও একটি বিশেষ সময় ও মৌসুম রয়েছে। এ মৌসুমে রূহের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। সে বিশেষ মৌসুমটি হল রমযান মাস।

বর্ষাকালের বৃষ্টির পানি দিয়ে সারা বছর দেহের প্রয়োজন পূরণ করতে হলে অবশ্যই পানি সংগ্রহ করে রাখতে হবে। বর্ষাকালে পাত্র যদি উপুড় হয়ে থাকে তাহলে কি পানি সঞ্চিত হবে? এমনিভাবে পাথরের উপর প্রবল বর্ষণ হলেও তাতে পানি সংরক্ষণ করা যায় না। এমনিভাবে রমযানের রহমতের বর্ষণ থেকে উপকৃত হতে হলে এবং অবশিষ্ট এগার মাসের খোরাক সঞ্চয় করতে হলে হৃদয়ের পাত্রটিকে বৃষ্টির দিকে মুখ করে ধরতে হবে। রমযানের প্রতি মুখাপেক্ষী ও মনোযোগী হয়ে তার রহমত ও বরকত হাসিলের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.[100]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল মানুষকে সম্বোধন করেননি। শুধু তাঁর অতি আপনজনদের সম্বোধন করেছেন। হযরত আলী রাযি. الَّذِينَ آمَنُوا-এর তাফসীর করেছেন, **اَلَّذِيْنَ عَشِقُوْا** সুতরাং আয়াতের মর্ম দাঁড়ায়- হে আমার প্রিয়জনেরা! আমার মহব্বতের বান্দারা! যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছো, শোন, শুধু তোমাদেরকে বলছি।

ঈমানী বন্ধন

মানুষের পরস্পরে সম্পর্ক স্থাপনের যত বন্ধন রয়েছে- ভাই-বোনের বন্ধন, সন্তান ও মা-বাবার বন্ধন, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ইত্যাদি সকল বন্ধনের চেয়ে দৃঢ় ও গভীর বন্ধন হল ঈমানের বন্ধন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ঘটনায় ঈমানের বন্ধনের দৃঢ়তা ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ঈমানের বন্ধনে তারা পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি সব পরিত্যাগ করেছেন।

১০১. সূরা বাকারাহ : ১৮৩

কাউকে তার বাবা বাধা দিয়েছে, কাউকে বাধা দিয়েছে স্বামী, কাউকে স্ত্রী। সব বাধা উপেক্ষা করে তারা হিজরত করে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

রোযার বিধান

তো আল্লাহ তা'আলা এ ঈমানী বন্ধনের সূত্র ধরে মহব্বতভরা সম্বোধন করে রোযার হুকুম দিচ্ছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। রোযার নির্দেশ প্রদানে এখানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহৃত রয়েছে। মহব্বতের দরুন কখনো শৈথিল্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদানে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। স্পষ্ট বলে দিলেন, এ রোযা ফরয। এখানে শৈথিল্যের অবকাশ নেই। নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে আবার বলে দিচ্ছেন–

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও এ রোযা ফরয ছিল। অতএব ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এ বিধান পালন করা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ তোমাদের পূর্বের লোকেরাও এ বিধান পালন করেছে।

রোযার উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তা'আলা রোযার ফায়দা বর্ণনা করেছেন। লাভ ও ফায়দা জানা থাকলে কঠিন বিষয়ও সহজ হয়ে যায়। রোযার ফায়দা হল-

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।

রোযার মাধ্যমে এমন এক মহামূল্যবান সম্পদ অর্জিত হবে যা ছাড়া এ জীবনের কোনো মূল্যই নেই। মানুষের মাঝে তাকওয়া না থাকলে তার কোনো মূল্যই নেই। তাকওয়াহীন মানুষ 'মানুষ' নয় পশু; বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

যার মাঝে তাকওয়া আছে সে যত দরিদ্র ও অভাবী হোক না কেন কারো একটি পয়সাও সে কখনো আত্মসাৎ করবে না। একটি টাকা

পেলে তার মালিকের হাতে পৌঁছানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়বে। আর যার অন্তরে তাকওয়া নেই সে যত সম্পদশালী, ডিগ্রী ও পদবীধারী হোক না কেন তার পদস্খলন ঘটবেই।

তাকওয়া কী

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ এর সর্বশেষ খলীফা হারদুঈর হযরত মুহিউস্‌সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.) একবার বাংলাদেশ সফরে এলেন। হযরত কয়েকবারই আমাদের দেশে এসেছেন। সে সফরে একবার গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের লালবাতি জ্বলছিল। ড্রাইভার এদিক ওদিক তাকিয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে হযরত বললেন, এই ড্রাইভারের তো ব্রেক নেই। অর্থাৎ যদিও গাড়ির ব্রেক আছে কিন্তু গাড়ির চালকের অন্তরে তাকওয়া নেই। তাই সে সিগন্যাল অমান্য করে গাড়ি চালিয়ে গেল।

মূলত তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালন করা ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার যোগ্যতা। রমযানের সম্মান করা, পবিত্রতা রক্ষা ও রোযা পালনের দ্বারা এ যোগ্যতা অর্জিত হয়। এটা কিভাবে অর্জিত হয় তার প্রকৃত রহস্য তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ করলেও বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।

রোযার বিশেষ উপকারিতা

লক্ষ করুন, মানুষে মাঝে প্রবৃত্তি রয়েছে যাকে খাহেশাত বলা হয়। এসব প্রবৃত্তির মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবৃত্তি দু'টি- খাদ্যপ্রবৃত্তি ও যৌনপ্রবৃত্তি। এ দু'টির মাঝে শক্তিশালী হল, যৌন প্রবৃত্তি। অনেক মানুষই এমন রয়েছে যারা খাদ্য প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও যৌন প্রবৃত্তির কাছে হেরে যায়।

তো রমযান মাসে এ শক্তিশালী দু'টি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রবৃত্তি ও মনের খাহেশ নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করানো হয়। অনুশীলনও কঠোরভাবেই করা হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের সময়। হাতের কাছে ঠাণ্ডা পানি রয়েছে। বিকেল বেলা প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসার সময়ে

নানা রকমের উপাদেয় খাদ্য ও পানীয় হাতের নাগালেই আছে। তার পরও আল্লাহর মহব্বতে পানাহার থেকে বিরত থাকে। এমনিভাবে ঘরে নিজের স্ত্রী রয়েছে। চাইলেই মনের চাহিদা পূরণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ভয় ও মহব্বতে তা থেকে বিরত থাকে। এভাবে একদিন দু'দিন নয়, দীর্ঘ ত্রিশ দিন ধারাবাহিক এ অনুশীলন চলতে থাকে। এভাবে ত্রিশ দিন যে ব্যক্তি শক্তিশালী এ দু'টি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে সে অবশ্যই অবশিষ্ট এগার মাসও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ সারা বছর তার নিরাপদে কেটে যাবে।

তাই আমাদের রোযাগুলো যথাযথভাবে রাখতে হবে। রমযানের পবিত্রতা ও সম্মান বজায় রাখতে হবে।

রোযা রাখতে হবে সবর ও মহব্বতের সাথে

এবার তো প্রায় সাড়ে পনের ঘণ্টা রোযা রাখতে হবে। আমাদের দেশের সবচেযে দীর্ঘ রোযা এ মৌসুমেই। কোনো কোনো দেশে এর চেয়েও দীর্ঘ রোযা হয়। ২০/২২ ঘণ্টা রোযাও হয় কোনো কোনো দেশে কিন্তু ঈমানদার বান্দাগণ আল্লাহর মহব্বতে এর পরোয়া করে না। কবির ভাষায়–

از محبت تلخها شیریں شود
وز محبت درد و غم حلوا شود

মহব্বতের দরুন তিক্ত বস্তু সুমিষ্ট বস্তুতে পরিণত হয়। মহব্বতের কারণে ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্টকেও হালুয়া মনে হয়।

উদাহরণ, কারো সন্তান জন্ম গ্রহণ করল হাসপাতালে। সে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। ঔষধপত্র, ডাক্তার, খাবার ইত্যাদি নিয়ে সারাক্ষণ অস্থির বিচরণ করছে। স্থির চিত্তে কিছুক্ষণ বসতে পারছে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকটি খুবই কষ্টে আছে। কিন্তু তার অন্তরে সন্তানের মহব্বত আছে। ফলে সে কোনো কষ্ট অনুভব করছে না। এ দৌড়াদৌড়ির মাঝেও সে আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সন্তান লাভের সুসংবাদ শোনাচ্ছে- আমার ছেলে হয়েছে, আমার মেয়ে হয়েছে। মিষ্টি

বিতরণ করছে। তো সন্তানের মহব্বত ও ভালোবাসার দরুণ সে এত কষ্ট ও অস্থিরতার মাঝেও আনন্দে আছে।

আল্লাহর মহব্বত হৃদয়ে থাকার কারণেই রোযার কষ্ট ঈমানদারের কাছে কষ্ট মনে হয় না। আল্লাহর মহব্বতে এ কষ্টের মাঝেও আনন্দ অনুভব করে।

আমাদের উচিত, রযমানের রোযাগুলো যথাযথভাবে রাখা, রমযানে গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং রমযানের খায়র ও বরকত লাভের যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। *

.....

* ঢাকা গেণ্ডারিয়া সাধনা মসজিদে জুমার বয়ান, অনুলিখন- মাও. যুবাইর আহমদ

তওবার হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام : اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ أو كَما قال عليه الصلاة والسلام.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

তাড়াতাড়ি ঘুমানো ইসলামী কালচার

আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম এহসান ও দয়া, ফজল ও করম, তিনি আমাদেরকে অনেক অনেক নেয়ামতের মধ্যে নিজের মধ্যে কিভাবে দীনদারী আসবে, মাওলায়ে পাকের প্রতি দিলের মধ্যে বেকারারী কিভাবে আসবে, ধড়পড়ী কিভাবে সৃষ্টি হবে—সে উদ্দেশ্যে এখানে সময় কাটানোর তৌফিক দিয়েছেন। রাত্র অনেক করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আর এটা পছন্দনীয়ও নয়। আমাদের অনেকের ধ্যান-ধারণা বা আমাদের কালচার এমন হয়ে গেছে যে, আমরা এগারোটা বা বারোটাকে তেমন রাত্র মনে করি না। একটা-দেড়টা বাজে ঘুমাই। পরে আবার শেকায়েত করি যে, ফজর নামায কাজা হয়ে যায়। এটা ইসলামী কালচার নয়। ইসলামী কালচার হল আগে আগে ঘুমাও, আগে আগে ওঠো। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল এটাই।

আমার শায়েখ নানুপুরী (রহ.)-এর আমলও ছিল এমন। এশার নামাযের পর কেউ তার সাথে কথা বলতে পারতেন না। এশার নামায শেষে তিনি শুয়ে পড়তেন। মাহফিল থাকলে হযরতের বয়ান হয়ত আসরের পর হত, না হয় মাগরিবের পর হত। এশার পর কারো সাথে কোনো কথাবার্তা বলতেন না কিংবা বয়ান করতেন না। খানাপিনা এশার পূর্বেই সেরে নিতেন।

বাংলাদেশের এক সময়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবদুর রহমান বিশ্বাস। তার ছেলে লাতিন বিশ্বাস তৎকালীন এম.পি ছিলেন। তাদের মূল বাড়ি বরিশাল জেলায়। লাতিন বিশ্বাস একবার নানুপুর গিয়েছিলেন হযরতের সাথে সাক্ষাত করার জন্য। যেতে যেতে রাত হয়ে গেছে। হযরত এশার নামায পড়ে শোয়ার প্রস্তুতী নিচ্ছেন—এ সময় তিনি উপস্থিত হয়েছেন। হযরতকে বিষয়টি জানানো হল। হযরত বললেন, তাকে থাকতে বলুন—সকালে দেখা হবে, এখন কথা বলতে পারব না। এর সঙ্গে তিনি আরেকটি শিক্ষণীয় কথা বলছেন। সেটি হল—আমি নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করতে পারব না।

অন্যের উপকার করার নীতিমালা

এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝবেন। নিজের দুনিয়াবী ক্ষতি করে আরেকজনের দুনিয়াবী উপকার করা যায়। এমনিভাবে নিজের দুনিয়াবী ক্ষতি করে অন্যের পরকালীন উপকার করা খুব ভালো কাজ। কিন্তু নিজের

পরকালীন ক্ষতি করে অপরের দুনিয়াবী উপকার করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমনকি নিজের দীনের ক্ষতি করে আরেকজনের দীনের ফায়দা পৌঁছাব—এটাও কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

উদাহরণ দিলে ভালো করে বুঝবেন। হযরত বলেছেন, আমার দীনের ক্ষতি করে আরেকজনের উপকার করতে পারব না। হযরতের কথার অর্থ হল—আমি যদি এখন তাকে দেখা দেয়ার সুযোগ দিই এবং কথা-বার্তায় দীর্ঘ সময় চলে যায়, তাহলে আমার শেষ রাতে জাগরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তার হয়ত কিছু ফায়দা হবে। যদি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে দুনিয়ার ফায়দা হবে। তার দুনিয়াবী ফায়দার জন্য আমি আমার আখেরাতের ক্ষতি কেন করব?

আর যদি তিনি আখেরাতের উদ্দেশ্যে এসে থাকেন তাহলে তার আখেরাতের জন্য আমি আমার আখেরাত বিনষ্ট করব—এটাও ঠিক নয়। তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করুক। সকাল বেলা কথা হবে।

অনেকে আল্লাহওয়ালাদের কাছে আসে দুনিয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। দুনিয়ার ফায়দা দেয়ার জন্য আমাদের দেশে কিছু দরবারও হয়েছে। মানুষ যায়ও সেখানে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে। অথচ আল্লাহওয়ালাদের কাছে যাওয়া উচিত দীন ও আখেরাতের উদ্দেশ্যে।

এবার একটি মাসআলা শুনুন। আপনার কাছে ওযুর পানি আছে। জায়গাটা এমন যে, কাছে ধারে কোথাও পানি নেই। এক মাইলের মধ্যে কোনো পানি নেই। ওখানে জুমুআর নামায পড়তে হবে। কিভাবে পড়ব? একজনের কাছে আধা লিটার পানি আছে। কোনো রকম ফরয অংশগুলো ধুয়ে ওযু শেষ করা যায়। এখন মাসআলা হল যার কাছে পানি আছে তার উপর ওযু করা ফরয, আর অন্য সকলের উপর তায়াম্মুম করা ফরয। এখন এই লোক যদি নিজে ওযু না করে অন্যকে বলে—হুজুর আপনি এ পানি দিয়ে ওযু করুন, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কারণ, হুজুরের জন্য তায়াম্মুম ফরয আর তার জন্য ওযু ফরয ছিল। তোমার সঙ্গতি ছিল ওযু করা। তুমি এ সঙ্গতি কেন হারালে? নামায পড়া হল কথা। তখন ওযুকারী ওযু করলে যেমন নামায হবে, তায়াম্মুমকারী তায়াম্মুম করে পড়লে তেমনই নামায হবে। আমি যদি আমার পানিটুকু কাউকে প্রদান করি তাহলে সেই পানির ওযু দিয়ে তার নামায হবে। এখন আমার তায়াম্মুম করা ছাড়া উপায় নেই। এখন আমি তায়াম্মুম করলে আমার নামায হয়ে

যাবে কিন্তু ইচ্ছা করে আমার ওযু করার সঙ্গতি হারানোর কারণে গুনাহগার হব। এমনিভাবে নামাযের মধ্যে আগের কাতারে দাঁড়ালে সওয়াব বেশি। আমি আগের কাতারে দাঁড়িয়েছি। পিছনের কাতারে একজন সম্মানি ব্যক্তি রয়েছেন। তাকে সামনের কাতারে জায়গা দিলে তার সম্মান হয়। এটা করা জায়েয আছে কিন্তু ভালো নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এটা কেমন কথা হল, নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার কেন করব না? উপকার হলেই তো হল। না, না। ক্ষেত্রের পার্থক্য রয়েছে। আমি আমার ওযুর পানি দিয়ে অন্যকে ওযু করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে জিজ্ঞাসার পাত্র হব—এটা কেমন কথা। আমারও জিজ্ঞাসিত হওয়ার দরকার নেই, তারও জিজ্ঞাসিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তওবার হাকীকত

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীস থেকে দু'টি হাদীস তেলাওয়াত করা হয়েছে। দু'টি হাদীসই তওবা সম্পর্কিত। তাওবা অর্থ—আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ পাকের দরবারটাই এমন। দুনিয়াতে কারো দরবার এমন নয়। খুব আদরের সন্তান। বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু একটা জিনিস দুইবার তিনবার চাইলে বাবাও খুশি হন না। ধমক মারেন। শুধু আমার আপনার মাওলার দরবারটা এমন যে, তাঁর কাছে যত চাওয়া হয় তিনি ততই খুশি হন। যতবারই ভুল করি না কেন, ভুল করার পর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি খুশি হন। দুনিয়াতে কেউ কারো কাছে যত প্রিয়ই হোক না কেন, দুয়েকবার ভুল করলেই হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ পাককে পাবেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আল্লাহপাকের ঘোষণা তো এরূপ—

گر صد بار توبه شکستی باز آ باز آ

হে বান্দা! শতবারও যদি তুমি তওবা ভঙ্গ করে থাক—ফিরে এসো মাওলার দরবারে।

নিরাশ হওয়া যাবে না

সবচেয়ে বদবখত ও পোড়াকপাল ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে নিরাশ হয়। আর নিরাশ হয় এ জন্য যে, সে নিজেকেও চিনে না, মাওলাকেও চিনে না। যে নিজেকেও চিনে না, মাওলায়েপাককেও চিনে না—সে নিরাশ হতে পারে। পক্ষান্তরে যে মাওলাকে চিনে, সে কখনোই নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহপাক বলেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا .[101]

অর্থ: বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতে মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কাজী ইয়াজ (রহ.)-এর দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন–

وَ مِمَّا زَادَنِی عَجَبًا وَ تِيْهًا ... وَ كِدْتُ بِأَخْمَصِی أَطَأُ الثُّرَيَّا
دُخُوْلِی تَحْتَ قَوْلِكَ يا عِبادِیْ ... وَاَنْ صَيَّرْتَ اَحْمَدَلِی نَبِيًّا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এমন দু'টি নেয়ামত আমি প্রাপ্ত হয়েছি, যেগুলো পেয়ে আমি নিজেকে এমন গর্বিত ও ধন্য মনে করি যেন চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি আমার পায়ের নিচে পড়েছে আর আমি স্বাচ্ছন্দের সাথে সেগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে চলছি। সেগুলো আমার পায়ের নিচে পদদলিত হচ্ছে। দু'টি নেয়ামত এমন, যে দু'টি নেয়ামতের দ্বারা আমি অনেক দামি! নেয়ামত দু'টি কী?

دُخُوْلِی تَحْتَ قَوْلِكَ يا عِبادِیْ ... وَاَنْ صَيَّرْتَ اَحْمَدَلِی نَبِيًّا

একটি নেয়ামত হল যারা গুনাহগার কুরআন শরীফে আল্লাহ তাদেরকেও তার বান্দা বলে স্বীকার করেছেন। আল্লাহ পাক কালামে পাকে يَاعِبَادِیْ বলে সম্বোধন করেছেন। আমি নিজেকে গুনাহগার মনে করি কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর বান্দা বলে স্বীকার করেছেন—এজন্য আমি খুশি। একটি সন্তানকে যদি তার বাবা সন্তান বলে পরিচয় না দেন, সন্তান বলে গ্রহণ না করে তার কী অবস্থা হবে? ঐ সন্তানের

১০২. সূরা যুমার : ৫৩

দুনিয়ার সব চাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত হল ঐ সময়টি যখন তার বাবা কিংবা মা তাকে সন্তান বলে গ্রহণ করে নেন—ঐ মুহূর্তটা তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্ত। তেমনিভাবে একজন ঈমানদারের কাছেও এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না যে, মাওলায়েপাক তাকে আপন বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেন, যে নিজেকে গুনাহগার মনে করে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

আল্লাহপাক তাঁর রাসূলকে দিয়ে ঘোষণা দেয়াচ্ছেন—হে বান্দা! তুমি যত বড় অপরাধীই হও না কেন, তুমি যত অপরাধই করে থাক না কেন, তুমি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তুমি কি মনে করছ যে, তুমি এত বেশি গুনাহ করে ফেলেছো যেটা মাওলায়েপাক ক্ষমা করার শক্তি রাখেন না? এত নিরাশ কেন? নিরাশ তো ঐ সময় হওয়া যায় যখন এটা জানা যাবে যে, আল্লাহর শক্তি খুবই অল্প, তিনি খুব সামান্য পরিমাণ ক্ষমা করতে পারেন, বেশি হলে পারেন না। বিষয়টি তো এমন নয়; বরং বিষয় হল–

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

হে বান্দা! হয়ত তুমি খুব গুনাহ করেছো, তোমার নিজের হিসেবে হয়ত বেশি, কিন্তু মাওলায়েপাকের দয়া-মায়ার কাছে, মাওলায়েপাকের ক্ষমতার সামনে এটা কিছুই না, তাঁর রহমত থেকে তুমি নিরাশ হয়ো না।

তো কাজী ইয়াজ (রহ.) দু'টি নেয়ামত পেয়ে নিজেকে সবচাইতে দামি মনে করেন। একটি হল আমি নিজেকে গুনাহগার মনে করি অথচ আল্লাহপাক তাঁর কালামে আমাকে বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। দ্বিতীয় নেয়ামত হল–

وَاَنْ صَيَّرْتَ اَحمَدَلِى نَبِيًّا

জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহ ওয়াসাল্লামকে আমার নবী বানিয়েছেন, আমাকে তাঁর উম্মত বানিয়েছেন—এটা কত বড় নেয়ামত!

মানুষমাত্রই গুনাহগার

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ

আদম সন্তান সকলেই গুনাহগার। কেউ একথা বলার সাহস রাখে না যে, আমি গুনাহগার নই। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন। তাঁদের ছাড়া কেউ বলতে পারবে না যে, আমি গুনাহ করিনি। নিজেকে গুনাহগার মনে না করার অবকাশ কারো নেই। কেউ যদি বলে, আমি কোনো গুনাহ করি না—এটাও একটা গুনাহ। ছোট নয়, অনেক বড় গুনাহ। যে বলবে আমি গুনাহ করি না, সে জানেই না গুনাহ কাকে বলে।

গুনাহের পর্যায় রয়েছে। একজন মুশরিক আর কাফেরের গুনাহ হলো কুফর ও শিরক। আর একজন মুসলমানের গুনাহ হলো আল্লাহপাকের যে কোনো হুকুম লঙ্ঘন করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ফরমাঁবরদার ও অনুগত বান্দা—তার গুনাহ হল অনুত্তম কাজ করা। এটাও তার জন্য গুনাহ। তো আমাদের জানা-অজানা কত করমের গুনাহ হয়ে যায় আমরা বুঝতেও পারি না।

উত্তম গুনাহগার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاؤُوْنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

বনূ আদম সকলেই গুনাহগার, তবে এ গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম হল তারা—যারা তাওবা করে।

অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

যে গুনাহ থেকে তওবা করল সে এমন হয়ে গেল যেন সে গুনাহই করেনি। তওবা যদি প্রকৃত তওবা হয় তাহলে ঠিকই এমন হবে।

নবীজির তওবা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসুম ছিলেন, তাঁর আগে-পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে—এতদসত্ত্বেও তিনি দৈনিক একশতবার ইস্তেগফার পাঠ করতেন।

বলুন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের থেকে তওবা করতেন? তিনি কি গুনাহ করতেন? না, না। ইস্তেগফার তাঁর গুনাহের কারণে ছিল না; বরং তিনি প্রতিদিন মর্যাদার একশতটি সোপান অতিক্রম করতেন। যখন নিচের সিঁড়ি থেকে উপরে উঠেছেন তখন

নিচের সিঁড়িটি গুনাহের মত মনে হয়েছে। আসলে কিন্তু এটা কোনো গুনাহ ছিল না; বরং এটাও ছিল অনেক উঁচু মর্যাদার একটি সোপান। কিন্তু ঐ স্তরের তুলনায় উপরের স্তরে গেলে আগেরটাকে গুনাহের মত মনে হয়।

পরিপূর্ণ তওবা

এখানে এটাও বোঝা দরকার যে, তওবার কতগুলো পার্টস বা অংশ রয়েছে। একটা ইঞ্জিনের যেমন কতগুলো যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়, যেগুলোর একটা না থাকলেও ইঞ্জিন চলে না, তেমনি তওবারও কিছু অংশ রয়েছে, যেগুলো পাওয়া না গেলে তওবা কবুল হবে না।

১. খুবই লজ্জিত হওয়া যে, আহ! আমি আল্লাহপাককে নারাজ করে ফেলেছি। যে কাজ করলে আল্লাহপাক নারাজ হন, সে কাজটি আমি করে ফেলেছি। এভাবে লজ্জিত হওয়া ও নিজেকে অপরাধী ভাবা।

২. পাপ কাজটি ত্যাগ করা।

৩. ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

৪. উক্ত পাপটির ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া। যেমন অন্যের সম্পদ এনেছেন বা নষ্ট করেছেন তো এর তওবা হল সেটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা ক্ষমা নেয়া। আল্লাহর হক নষ্ট হয়েছে। যেমন নামায কাজা হয়েছে, তো নামাযের কাজা আদায় করা। এ চার জিনিস একত্রিত হলে এর নাম হল তওবা। কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তিনি বান্দার তওবা কবুল করবেন।

অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন, যদি এই বিষয়গুলো পাওয়া যায় এবং প্রকৃত তওবা হয় তাহলে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করেই দিবেন।

তওবার পর ফের গুনাহ হলে

কখনো এমন হয় যে, বান্দা যখন তওবা করেছে তখন ঠিকই তার মনোভাব ছিল, ভবিষ্যতে আর সে গুনাহটি করবে না। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আবার করে ফেলেছে—এই পরবর্তী অপরাধের কারণে পূর্ববর্তী তওবার কোনো ক্ষতি হবে না। পূর্বের তওবার কারণে পূর্বের গুনাহ ক্ষমা হয়েছে। এখন নতুন করে কোনো গুনাহের কাজ করেছে তো আবার তওবা করবে। আবার ক্ষমা হবে। এভাবে শতবার নয়, লক্ষবার

নয়, কোটি কোটি বারও যদি গুনাহ হয়ে যায় আর প্রতিবারই বান্দা খাঁটি নিয়তে তওবা করে, তাহলেও আল্লাহপাক তওবা কবুল করবেন। হে বান্দা! গুনাহ করতে করতে তুমি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছো যে, এখন আর গুনাহ করার সঙ্গতি নেই, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। গুনাহ করার সঙ্গতি থাকলেও তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। গুনাহ করতে করতে তুমি তোমার সঙ্গতির বাইরে চলে গিয়েছো, তাতে কী হয়েছে? মাওলাও কি ক্ষমা করতে করতে সঙ্গতির বাইরে চলে গেছেন? কিছুতেই নয়। তাহলে কেন নিরাশ হও? নিরাশ হওয়া যাবে না।

اس طرح سے طے کئے ہم منزلیں....گر پڑے پھر اٹھے
اٹھکر چلے

এক লোক বাড়ি যাবে। রাস্তা খুব পিচ্ছিল। কতক্ষণ চলার পর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। উঠে আবার হাঁটা শুরু করল। কতক্ষণ চলার পর আবার পড়ে গেল। উঠে আবার চলা শুরু করল। এভাবে চলতে চলতে একদিন সে তার গন্তব্যে পৌঁছাবে। আর যদি পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে সামনে অগ্রসর না হয়ে জায়গায় বসে থাকে, তাহলে কি গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে? পারবে না। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

গুনাহগারদের মধ্যে সে উত্তম, যে বেশি বেশি তওবা করে।

নিরাশ হওয়া যাবে না, রহমতের দরজা সদা উন্মুক্ত

দোস্ত! নিরাশ হওয়া যাবে না। নৈরাশ্যের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। নৈরাশ্যের এক পর্যায়ে মানুষ আত্মহত্যা করে বসে। মুসলমানদের সন্তান আত্মহত্যা করে, এটা আমার বুঝেই ধরে না। একজন মুসলমান কিভাবে আত্মহত্যা করতে পারে? সে কি মাওলাকে মোটেই চিনে না! সে কি আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রতি ঈমান রাখে না! আল্লাহর দরবার তো সদাসর্বদা খোলা।

হযরত হামযা (রা.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা। তিনি হলেন সায়্যেদুশ শুহাদা—সমস্ত শহীদের সর্দার। এ হামযাকে খুবই নির্মম ও নৃশংসভাবে শহীদ করেছে ওয়াহশী নামক এক ব্যক্তি। এই ওয়াহশী যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে

প্রত্যাবর্তন করেছে, মাওলার দরবারে আত্মসমর্পণ করেছে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

দুনিয়ার জীবনে যে কোনো সমস্যা হতে পারে। অর্থনৈতিক হোক, পারিবারিক হোক, নিরাশ কেন হব? 'আমি চোখে-মুখে পথ দেখছি না'—একথা কেন বলতে যাব? আমি তো ঈমানদার। আমার তো জানা থাকা দরকার দুনিয়ার সকল রাস্তা বন্ধ থাকলেও আল্লাহ পাকের দরবারের রাস্তা কোনো সময় বন্ধ হয় না।

مسدود ھیں گو ساری تدابیر کی را ھیں
خوش ھو کہ نہیں تجھ پہ ابھی بابِ دُعاء بند
تمہید ھیں رحمت کی یہ دنیا کے مصائب
بارش کی علامت ھے کہ ھوتی ھے ھوا بند

হে বান্দা! যখন সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তখন তুমি নিরাশ হয়ো না; বরং তুমি আশাবাদী হও এজন্য যে, মাওলার দরবারের দরজা এখনো খোলা রয়েছে। দরখাস্ত দেওয়া ও ফরিয়াদ করার রাস্তা এখনও খোলা রয়েছে। দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই সেই রাস্তা বন্ধ করার। কেউ যদি আল্লাহর দরবারে চাইতে জানে তাহলে তার এমন কোনো সমস্যা থাকবে না যার সমাধান অসম্ভব। এজন্য দোস্ত! খুব ভালোভাবে বুঝি। মুমিনের হাতিয়ার তো দু'আ। মাওলার কাছে ক্ষমা চাইব। অভিযোগ-অনুযোগ, অভাব-অনটন সবকিছু মাওলার কাছে চাইব। প্রকৃত তওবা হলে আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে ক্ষমা করে দিবেন।

গুনাহের চার সাক্ষী

কোনো মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে তখন চারটি জিনিস সাক্ষী হয়ে যায়। এটা আল্লাহ পাকের নেজাম। সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হল যিনা। এটা প্রমাণিত হতে হলে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। একজন কম হলেও প্রমাণিত হবে না।

আল্লাহ পাকের সর্বোচ্চ সাক্ষীও চারটি। যতটা গুনাহ হয় প্রতিটি গুনাহের চারটি করে সাক্ষী রেখেছেন।

প্রথম সাক্ষী হল- যমীন। গুনাহ তো কোনো জায়গাতেই হয়। যেখানে গুনাহ হয় সে জায়গাটি সাক্ষী হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا () بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا .[102]

যমীন সব খবর বলে দিবে। কোন জায়গায় কী হয়েছে যমীন টেপ রেকর্ডারের মত বলে দিবে।

দ্বিতীয় সাক্ষী হল—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। গুনাহ তো শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই হয়ে থাকে। হয় চোখ দিয়ে হবে, না হয় কান দিয়ে হবে, না হয় হাত দিয়ে হবে। এভাবে শরীরের যে কোনো অঙ্গ দিয়ে হতে পারে। যে অঙ্গের মাধ্যমে যে গুনাহ হবে সে অঙ্গ তার সাক্ষী হবে। চোখ দিয়ে বেগানা মহিলার দিকে তাকায়, টিভি-সিনেমা দেখে, কান দিয়ে বেগানা মহিলার সুন্দর সুন্দর কথা শোনে, গান-বাদ্য শোনে—এগুলো সাক্ষী হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .[103]

আল্লাহ পাক মুখ বন্ধ করে দিবেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে।

چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام
گوش گوید شنیدہ ام سمر الکلام
دست گوید من چنیں دزدیدہ ام
لب گوید من چنیں بوسیدہ ام

চোখে বলে দিবে—আমি অবৈধ ইঙ্গিত করেছি। কান বলে দিবে—আমি খারাপ কথা শুনেছি। হাত বলে দিবে—অমুক জিনিস আমার মাধ্যমে চুরি করেছে।

দোস্ত! সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ দিবে। কী নিয়ে হাঁটছেন—একবারও কি ভেবে দেখেছেন?

তৃতীয়তঃ ফেরেশতারা সাক্ষী হবেন। কুরআনে রয়েছে–

كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ .[104]

অর্থ: কেরামান কাতিবীন ফেরেশতাগণ মানুষের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

---

১০৩. সূরা যিলযালাহ : ৪-৫
১০৪. সূরা ইয়াছীন : ৬৫
১০৫. সূরা আনফাল : ১১-১২

চতুর্থতঃ যে আমলনামায় আমল লেখা হয় সে আমলনামাও সাক্ষী হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۔ [105]

অর্থ : যখন আমলনামা খোলা হবে।

এতগুলো সাক্ষী থাকার পরও যদি কেউ খাঁটি দিলে তওবা করে আল্লাহ পাক সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেন।

তওবার দ্বারা গুনাহের চিহ্ন মুছে যায়

এখন কথা হল আল্লাহ পাক গুনাহ মাফ করে যখন বান্দাকে জান্নাত দিবেন তখন তো বান্দার মনে একটা অস্থিরতা কাজ করবে যে, আমার অপরাধের তো চার রকমের সাক্ষী রয়েছে। বান্দা জান্নাতের নাজ-নেয়ামত ভোগ করার সময় তো ঐসব সাক্ষী দেখে মনে মনে লজ্জা পাবে। চিন্তা করবে, হায়রে আমি তো অনেক আরামে আছি, কিন্তু যমীন তো জানে আমি কত বড় অপরাধী, ফেরেশতারা জানে আমি কত বড় পাপী। আমলনামায় রেকর্ড হয়ে আছে আমি কত বড় নাফরমান। এই জিনিসগুলো সাক্ষী থাকা অবস্থায় জান্নাত তার কাছে কতটুকু শান্তিময় হবে? আমরা এ জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করিনি। কিন্তু আল্লাহ পাক বান্দার মনের এ অবস্থা খুব ভালোভাবে বোঝেন। তাই তার হাবীবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন কোনো বান্দা যখন খালেসভাবে তওবা করে আল্লাহ তাআলা তখন শুধু তার গুনাহ মাফ করেই ক্ষান্ত হন না; বরং ঐ চারটি সাক্ষীর কাছ থেকে গুনাহের কথাটা মুছিয়ে ফেলেন। তাদেরকে ভুলিয়ে দেন। যমীনের মেমোরী থেকে মুছে ফেলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্মরণ থেকে মুছে ফেলেন। ফেরেশতাদের স্মরণ থেকে মুছে ফেলেন, আমলনামা থেকেও মুছে ফেলেন। এবার চিন্তা করুন, কেমন মেহেরবান খোদা!

গুনাহ মুছে যাওয়ার আলামত

হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন, খাঁটি তওবা করার পর যখন বিভিন্ন স্থান থেকে গুনাহের আলামত মুছে ফেলা হয় তখন এর একটা প্রভাব তওবাকারীর দিলের মঝেও পড়ে। নিজের মনেও সে গুনাহের কথা কম

১০৬. সূরা তাকবীর : ১০

আসে। সব জায়গা থেকে যখন মুছে গেছে তাই ক্রমশঃ বান্দার দিল থেকেও মুছে যেতে থাকে।

অতীত গুনাহের স্মৃতিচারণ ভালো নয়

এরপর থানভী (রহ.) আরও লিখেন, যেসব গুনাহ দিল থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছে মনে হয় এগুলো নিয়ে গভীরভাবে স্মৃতিচারণ করা উচিত নয়। অনেককে যে বলতে শোনা যায় যে, জীবনের সকল গুনাহের কথা স্মরণ করে কাঁদুন- এটা ঠিক নয়। স্মরণ করে করে কাঁদার প্রয়োজন নেই। যেগুলো এমনিতেই স্মরণে পড়ে সেগুলোর জন্য কাঁদুন। কারণ আপনার স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া বা কম কম স্মরণে আসাটা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার আলামত। আর আমরা মনে না এলেও টেনে টেনে মনে করতে চাই। এটা ভালো কাজ নয়; বরং তোমার কাজ হল পিছনে তাকাবে না। যা হয়েছে তওবা কর। আর মনে কর আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। স্মরণ করার প্রয়োজন নেই; বরং চেষ্টা কর সামনে যেন এ গুনাহ না হয় এবং নেক আমল বেশি হয়। পিছনে তাকাবে না। যে পিছনে তাকায় সে এগুতে পারে না। তাই সামনে দেখুন। অতীতের গুনাহের কথা স্মরণ হলে বলবেন, মাওলা মাফ করে দিন। আর তওবা হবে ইজমালী (সংক্ষিপ্ত), তাফসীলী নয়। কোন জায়গায় কোন গুনাহ হয়েছে তার কথা না বলে নিছক গুনাহের জন্য মাফ চাইবেন। পিছনে তাকালে সামনে অগ্রসর হতে পারবেন না। আমাদের তো সামনে অগ্রসর হতে হবে। মাওলার দিকে এগুতে হবে।

আমার পরিচয়

দোস্ত! চেষ্টা করুন, আমাদের বাকী হায়াতটা যেন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আমার পরিচয় হল আমি মুখাপেক্ষী। আমার মাওলার পরিচয় হল তিনি আমার রব। মাওলা আমাদের রব। তিনি জানেন আমার কখন কী প্রয়োজন। আমার বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তা তিনি যথাযথভাবে পূরণ করছেন। বড় ধরনের কোনো বিপদ আসছে তো ফেরেশতার মাধ্যমে হেফাজত করেন। আমার এখন কিসের প্রয়োজন—আমি তা জানি না। আগামীকাল কিসের প্রয়োজন—তাও জানি না। মৃত্যুর সময় কিসের প্রয়োজন—তাও জানি না। জানেন কে? সবকিছু জানেন একমাত্র আমার রব। আমি অসহায়, আমি ফকীর।

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ

আমার কিছু নেই। আমার আমিত্ব বলতে কিছু নেই। আমি আমি ভাব রাখা যাবে না। আমি ফকীর। আল্লাহ রব। আমি নিতান্ত অসহায়। এসব ভাবা যাবে না যে, আমার রাজত্ব আছে, ক্ষমতা আছে, ফ্যাক্টরী আছে, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে, এই আছে-সেই আছে। কারণ, মাওলা যদি এই মুহূর্তে ইচ্ছা করেন তাহলে সবকিছুই মুহূর্তের মধ্যে 'নাই' হয়ে যেতে পারে। আমরা অনেকে নিজেদেরকে বুযুর্গ পীর, বা বড় আলেম ও মুফতী মনে করি। এটাও ঠিক নয়। আমার শায়েখ (রহ.) আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলতেন–

بزرگی نفس کی خواهش هے افسوس
تکبر سے بچا هم کو خدایا

আমার নফস বুযুর্গী চায়। আমার নফস এটা কামনা করে যে, মানুষ আমাকে বুযুর্গ বলুক, পরহেযগার, মুত্তাকী ও অলী বলুক। মাওলা! এভাবনার নামই তো তাকাব্বুর আর অহংকার। মাওলা আমি তো ফকীর। আমার পরিচয়ই তো আমি কিছু না। মাওলা! আমি সর্ব বিষয়ে সব সময় তোমার কাছে মুহতাজ আর মুখাপেক্ষী। এমন কোনো মুহূর্ত যদি আসে যেই মুহূর্তে আমি দুনিয়াতে সব চাইতে বেশি ধনী, ঐ মুহূর্তেও আমি মাওলার কাছে সব চাইতে বেশি ফকীর। হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেন–

درویش و غنی بندۂ ایں خاك درند
وانا نکه غنی ترند محتاج ترند

ধনী-দরিদ্র সকলেই এ দরবারের মুখাপেক্ষী গোলাম। বরং যারা বেশি ধনী তারা বেশি মুখাপেক্ষী।

সুতরাং যারা দীনি লাইনেও বড় বড় অবস্থানে রয়েছেন তারা আরও বেশি মুহতাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ .[106]

সর্ব বিষয়ে আমি মুহতাজ। কিসের মুহতাজ? আল্লাহর রহমত ও দয়া-মায়ার মুহতাজ।

দোস্ত! নিজের আমিত্বকে শেষ করে দিতে হবে। একদম শেষ করে দিতে হবে। একজন মানুষ যদি নিজের এবং মাওলার প্রকৃত পরিচয় পায়, পেতে পেতে এক পর্যায়ে সে নিজেকে আর খুঁজে পায় না।

১০৭. সূরা ফাতির : ১৫

সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে

দোস্ত! আল্লাহর কাছে আমরা চাইব। চাইতে তো হবে তাঁর কাছেই। আল্লাহর কাছে না চাইলে আর কার কাছে চাইব? পেলেও তাঁর কাছেই চাইতে হবে, না পেলেও তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

کھولے یا نه کھولے در اُس پر تیری کیوں نظر
تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا

দরজা তো কেবল একটি। সেই দরজায় নক করা আমার কাজ। দরজা ভেতর থেকে খুলবে কি খুলবে না, সে হিসাব আমার নয়। ভিতরওয়ালা ইচ্ছা করলে খুলবেন, ইচ্ছা না করলে খুলবেন না। তিনি যদি না খোলেন তাহলে আমার জন্য অন্য কোনো দরজা নেই। আমাকে তো এ একটি দরজাই বারবার নক করতে হবে আর বলতে হবে–

گر چه یا رب هم سر ا پا هیں برے
اب تو لیکن آپڑیں در پر تیرے

মাওলা গো! আমার মাথার তালু হতে পায়ের তালু পর্যন্ত গুনাহ আর গুনাহ। কিন্তু এখন তো তোমার দরবারে এসে পড়ে আছি। তুমি মেহেরবানী করে ক্ষমা করো।

পরিশেষে বলি, নিজেকে চিনতে হবে, মাওলাকেও চিনতে হবে। আমি কে? আমি ফকীর ও মুখাপেক্ষী। কেমন মুখাপেক্ষী? ব্যাখ্যাহীন মুখাপেক্ষী। আমার মুখাপেক্ষিতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, পরিমাণ নেই। মুখাপেক্ষিতার যত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে আমি মাওলার কাছে সর্ব রকম মুখাপেক্ষী। আর মাওলার সত্তা এমন বেনিয়াজ যে, এখানেও কোনো ব্যাখ্যা নেই, সীমা নেই।

.....

* ১৯/০২/২০১১ইং তারিখে ফুলছোঁয়ার বার্ষিক মাহফিলের আখেরী বয়ান।

বয়ান অংশ সমাপ্ত

পরিশিষ্ট
সফরের কতিপয় আদব

◈ একা সফর করা ভালো নয়, তাই সফর শুরু করার আগে কোনো দীনদার সঙ্গী তালাশ করবে। [তিরমিযী : ১৬৭৩]

◈ সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিষিদ্ধ বা মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করবে। –[ফায়যুল কাদীর ৫/৪৪৩]

◈ মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার সময় বিদায় দানকারী এ দু'আ পড়বে :

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.[107]

অথবা এ দু'আ পড়বে :

فِيْ حِفْظِ اللهِ وَ فِيْ كَنَفِهِ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ فِى الْخَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ[108]

১০৮. তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৪৩

◈ মুসাফির ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.[109]

এরপর এ দু'আ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَه اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأْبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.[110]

◈ গাড়িতে পা রাখার সময় পড়বে : بِسْمِ اللهِ - গাড়িতে বসার পর পড়বে : سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ - এরপর পড়বে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - তারপর তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়ার পর سُبْحَانَكَ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ এ দু'আ পড়ে একটু মুচকি হাসি দিবে।[১১১]

◈ পথিমধ্যে কোথাও অবস্থান করলে এ দু'আ পড়বে :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.[112]

◈ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে এ দু'আ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِه وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلٰى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ أَهْلِهَا إِلَيْهَا[113]

◈ সফরের উদ্দেশ্য হাসিলের পর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব করবে না।

◈ সফর থেকে ফেরার সময় নিজ শহরের নিকটে এসে পড়বে :

آئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.[114]

এরপর পড়বে : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا.[115]

◈ ঘরে প্রবেশ করার পর পড়বে : تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لاَيُغَادِرُ حَوْبًا.[116]

১০৯. ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলা, হাদীস নং-৫০৩
১১০. তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪২৬
১১১. তিরমিযী-৩৪৪৭; সহীহ মুসলিম-১৩৪৩; আল-আযকার-২৩৪
১১২. শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস নং-১৫
১১৩. আল-আযকার, হাদীস নং-২৫২
১১৪. প্রাগুক্ত : ২৪৯
১১৫. প্রাগুক্ত : ২৫৬
১১৬. প্রাগুক্ত : ২৩৩
১১৭. প্রাগুক্ত : ২৫৬

সফর সংক্রান্ত জরুরী হেদায়াত

◊ সফররত অবস্থায় যিকিরে ফিকিরে থাকবে।
◊ দৃষ্টির হেফাযত করবে।
◊ কোনক্রমেই যেন নামায কাযা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।
◊ ৪৮ মাইল তথা ৭৭ কি.মি. (প্রায়) দূরত্বে সফর হলে নিজ শহর বা এলাকা থেকে বের হওয়ার পর আসতে এবং যেতে নামায কসর পড়বে [অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত আদায় করবে]।
◊ চলন্ত অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়ার প্রয়োজন নেই।
◊ গন্তব্যে অবস্থানকালে ফরযের সাথে সুন্নতে মুয়াক্কাদাও আদায় করবে।
◊ গন্তব্যে ১৫ দিন বা তার বেশি থাকার ইচ্ছা না থাকলে একাকী নামায আদায়ের সময় কসর করবে।
◊ ইমাম হলেও কসর করবে।
◊ মুকীমের পেছনে নামায আদায় করলে ইমামের অনুসরণে চার রাকাত পূর্ণ আদায় করবে।
◊ সফর অবস্থায় দু'আ কুবল হয়- একথাও স্মরণে রাখবে।
◊ এ সফর থেকে আখেরাতের সফরের শিক্ষা নেবে।
◊ বাস/গাড়ীতে বসে ইশারায় নফল নামায আদায় করা যায়। এ ক্ষেত্রে কেবলামুখী হওয়া শর্ত নয়।

সকাল-সন্ধ্যার দশটি আমল

১. যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে, এটি তার সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[১১৭]

২. যে ব্যক্তি সকালে اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে পানাহ দেয়া হবে।[১১৮]

১১৮. আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৭
১১৯. আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ্ , পৃঃ২২

৩. যে ব্যক্তি দুই নম্বরে বর্ণিত দু'আটি সকালে তিনবার পাঠ করতঃ সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার প্রতি রহমতের দু'আ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন এবং সে দিন মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ হবে। এমনিভাবে সন্ধ্যায় উক্ত আমল করা হলে সকাল পর্যন্ত দু'আ করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে এবং সে রাতে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ হবে।[১১৯]

৪. যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম হবে না। তবে যদি কেউ তার চেয়ে বেশি পাঠ করে থাকে, তাহলে সে তার চেয়ে উত্তম হবে।[১২০]

৫. যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ সাতবার পাঠ করে আর সে রাতে মারা যায় তাকে জাহান্নাম থেকে অবশ্যই নাজাত দেওয়া হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি সকালে পাঠ করে আর সে দিন মারা যায় তাকেও জাহান্নাম থেকে অবশ্যই নাজাত দেওয়া হবে।[১২১]

৬. যে ব্যক্তি সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অবশ্যই সে লাভ করবে।[১২২]

৭. যে ব্যক্তি رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতদিবসে তাকে অবশ্যই রাযী খুশী করবেন।[১২৩]

৮. যে ব্যক্তি حَسْبِىَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করবে আল্লাহ

১২০. কিতাবুল আযকার- পৃঃ ৭৭
১২১. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪
১২২. আবূ দাউদ শরীফ, পৃঃ ৩৩৭
১২৩. তারগীব ওত্তারহীব খণ্ড-১, পৃঃ ২৭৩; হাওয়ালা হিসনুল মুসলিম পৃঃ ৬৮
১২৪. তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৬

তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যাবেন।[১২৪]

৯. যে ব্যক্তি بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْئٌ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে কোন বস্তু তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।[১২৫]

১০. যে ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ সকালে ১০ বার পাঠ করবে তার আমল নামায় ১০০ নেকী লিখা হবে, তার ১০০ গুনাহ মাফ করা হবে, একটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব হবে ও সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে নিরাপদে রাখা হবে। আর যে ব্যক্তি এটি সন্ধ্যা বেলায় পাঠ করবে সেও অনুরূপ ফযীলত প্রাপ্ত হবে।[১২৬]

বাইআত বা মুরীদ হওয়ার পর করণীয়

[প্রথম সবক]

- যে কাজ যেভাবে করা সুন্নত, মুস্তাহাব, আদব সে কাজ সেভাবে করা।
- মাসনূন দু'আসমূহ মুখস্থ করে সময় ও স্থান অনুযায়ী পাঠ করা।
- কমপক্ষে ৪০ দিন যেন এক খতম হয় এ অনুযায়ী প্রতিদিন কুরআন শরীফ পাঠ করা।

---

১২৫. আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াললাইলাহ্ পৃঃ৩০ ও কিতাবুল আযকার পৃঃ৭৯
১২৬. তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃঃ-১৭৬; ইবনে মাজা শরীফ পৃঃ-২৮৪
১২৭. আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াললাইলাহ্ পৃঃ-৩০

- তাহাজ্জুদ নামাযান্তে এস্তেগফার, দরূদ শরীফ, এরপর একবার সূরায়ে ফাতিহা ও তিনবার সূরায়ে এখলাস পাঠ করে সকল ওলী-বুজুর্গ, বিশেষ করে মাশায়েখে চিশতিয়া খান্দান (রাহিমাহুমুল্লাহ্) এর আরওয়াহে পাকে সাওয়াব পৌঁছানো এবং তাঁদের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ পাকের নিকট ইলম ও ইরফানের জন্য দু'আ করা।
- ফজর ও মাগরিবের (আওয়াবিনসহ) নামাযের পর একশতবার করে কালিমায়ে তামজীদ অর্থাৎ (سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ) পাঠ করা। যোহর ও এশার নামাযের পর একশতবার করে নফী-ইসবাত অর্থাৎ (لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ)-এর জিকির করা। আছরের নামাযের পর কমপক্ষে একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করা।
- দিনে একশতবার এস্তেগফার পাঠ করা।
- হযরত থানবী (রহ.) রচিত 'কস্‌দুস্‌ সাবীল', হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) রচিত 'ইমদাদুস্‌-সুলুক', ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রচিত "তাবলীগে দীন" পাঠ করা। আলেম হলে 'তাযকিরাতুল খলীল' পাঠ করা।

মোহতাজে দোয়া
মুহাম্মদ আবূ সাঈদ

পীরে কামেল শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.-এর শাজারা ও সনদ [তরীকায়ে চিশতিয়া]

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রা. (মৃত্যু-৩৫ হি.)
শায়খ হাসান বসরী রহ. (মৃত্যু-১১০ হি.)
শায়খ আবদুল ওয়াহীদ বিন যায়েদ রহ. (মৃত্যু-১৮৬ হি.)
শায়খ ফুযাইল বিন আয়ায রহ. (মৃত্যু-১৮৭ হি.)
সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী রহ. (মৃত্যু-১৬২ হি.)
শায়খ হুযায়ফা আল-মার'আশী রহ. (মৃত্যু-২০৭ হি.)
আবু হুবাইরা বসরী রহ. (মৃত্যু-২৮৭ হি.)
শায়খ মুমশাদ আলাভী দিনাওয়ারী রহ. (মৃত্যু-২৯৯ হি.)

শায়খ আবু ইসহাক চিশতী রহ. (মৃত্যু-৩২৯ হি.)
আবু আহমদ আবদাল চিশতী রহ. (মৃত্যু-৩৫৫ হি.)
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রহ. (মৃত্যু-৪১১ হি.)
শায়খ আবু ইউসুফ ইবনে সামআন রহ. (মৃত্যু-৪৫৯ হি.)
শায়খ মওদুদ চিশতী রহ. (মৃত্যু-৫২৭ হি.)
সাইয়েদ শরীফ যান্দানী রহ. (মৃত্যু-৫৮৪ হি.)
শায়খ উসমান হারুনী রহ. (মৃত্যু-৬১৭ হি.)
শায়খ মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী রহ. (মৃত্যু-৬৩৭ হি.)
শায়খ কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. (মৃত্যু-৬৩৪ হি.)
শায়খ ফরীদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার রহ. (মৃত্যু-৬৬৪ হি.)
শায়খ আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবেরী রহ. (মৃত্যু-৬৯০ হি.)
শায়খ শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রহ. (মৃত্যু-৭১৭ হি.)
শায়খ জালালুদ্দীন পানিপথী রহ. (মৃত্যু-৭৬৫ হি.)
শায়খ আহমদ আব্দুল হক রুদাওলভী রহ.
শায়খ আহমদ আরিফ রুদাওলভী রহ.
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আরিফ রুদাওলভী রহ. (মৃত্যু-৮৯৮ হি.)
শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যু-৯৪৪ হি.)
শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী রহ. (মৃত্যু-৯৮০ হি.)
শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী রহ. (মৃত্যু-১০২৪ হি.)
শায়খ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যু-১০৪০ হি.)
শায়খ মুহিবুল্লাহ ইলাহাবাদী রহ. (মৃত্যু-১০৫৮ হি.)
শায়খ মুহাম্মদ আকবারাবাদী রহ. (মৃত্যু-১১০৭ হি.)
শায়খ মুহাম্মদ মাক্কী জাফরী রহ.
শায়খ আযদুদ্দীন আমরুহী রহ. (মৃত্যু-১১৭২ হি.)
শায়খ আব্দুল হাদী আমরুহী রহ.
শায়খ আব্দুল বারী সিদ্দিকী আমরুহী রহ. (মৃত্যু-১২২৬ হি.)
শায়খ আব্দুর রহীম শহীদে বালাকোট রহ. (মৃত্যু-১২৪৬ হি.)
শায়খ নূর মুহাম্মদ ঝন্‌ঝানাভী রহ. (মৃত্যু-১২৫৯ হি.)
সাইয়েদুত তায়েফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. (মৃত্যু-১৩১৭ হি.)
ইমামে রব্বানী শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যু-১৩২৩ হি.)
শায়খ জমিরুদ্দীন চাটগামী রহ. [বানিয়ে হাটহাজারী]
মুফতী আজিজুল হক রহ. [বানিয়ে পটিয়া]
শায়খ সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ.

শায়খ মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.

দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ কী ও কেন?

ইসলামের সঠিক আকায়েদ ও বিধিবিধান প্রসারের ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার অবদান অপরিসীম; কিন্তু এ মাদরাসাগুলোর পাঠ্যক্রম দাওরা হাদীস পর্যন্ত সমাপ্ত, তাই একজন মেধাবী ছাত্র এ পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে কোন মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়ে আবার সেই সুনির্দিষ্ট কিছু কিতাব পাঠদানে মশগুল হয়ে পড়ে। ফলে ইসলামের অগণিত রত্নভান্ডার থেকে সে না পারে কিছু আহরণ করতে, না পারে ইসলামের চিরন্তন সৌন্দর্যের বাস্তব নমুনা তুলে ধরতে। তাছাড়া, কালের বিবর্তনে অনেক নতুন নতুন ও জটিল সমস্যা সৃষ্টি

হচ্ছে। এ সকল সমস্যার সমাধান বের করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়; বরং তা অতি তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন ও ফিকাহ্‌শাস্ত্রজ্ঞ হক্কানী রব্বানী আলেমের কাজ। তাই এ ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরির লক্ষ্যে বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ও দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণ আলেমদেরকে ঝামেলামুক্ত নিরিবিলি পরিবেশে উন্নত শিক্ষা, উচ্চতর গবেষণা, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের সুযোগদানের জন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে গত ১৫ই শাওয়াল ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার **'দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ'** নামে এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কিতাব সংগ্রহ করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনার জন্য দেশী-বিদেশী মনীষী ও শিক্ষাবিদদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু জায়গা খরিদ করা হয়েছে, আরও জায়গা প্রয়োজন। নিজস্ব জায়গায় থাকার পরিবেশ না হওয়ায় এখনো ভাড়া বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। স্থায়ী ভবন করে সেখানে থাকার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে বহু টাকার প্রয়োজন। অন্যান্য কওমী মাদরাসা যেভাবে মুসলিম জনসাধারণের দোয়া ও আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে এটিও তদ্রুপ। পরামর্শ ও দোয়া দিয়ে প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিতে আপনিও শরীক হতে পারেন। এতে যাকাত, মান্নতেরও খাত রয়েছে।

মুহ্‌তাজে দোয়া

(মুফ্‌তী) মুহাম্মদ আবূ সাঈদ
পরিচালক, দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা।
(গবেষণামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
অস্থায়ী কার্যালয় ঃ সি-৫৪, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।
ফোন ঃ ৭৪৪৫৯১৭, মোবাইল ঃ ০১৮১৮৫৩০৬৩৮